দশম ভাগ

গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দশম ভাগ

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিষয়ে নানা কথা, সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, উড়িয়া বাবার দেহত্যাগ, সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি, যজ্ঞ কুণ্ডে নানা অলৌকিক দর্শন, মাকে লইয়া সূক্ষ্ম দেহীদের আনন্দকীর্ত্তন, হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ, কাশী আশ্রমে অন্নপূর্ণা মন্দির স্থাপনা, পুরীধামে মায়ের শরীর ত্যাগের উপক্রম, বিন্ধ্যাচলের বৃক্ষরূপী মহাত্মাদের প্রসঙ্গ, কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শদান, পাঞ্জাবে মায়ের জন্মোৎসব, বৃন্দাবন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন এবং মোরভি, মণ্ডিরাজ্য, কুলুভ্যালি, আনন্দকাশী, টিহরী প্রভৃতি স্থানে মায়ের ভ্রমণ লীলা কাহিনী ও মায়ের মুখ নিঃসৃত নানা অমূল্য উপদেশাবলী লইয়া এই ভাগের রচনা।

[ফাল্গুন, ১৩৫৫—কার্ত্তিক, ১৩৫৯]

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দশম ভাগ

[ফাল্গুন, ১৩৫৫ — কার্ত্তিক, ১৩৫৯]

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

প্রকাশক : শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ
ভাদাইনী, বারাণসী।

প্রথম সংস্করণ

বৈশাখ, ১৩৬৬

মূল্য :

~~দুই টাকা মাত্র~~
দুই টাকা আট আনা মাত্র

মুদ্রক :
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ,
৭৮, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশকের কথা

শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবীর ব্যক্তিগত ডায়েরীই "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" নামে পুস্তকাকারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিনি অনুক্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের সেবাকার্য্য ও আনুষঙ্গিক বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যে শ্রীশ্রীমার জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশাদি যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে কিছু লিখিবার যোগ্যতা যে তাঁহার বিশেষভাবে আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্থূলভাবে শ্রীশ্রীমায়ের দেহাশ্রিত লীলার বিবরণ বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। আর যাঁহারা প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীশ্রীমার সঙ্গ ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়া থাকেন।

পুস্তকের বাঁধাই, আবরণ পৃষ্ঠা ও চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার প্রয়াস করা হইয়াছে।

বিনীত—

বৈশাখ, ১৩৬৬ প্রকাশক।

সূচীপত্র

নানস্থানে মা (ফাল্গুন, ১৩৫৫—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬)

সাবিত্রী মহাযজ্ঞ (পৌষ, ১৩৫৬)

নানা স্থানে মা (মাঘ, ১৩৫৬—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮)

গুজরাটে মা (পৌষ, ১৩৫৮)

নানা স্থানে (মাঘ—চৈত্র, ১৩৫৮)

আনন্দকাশীতে মা (চৈত্র, ১৩৫৮—বৈশাখ, ১৩৫৯)

পাঞ্জাবে মা (বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৫৯)

নানা স্থানে (আষাঢ়—কার্ত্তিক, ১৩৫৯)

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দশম ভাগ

১২ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫৫ সন।

শ্রীশ্রীউড়িয়াবাবা অসুস্থ বলিয়া শ্রীশ্রীহরিবাবা আগামী পরশু হইতে উড়িয়াবাবার শরীরের জন্য জপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক জনের পর একজন করিয়া জপ রাখিবে। এইভাবে দুই দিন চলিবে। হরিবাবা বলিয়াছেন, "আমি মার নিকট হইতে ইহা শিখিয়াছি। মার আশ্রমেও এই নিয়ম চলে। মার নিকট হইতে আরও একটা শিখিয়াছি — কাশীর আশ্রমে রাত্রি পৌনে নয়টা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সকলে মৌন থাকে। রাত্রি পৌনে নয়টার ঘণ্টা বাজে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই সব নিস্তব্ধ হইয়া যায়। এখানেও ঐরূপ করা হইবে।"

মায়ের কথা ও আচরণ হইতে শিক্ষা লাভ।

আজ সকাল বেলা সকলে বসিয়া যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন তখন স্বামী অখণ্ডানন্দজী বলিয়াছিলেন,"আমিও মার নিকট হইতে একটা কথা শিখিয়াছি— হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। আমিও এই কথাই এখন হইতে বলিব। ইহা বড় চমৎকার কথা।" বৃন্দাবনে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর খুব প্রতিষ্ঠা। ইনি ভাগবত ইত্যাদির বেশ ভাল পাঠ করেন।

আজ উড়িয়া বাবার ওখানেও কথা হইতেছিল যে পাঠে এবং কীর্ত্তনে বসিয়া প্রায় সকলেই কিছু না কিছু ঝিমাইয়া থাকেন। উড়িয়া বাবা বলিয়া উঠিলেন — "আমি কিন্তু কখনও মাকে ঝিমাইতে দেখি নাই। চোখ খুলিয়া

কি ভাবে বসিয়া থাকিতে হয় সেই শিক্ষা আমি মার নিকট হইতে নিতেছি। আরও একটা শিক্ষা আমি মার নিকট হইতে নিতেছি তাহা হইল সর্ব্বাবস্থায়ই অবিচলিত থাকা। মা'ত সর্ব্বদাই বলেন "যো হো যায়।" সবটাতেই আনন্দ, কোন চিন্তা নাই, ইহাও বড় চমৎকার!"

১৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

মার জ্বর। কিন্তু উহা নিয়াই হরিবাবার প্রোগ্রামে যাতায়াত করিতেছেন। হরিবাবার কথায় মাত্র দুই এক দিন ভোর বেলা কীর্ত্তনে যাওয়া বন্ধ ছিল।

আগামী ১৮ই বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কাশীর আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা হইবার কথা। সেই সময় এখানকার মহাত্মারা অনেকেই যাইবেন কথা হইয়াছে। সেই সময়ে ভাগবত সপ্তাহও হওয়ার কথা। স্বামী অখণ্ডানন্দজী ভাগবত পাঠ করিবেন। দেরাদুনের সেবা এই ভাগবত সপ্তাহ করাইবে।

উড়িয়া বাবার শরীর অসুস্থ চলিতেছে। মা কাছে গেলেই বড় যত্ন করিয়া মাকে নিজের চৌকির উপর বসান। আর বলেন, "মাইয়া আমার কাছে আসিলেই আমি যেন শক্তি পাই।" মাকে শিশুর মত কোলের কাছে টানিয়া নিয়া কত ভাবেই আদর করেন। মাও 'বাবা বাবা' বলিয়া এমন ভাব প্রকাশ করেন যেন ছোট্ট একটি মেয়ে। উড়িয়া বাবাকে এত যত্ন করিতে দেখিয়া মা একদিন আমাকে একান্তে বলিতেছিলেন, —

উড়িয়া বাবার পরমায়ুর স্বল্পতা সম্বন্ধে মায়ের ইঙ্গিত।

"বাবা যে এবার এত যত্ন করছে, শেষ নয় ত!"

২১শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

বৃন্দাবন বৰ্দ্ধমান কুঞ্জের ম্যানেজার শ্রীযোগেন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সাহায্যে এখানে কিছু জমি পাওয়া গেল। এই জমি যোগেন বাবুই কিনিয়াছিলেন। তিনি ইহা এখন আশ্রমের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। কথা হইয়াছে যে আগামী দোল পূর্ণিমার সময় ঐখানে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করা হইবে। একটি কুটিয়াও তৈয়ার করা আরম্ভ হইল।

২রা চৈত্র, সোমবার।

আজ দোল পূর্ণিমা। খুব ভোরেই হরিবাবা, উড়িয়া বাবা, অখণ্ডানন্দজী এবং মা আশ্রমের জমিতে গেলেন। সঙ্গে আরও অনেক লোক কীৰ্ত্তন করিতে করিতে গেল। ঐখানে কিছুক্ষণ কীৰ্ত্তনাদি হওয়ার পর উড়িয়া বাবার হাত দিয়া মায়ের কুটীরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। এই উপলক্ষে দিল্লী হইতেও অনেক ভক্ত আসিয়াছেন।

বৃন্দাবন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন।

৫ই চৈত্র, বুধবার।

গতকল্য ভোরে ডাঃ জে, কে, সেন মহাশয়ের মোটরে মা বৃন্দাবন হইতে দিল্লী আসিয়া রাত্রিতেই কাশী রওনা হইলেন। আজ কাশীর পথে কিছু সময়ের জন্য এলাহাবাদে নামিয়া মা ঝুসী গেলেন। সেখান হইতে কাশী আসিলাম। প্রভুদত্তজী এবার তাঁহার আশ্রমে বাসন্তী পূজা করিবেন। সেই সময় মাকে ঝুসীতে নিবেন এইরূপ কথা হইয়াছে।

১৪ই চৈত্র, সোমবার।

আজ ভোর ৭টার গাড়ীতে মার ঝুসী যাওয়ার কথা। ইহার মধ্যে হঠাৎ কন্যাপীঠের মেয়ে মঞ্জুর* অবস্থা খুব খারাপ শুনিলাম। মাত্র এক দিনের জর। তাহাও খুব বেশী নয়। মেয়েরা পালা করিয়া সেবা করিতেছে। নানা কাজে আমারও রাত্রিতে ঘুম হয় নাই। ভোরে তাড়াতাড়ি স্নান করিতে যাইব। দেখিলাম মেয়েটি পায়খানা হইতে আসিয়া বিছানায় বসিয়া আছে। তারপর শুইয়া পড়িল। মাথায় যন্ত্রণা, একটু অস্থির ভাব। ইহার মধ্যেই হিক্কা আরম্ভ হইল এবং গায়ের রং বিবর্ণ হইয়া গেল। মা ছাদের উপর বেড়াইতেছিলেন। আমি গিয়া তাড়াতাড়ি মাকে বলিলাম, "মঞ্জুর অবস্থা ত ভাল নয়।" মাও অমনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ভালত নয়ই।" আমি মাকে সঙ্গে নিয়া মঞ্জুর কাছে আসিলাম। আসিয়াই মা বলিলেন, "নাড়ী দেখত।" নাড়ীর গতি এলোমেলো চলিতেছিল। কিছু পূর্ব্বেই ডাক্তার আনিতে পাঠান হইয়াছিল। আশ্রমেও একজন ডাক্তার আছেন। তিনিও দেখিলেন। মা মঞ্জুর মাথায় ও মুখে হাত বুলাইয়া দিলেন। আমাকে বলিলেন, "একটু ঠিক করে শোয়াইয়া দে।" নিজেও কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি আস্তে আস্তে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিলাম। একটু গ্লুকোজ আনিতে বলা হইল। কিন্তু নাড়ীতে হাত দিয়া দেখি সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

কন্যাপীঠের বালিকা মঞ্জুর অকাল মৃত্যু।

কাশীধামে গঙ্গাতটে মায়ের উপস্থিতিতে পবিত্র ফুলের মত একটি কুমারী আজ মায়ের শ্রীচরণে স্থান পাইল।

---

* মায়ের পুরাতন ভক্ত রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ননীদাদার কন্যা

অন্যান্য মেয়েরা কান্নাকাটি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি সকলকে নাম কীর্ত্তন করিতে বলিলাম। মা ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেলেন।

মা আজ চলিয়া যাইবেন বলিয়া ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আশ্রমে আসিয়াছেন। মা তাঁহাদের নিকট মঞ্জুর এই আকস্মিক মৃত্যুর কথা বলিতেছেন। এদিকে ঝুসী যাইবার গাড়ীর সময়ও হইয়া আসিয়াছে। মা বলিতেছেন, "যা' হইবার তা' ত হইয়াই গিয়াছে। ইহার জন্য ঝুসী না যাওয়াটা ঠিক হইবে না। এই রোদের মধ্যে হরিবাবা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিবেন।" ভক্তদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, "শেষ সময়ে ত মা উপস্থিত ছিলেন। এখন মার যা' ইচ্ছা।" শেষ পর্য্যন্ত মার যাওয়াই স্থির হইল। আমি মাকে বলিলাম, "বেশ একটু অপেক্ষা কর। মঞ্জুকে তোমার উপস্থিতিতেই বাহির করিয়া গঙ্গায় লইয়া যাই।" তাহাই করা হইল। নেপাল দাদা ও আমি ধরাধরি করিয়া মঞ্জুকে নৌকায় তুলিয়া দিলাম। মা আশ্রমের ছাদের উপর হইতে ইহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন। পরে ষ্টেশনে রওনা হইয়া গেলেন। আমি সঙ্গে গেলাম না। কাজ শেষ করিয়া বিকালে রওনা হইলাম।

ঝুসীতে প্রভুদত্তজীর আশ্রমে মা।

মা ঝুসীতে পৌঁছিয়াই লোক মারফতে সংবাদ পাঠাইলেন যে ঘরে মঞ্জুর দেহত্যাগ হইয়াছে সেই ঘরে যেন প্রত্যহ গীতা এবং যোগবাশিষ্ঠ পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি হয়। আর সন্ধ্যা বেলা উহার আত্মার কল্যাণের জন্য সকলে যেন সমবেত ভাবে প্রার্থনা করে। তিন দিন এই ভাবে চলিবে। চতুর্থ দিন কুমারী ভোজন করান হইবে। সাধুদের দেহ ত্যাগ হইলে যেমন সাধুদিগকে ভাণ্ডারা দেওয়া হয় সেইরূপ যে কুমারী সংসার ছাড়িয়া আসিয়া এইভাবে আশ্রমে দেহত্যাগ করে তাহার জন্যও কুমারী ভোজনাদি করান হইবে।

১৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

ঝুসীতে দুই দিন থাকিয়া গতকালই মা পুনরায় কাশী চলিয়া আসিলেন। আজ সমস্ত কুমারীদিগকে মালা চন্দন দিয়া ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। মাও সকলকে নিয়া মেয়েদের হলে বসিয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে ১১॥ টা পর্য্যন্ত সকলে মার নিকট বসিয়া মঞ্জুর বিষয়ে আলোচনা করিলেন। মেয়েরা মঞ্জুর সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়াছিল তাহাও পাঠ হইল। সকলেই মঞ্জুর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাত্র চারি মাস হইল মেয়েটি আশ্রমে আসিয়াছিল। ইহার মধ্যেই সে মায়ের চরণে চির শান্তি লাভ করিল।

মঞ্জুর মৃত্যুর পর তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য পাঠ, কীর্ত্তন এবং প্রার্থনাদি করার যে সকল ব্যবস্থা মা করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে অমূল্য দাদা মাকে প্রশ্ন করিলেন যে কাশীধামে, গঙ্গাতটে এবং শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে যাহার দেহত্যাগ হইল এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণে যে মায়ের মঙ্গল করস্পর্শ লাভ করিয়া গেল তাহার আত্মার কল্যাণ বা উর্দ্ধগতির জন্য কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি?

মা উত্তর করিলেন, **"তোমাদের বিশ্বাস যদি ঐরূপই হয় তাহা হইলেও এই সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ মুক্ত পুরুষদের বিষয় চিন্তা করিলে নিজেদেরই কল্যাণ হয়।"** মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছে যে তাহারা প্রার্থনার সময় মায়ের চরণে ইহাই প্রার্থনা করিয়াছে যে তাহারাও যেন মঞ্জুর মত মাতৃচরণে স্থান লাভ করিতে পারে।

ইতিমধ্যে একটি কথা লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। মঞ্জুর মৃত্যুর পর

গত ১৪ই চৈত্র, সোমবার মা ঝুসীতে যাওয়ার পর দিনই বৃন্দাবন হইতে সংবাদ আসিল যে গত সোমবার দিনই উড়িয়া বাবা আকস্মিকভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। উড়িয়া বাবার আশ্রমে ঠাকুর দাস নামে একজন ভক্ত থাকিত। তাহার মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত ছিল। সোমবার দিন অপরাহ্নে উড়িয়া বাবা যখন কীর্ত্তন মণ্ডপে পাঠে বসিয়াছিলেন সেই সময় ঠাকুর দাস পশ্চাৎ হইতে আসিয়া উড়িয়া বাবার মস্তকে হঠাৎ একটি কুঠার দ্বারা তিনবার আঘাত করে। ঐ আঘাতের ফলে তৎক্ষণাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং উহার ১॥ ঘণ্টা পরেই দেহত্যাগ করেন। যাঁহারা ঐ সময় কীর্ত্তন মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ঠাকুর দাসের এই নৃশংস হত্যা কাণ্ড দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তখনই তাহাকেও খুন করিয়া ফেলেন। ঝুসীতে আমরা এই সংবাদ পাইয়া সকলেই হতভম্ব হইলাম। ঐরূপ একজন বিশিষ্ট মহাত্মার এইভাবে জীবন নাশে আমরা সকলেই প্রাণে বিশেষ আঘাত পাইলাম। হরিবাবাও এই সংবাদ ঠিক বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

বৃন্দাবনে উড়িয়া বাবার শোচনীয় মৃত্যু।

২০শে চৈত্র, রবিবার।

আজ পুনরায় ঝুসী পৌছিয়া দেখি যে হরিবাবা বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছেন। প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীও একদিনের জন্য প্লেনে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

আজ ঝুসী আশ্রমে বাসন্তী পূজা আরম্ভ হইল।

নাথজীও চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে গদগদ ভাবে মার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। পরে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৯ই বৈশাখ শুক্রবার।

দেবীগিরি মহারাজ * কয়েকদিন হয় এখানে আছেন। তাঁহাকে দোতালায় পিতৃমন্দিরে রাখা হইয়াছে। মা তাঁ'র কাছে গেলেই তিনি মাকে একেবারে টানিয়া নিজের বিছানায় বসান। আর মাও শিশুর মত 'পিতাজী' 'পিতাজী' করেন। দেবীগিরি মহারাজের বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইবে। তিনি উত্তর কাশীতেই থাকেন। সেইজন্য এদিকে তাঁহার গরম বোধ হয়। শীঘ্রই উত্তর কাশীতে চলিয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে তিনি ডুঙ্গাতেও গিয়াছিলেন। সেখানে চৌধুরী সের সিং সপরিবারে তাঁহার খুব সেবা করিয়াছেন ঐ কথা বলিয়া তিনি আজ মায়ের নিকট খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন।

মা দেবীগিরিজীর নিকট হইতে যখন নীচে চলিয়া আসিলেন তখন কুসুম খুব দুঃখের সহিত মাকে বলিল, "সাধুরা বেশ আনন্দে আছে দেখছি — আর আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে কিছুই হচ্ছে না।"

সর্ব্বদা ভগবানের অভাব বোধই তপস্যা।

"মা — বাঃ কত সুন্দর কথা! এই যে কিছু হচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না এ ভাবটাও ত তাঁকে স্মরণ করেইত হচ্ছে। ইহাও সুন্দর।

* পরম পূজ্য শ্রীযুক্ত দেবীগিরি মহারাজ। প্রায় ৫০ বৎসর ইনি উত্তর কাশীতে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে সকলেই ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। গত কয়েক বৎসর হয় ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

সর্ব্বদাই মনে রাখবি তিনি আছেন। আমি তাঁর কাছে থাকতে পারি আর না পারি তিনি আমার কাছে আছেনই। সর্ব্বদা অখণ্ড ভাবে এই চিন্তা।"

কুসুম — "ভগবান কই ?"

মা — "ভগবান ছাড়াত কিছুই নাই।"

কুসুম — "তুমিত বলছ কিন্তু আমার বিশ্বাস কই ?"

মা — "বিশ্বাস কর।"

কুসুম — "শুধু কথার বিশ্বাস নিয়া আর কতটুকু সময় থাকা যায় ?"

মা — "এই পথ ধরেছিস্, পড়ে থাকবি। এক সময় কখন যে ঠেলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে তুই তার কি জানবি ? চেহারা বেশ মানিয়েছে কিন্তু।"

কুসুম — "এ সব ত বাহিরের এতে কি হয় ?"

মা — "ঋষিদের চিহ্ন। তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চুল দাড়িত কাহাকেও দেখাবার জন্য নয়। ওই ঋষিদের চিহ্ন হিসাবে রাখা। তোদেরওত যজ্ঞের জন্য ঘটনা চক্রে রাখা হয়ে গেছে। তাঁরই সেবা, তাঁরই কথা। যেখানে তাঁর কথা হয় সেখানে বাস করা। কত ভাগ্য যে এই পথের চেষ্টা। 'হয় না' 'হয় না' এই ভাব নিয়ে যে তাঁর জন্য নিঃশ্বাস পড়ে — এইত তপস্যা।"

মনোহরও একদিন দেবীগিরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল —

"মহারাজ এত কাল সাধুসঙ্গ করিতেছি, কিছুইত হইতেছে না। কি উপায় হইবে আমাদের ?" গিরি মহারাজ উত্তর দিয়াছিলেন — "সঙ্গ করিয়া যাও। কাল আসিলেই হইয়া যাইবে।"

মনোহর — "মনত ঠিক হইতেছে না। কাম ক্রোধ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।"

গিরি মহারাজ — "আরে এই যে চেষ্টা করিতেছ ইহাও তাঁহার কাছে প্রিয়। শিশু সন্তান পিতার কোলে বসিয়া আছে। বসিয়া বসিয়া পিতার দাড়ি টানিয়া টানিয়া ছিড়িতেছে। পিতা কিন্তু কষ্ট বোধ করিতেছে না। সে মনে করিতেছে — তবুওত দাড়ি ছিড়িবার লায়েক হইয়াছে। ইহাই পিতার আনন্দ। সন্তানের উল্টা সিধা কাজেও পিতার ক্রোধ নাই, বিরক্তি নাই।"

১৯শে বৈশাখ, সোমবার।

আজ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। খান্না হইতে শ্রীত্রিবেণী পুরীজীও আসিয়াছেন। তিনি সচরাচর নিজের আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও যান না, কিন্তু মায়ের ডাক উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনিও আসিয়াছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী, অবধূতজী, বম্বের কৃষ্ণানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ শিষ্যসহ আসিয়াছেন।

দেরাদুনে মায়ের জন্মোৎসব

সেবাজীর ভাগবত সপ্তাহও আরম্ভ হইয়াছে। বৃন্দাবনের স্বামী অখণ্ডানন্দজী ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং বাটুদাদা ভাগবত পাঠ করিতেছেন। এইজন্য দুই ঘরে ব্যাসাসন সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খুবই আনন্দ চলিতেছে।

১লা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

আজ মার জন্মতিথির পূজা। হল ঘরে এই পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। মাকে একটি সাজান চৌকির উপর আনিয়া বসান হইল। সামন্ত বাবুর স্ত্রী ও কন্যা মাকে ফুলের সাজে সাজাইয়া দিলেন। মা কিন্তু বসিয়া পূজা গ্রহণ করিলেন না। তিনি কাপড় মুড়ি দিয়া চৌকির উপর শুইয়া পড়িলেন। কুসুম ব্রহ্মচারী মায়ের পূজা করিল। পরে ৫৬ পদের ফল মিষ্টি দ্বারা মায়ের ভোগ হইল।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

রায়পুর এবং কিষণপুরে নূতন গৃহপ্রবেশ

আজ প্রাতে মাকে লইয়া রায়পুর যাওয়া হইল। ৺যমুনা লাল বাজাজজী এখানে কিছু জমি ক্রয় করিয়া উহা মাকে আশ্রমের জন্য দিয়াছিলেন। সেই জমির উপর পণ্ডিত পরশু রামজীর অর্থে একটি আশ্রম হইয়াছে। সেই বাড়ীতে মা আজ সাধুদের সহ প্রবেশ করিলেন। মায়ের ভোগের বন্দোবস্তও হইয়াছে। সারাদিন এখানে থাকিয়া সন্ধ্যায় কিষণপুর ফিরিয়া আসা হইল।

শচী দাদাও* বিদ্যাপীঠের জন্য কিষণপুরে যে জমি কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন ঐখানে মায়ের জন্য সুন্দর একটি কুঠীয়া বানান হইয়াছে সেখানেও ইতিমধ্যে মা এবং সাধুদের সহিত ঐ কুঠীয়াতে গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

---

* ৺শচীকান্ত ঘোষ, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনকাম্ ট্যাক্স কমিশনার। কিষণপুর আশ্রমেই ইনি দেহরক্ষা করেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

সকলে মিলিয়া আজ ডুঙ্গা যাওয়া হইল। চৌধুরী সাহেব আমাদের খুব যত্ন করিলেন। আমরা দিনে ঐখানে থাকিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলাম। . . . .

. . . .

৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

গত পরশু মার সঙ্গে মুসৌরী গিয়াছিলাম। সেখানে মনসা রামজীর পৌত্র চন্দ্রকান্ত বাবু তাঁহার একটি নূতন বাড়ীতে সকলের থাকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সারাদিন থাকিয়া বিকালবেলা কিষণপুরে ফিরিয়া আসা হইল।

আজ প্রাতে ত্রিবেণী পুরীজী প্রভৃতিকে লইয়া হরিদ্বার এবং হৃষীকেশে যাওয়া হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার ফিরিয়া আসিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

ভোরবেলা মা শুইয়া শুইয়া আমাকে বলিতেছেন, "কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মুসলমানদের অত্যাচারে স্ত্রীলোকেরা বাধ্য হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। না করলে মৃত্যু অবধারিত। কেউ কেউ আবার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে চিন্তা করছে।"

স্বপ্নে মুসলমানদের অত্যাচার দর্শন

মুসৌরী হইতে ঘুরিয়া আসিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বরূপানন্দজী, কৃষ্ণানন্দজী প্রভৃতি সশিষ্যে দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া গেলেন। চক্রপানীজী এবং রামদেবানন্দজীও এই সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ত্রিবেণীপুরীজীরও শীঘ্র

চলিয়া যাওয়ার কথা হইয়াছিল। কিন্তু মা তাঁহাকে বলিলেন — "পিতাজী এই গরমে আর গিয়ে কাজ কি? ২৪।২৫ দিন পরেইত আবার সোলনে যাওয়া হবে।" মায়ের এই কথা শুনিয়া তিনি রহিয়া গেলেন।

ত্রিবেণী পুরীজী খুব উচ্চাবস্থার সাধু। ভাবটি যেন একেবারে শিশুর মত। ইনি আপন ভাবেই বেশী থাকেন। কেহ কাছে গেলে তাহার সহিত সদালোচনা করেন। ইনি কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছেন, "মাকে কেহই চিনিতে পারে নাই। মায়ের কোন সঙ্কল্প বিকল্প নাই।" তাঁহার সেবক চেতনপুরী বলেন, "মহারাজজী ফল ইত্যাদি খাইতে চান না। কিন্তু যদি বলা হয় যে মাতাজী আপনাকে এই ফল পাঠাইয়া দিয়াছেন তবে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা খাইয়া ফেলেন। কোথাও হয়ত যাওয়ার ইচ্ছা নাই কিন্তু যেইমাত্র শুনিলেন। যে মাতাজী তাঁহাকে যাইতে বলিয়াছেন অমনি বৃদ্ধ উঠিয়া রওনা হইলেন।"

মায়ের প্রতি ত্রিবেণী পুরীজীর শ্রদ্ধা

কথা হইয়াছে সোলনের রাজা সাহেব দেবী ভাগবত পাঠ করাইবেন সেই উপলক্ষ্যে তিনি মাকে সোলনে নিবেন। হরিবাবা এবং ত্রিবেণী পুরীজীকেও তথায় যাইতে বলিয়াছেন। তাঁহারাও সম্মত হইয়াছেন। আগামী ৬ই আষাঢ় তথায় সকলে পৌছিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে। ইতিমধ্যে ত্রিবেণীপুরীজী হঠাৎ খান্না চলিয়া গেলেন।

৫ই আষাঢ়, রবিবার।

কয়েকদিন হয় একটা দুর্ঘটনা হইয়া গেল। প্রায় ৭।৮ মাস পূর্ব্বে ফরেষ্ট কন্সার্ভেটর ধরণীধর যোশীর ছেলে পূরণ মায়ের আশ্রমে আসিয়াছিল।

সে বি,এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে মনস্থ করিয়া একটি ঘরের মধ্যে নিজকে কপাট বন্ধ করিয়া রাখে। ঐভাবে সাত দিন গেলে তাহার পিতামাতা অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে লইয়া আসেন। ঐ সময় মা দেরাদুনে ছিলেন। মা ছেলেটিকে কিছু খাওয়াইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান। ছেলেটির স্বভাব খুবই চমৎকার ছিল। সে মনপ্রাণ দিয়া মায়ের সেবা করিত। মাকে যে সে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিত এ কথাও সে পরে বলিয়াছে। এ যাবতকাল মা তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে তাহাকে কাশী লইয়া যান। ছেলেবেলা হইতেই নাকি ছেলেটি শুদ্ধাচারী, সন্ধ্যাপূজাতেও তাহার বেশ মন, চরিত্রটিও নিষ্কলঙ্ক। আত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধবের পীড়াপীড়িতে আহার ব্যাপারে তাহার একটু অনাচার হইয়াছিল। এইজন্য কাশীতে পৌছিয়া মা বিধিমত ছেলেটির মস্তক মুণ্ডন এবং গঙ্গাস্নান করাইয়া তাহাকে যজ্ঞের কাজে লাগাইয়া দেন। সে যজ্ঞশালায় বসিয়া জপ করিত।

পূরণের অসুখ এবং দেহত্যাগ

এবার দেরাদুন হইতে আসিবার সময় মা তাহাকে কাশী রাখিয়া আসেন ; কিন্তু এখানে পৌছিয়া পূরণকে এখানে আসিবার জন্য লিখিয়া দিতে বলেন। চিঠি পাইয়াই পূরণ চলিয়া আসে। এদিকে তাহার পিতাও দেরাদুন হইতে নৈনীতালে বদলী হইবার আদেশ পাইলেন। নৈনীতাল যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি মায়ের উৎসবে কিষণপুর আসিলেন। ছেলেটির সহিত বাপ মার দেখা হইল। মা বলিয়াছিলেন যে এইজন্যই তিনি পূরণকে কাশী হইতে দেরাদুনে আনাইয়াছেন। পূরণের পিতার ছুটি শেষ হইলে তিনি নৈনীতাল চলিয়া গেলেন।

এদিকে পূরণের কয়েক দিনের মধ্যেই জ্বর হইল। জ্বর ছাড়িতেছে

না দেখিয়া এবং আশ্রমেও স্থানাভাব লক্ষ্য করিয়া পূরণের পিতৃবন্ধু (ইনিও ডেপুটি ফরেষ্ট অফিসার) জহুরী বাবু পূরণকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। দেরাদুনে চাকুরী করার সময় এই বাসাতেই পূরণের পিতা এবং জহুরীবাবু একসঙ্গে ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই মায়ের ভক্ত। ঘটনা চক্রে যে ঘরে পূরণ অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল সেই ঘরেই তাহাকে নিয়া রাখা হইল। ইহা দেখিয়া পূরণও নাকি বলিয়া উঠিয়াছিল, "আবার সেই ঘরেই আসিলাম।"

তাহার রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে জরটা টাইফয়েড বলিয়া ধরা পড়িল। চিকিৎসার কোনই ত্রুটি হইল না। মা প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া দেখিয়া আসিতেন। মা দেখিতে গেলে সে মায়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত। মা একদিন হরিবাবাকে সঙ্গে করিয়া পূরণের কাছে লইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে শুনা গেল যে পূরণ নিজেই বলিয়াছিল যে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে তাহার খুব অসুখ হউক আর মা বারবার আসিয়া তাহাকে দেখুন। এই কথা শুনিয়া হরিবাবা পূরণকে বলিলেন, "পূরণ, তুমিত নিজে ইচ্ছা করিয়া এই অসুখ আনিয়াছ, এখন উহাকে বিদায় করিয়া দাও।" পূরণের কথা বলিবার সামর্থ্য নাই তবুও সে উত্তর করিল, "সে কথা এখন নাই, উহা বদলিয়া গিয়াছে।" হরিবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?" উত্তর হইল, "এখন আর সেই শক্তি নাই।" হরিবাবা বলিলেন, "তোমার ভিতরেই শক্তি আছে, কিছু অনুষ্ঠান করা হইবে তাহা হইলেই ঐ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।" কতকটা নিরাশ ভাবেই পূরণ বলিল, "বেশ, করুন।"

পূরণের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহার মা একদিন আশ্রমে আসিয়া মায়ের পায়ে কাঁদিয়া পড়িলেন। কিন্তু মা তাহাকে

কোনই সান্ত্বনা বাক্য বলিলেন না দেখিয়া আমরাও চিন্তিত হইলাম। বিকাল বেলা মা পূরণকে দেখিতে গেলেন। মা ঘরের ভিতর যান না। বাহিরে দরজার সম্মুখে বসিয়া আছেন। পূরণ এক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাইয়া আছে। আমি তাহার কাছে বসিয়া বলিলাম, "ভাই, কেমন আছ?" পূর্ব্বেও একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু সে উহার কোন জবাব দিতে পারে নাই, সে এতই দুর্ব্বল এবং নিস্তেজ ছিল। কিন্তু আজ বেশ স্পষ্ট ভাবে বলিল, "দিদি, ভাল নাই।" এই বলিয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া খুব হাসিতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীরে এই হাসি দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া তাহার বুকে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিলাম। সেও তাহার দুর্ব্বল হাত দু'খানি জোড় করিয়া যেন প্রণাম করিতেছে এই ভাব প্রকাশ করিল। এদিকে মাকে উঠিতে বলিয়া আমি পূরণের নিকট বিদায় লইয়া মার কাছে গেলাম। মাকে সকল কথা বলিলে মা বলিলেন, "আমিত উহাকে বলিয়া আসি নাই" — এই বলিয়া আবার পূরণের দরজার কাছে গেলেন। সেই সময় ঐখানে কেহ ছিল না। পূরণ মার দিকে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন, "পূরণ, আমি যাই?" সে "আচ্ছা" বলিয়া মাথা নাড়িল। মা দুই তিনবার ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া আসিলেন। মায়ের ভাব দেখিয়া আমার মনে হইল যে মা বুঝি শেষ বিদায় লইতেছেন, কারণ এইরূপ আরও হইতে দেখিয়াছি।

রাত্রি প্রায় ১২টায় জহুরীর স্ত্রী বিদ্যা ও রামসিং ভাই আসিয়া উপস্থিত। বিদ্যা বলিতেছেন, "মা, উহাকে বাচাও। আমিই গরজ করিয়া বাসায় নিয়া গেলাম, আমার মুখ রক্ষা কর। অবস্থা বড়ই খারাপ।"

মা বলিলেন, "কিছুই বলা আসছে না। দেখছি ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তুমি বাসায় নিয়েত ভালই করেছ। এই জন্যইত উহাকে কাশী

হতে আনান হয়েছে। পিতা মাতার সঙ্গে দেখা হল। অসুখের প্রথম অবস্থাতেইত একদিন বলা হয়েছিল তুমি এখানে থাকবে না আশ্রমে যাবে? পূরণ বলেছিল 'এখান হইতে ভাল হইয়াই যাইব।' এই শরীরেরও খেয়াল হল না যে বলে সঙ্গে নিয়ে আসা।"

মায়ের কথায় বেশ বুঝা গেল যে পূরণ বাচিবে না। দুই দিন হইল উহার মঙ্গলের জন্য আশ্রমে প্রায় সকলেই জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহার বৃদ্ধ পিতাও চণ্ডী পাঠ করিতেছেন।

একজন মাকে একবার পূরণের কাছে যাইতে বলিল। মা বলিলেন, **"এখন গিয়া কি হবে? রাত্রিতে এতদূর হ'তে দেখতেও পাবে না। তাহা ছাড়া যাওয়ার এখন আর খেয়ালই হচ্ছে না।"**

পরদিন প্রত্যুষে পূরণের পিতা এবং রাম সিং আসিয়া খবর দিল যে গত রাত্রি ৩টায় পূরণ চলিয়া গিয়াছে। উহারা এখনই পূরণের মৃতদেহ নিয়া হরিদ্বারে যাইতেছে। তথায় সৎকার করিয়া উহার পিতামাতা ঐখান হইতেই কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইবে। আশ্রম হইতে কয়েকজন ব্রহ্মচারীও তাঁহাদের সঙ্গে হরিদ্বার চলিয়া গেল।

দেবীজী (রুমা দেবী) ও রামসিং ভাইয়ের স্ত্রী মৃত্যু সময়েতে কাছে ছিল। তাহাদের মুখে শুনা গেল যে, রাত্রি প্রায় ১২টা কি ১টার সময় পূরণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কে আসিয়াছে?" যেন কাহাকেও কাছে দাঁড়ান দেখিতেছে। উহারা বলিল, 'মা আসিয়াছেন।" তখন মুখের ভাব অতি প্রসন্ন হইল আর 'মা' 'মা' করিতে লাগিল। অবস্থা খুবই খারাপ দেখিয়া ডাক্তার সোম ইন্‌জেকশন করিতে গিয়া শুনিতে পাইলেন যে পূরণ 'মা' 'মা' করিতেছে। পরে ঐ ভাবেই অতি কষ্টে হাত উঠাইয়া প্রণাম করিল। পবিত্র আত্মা অমর ধামে চলিয়া গেল।

মা বলিলেন, "উহার এখন যাওয়ারই ছিল। আর দেখ, যে ঘরে পূর্ব্বে মৃত্যু সঙ্কল্প করেছিল সেই ঘরেই দেহত্যাগ হল। তবে এখন কত শুদ্ধ ভাবে। ও বড় পবিত্র ছিল। ঠিক সাধারণের মত ছিল না — বিশেষত্ব ছিল। সংসারের মধ্যে বেশী সময় থেকে ময়লা মাখার সংস্কার উহার ছিল না। তাই এখনই ফুলের মত চলে গেল। বেশী দিন থাকলে এই ভাব থাকত কিনা কে জানে?"

কাশীতেও লিখিয়া দেওয়া হইল যে পূরণের জন্য তিন চারি দিন পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়া চতুর্থ দিনে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের যেন ভোজন করান হয়। এখানেও চতুর্থ দিনে সারা দিন কীর্ত্তন এবং বালকদের ভোজন ইত্যাদি করান হইয়াছে। এই উপলক্ষে মাও বলিয়াছিলেন, "এরা শুদ্ধ সংস্কার নিয়ে গৃহ পরিবার ছেড়ে আশ্রমে এসেছে। এদের স্মৃতির জন্য তোমাদের এই সব করা দরকার। ধর্ম্মের সম্বন্ধইত বড়। সংসারের মধ্যে মোহের বন্ধনে থেকে লোকে কত কি করে, আর তোমরা কিছুই করবে না এটা ঠিক না।"

পূরণের মৃত্যুতে আমাদের বড়ই আঘাত লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই চরিত্রের মাধুর্য্যের জন্য সে সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

৬ই আষাঢ়, সোমবার।

মা সোলনে আজ আসিলেন। সোলনের রাজা সাহেব দেবী ভাগবত পাঠ করাইবেন। সেই উপলক্ষ্যেই মা এবং হরিবাবা প্রভৃতি আসিয়াছেন। ত্রিবেণী পুরীজীকেও মোটর

সোলনে শ্রীশ্রীমা

পাঠাইয়া খান্না হইতে আনা হইয়াছে। সোলনে আবার আনন্দের হাট বসিয়াছে।

ত্রিবেণী পুরীজীকে আমি বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, আপনি কিষণপুরে থাকিবেন বলিয়া হঠাৎ খান্নায় চলিয়া গেলেন কেন?"

পুরীজীর শিষ্য চেতন পুরীজী উত্তর দিলেন, "চলিয়া গেলে কি হয়, এমন দিন যায় নাই যে বাবা মাতাজীর কথা বলেন নাই।" শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ত্রিবেণী পুরীজীর অসীম ভক্তি।

১০ই আষাঢ়, শুক্রবার।

একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। অমূল্যদাদা সপরিবারে এবং মনমোহন দাদার স্ত্রী ও মেয়েরা আমাদের সহিত দেরাদুন হইতে সোলনে আসিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে সিমলা দেখে নাই বলিয়া মা রাজা সাহেবের বাসে তাহাদিগকে সিমলা দেখিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। উহারা রওনা হইয়া গেলে পর মা শ্রীমতী রেণুকে একান্তে বলিলেন — "দেখছি একটা বাসের সঙ্গে একটা মোটর গাড়ীর ভয়ানক ধাক্কা লাগতে যাচ্ছে। এর মধ্যে এই শরীরটা সেইখানে উপস্থিত। খেয়াল হল ধাক্কা লাগতে দেওয়া না। অল্পের জন্য কেটে গেল। একটি লোক আতঙ্কে শুধু কেঁপে উঠল। এখন কাহাকেও কিছু বলিস না।" রেণুর কিন্তু ইহাদের জন্য খুব চিন্তা হইল।

মায়ের কৃপায় বিপদ হইতে রক্ষা

বিকালে সিমলা হইতে সকলে ফিরিয়া আসিলে রেণু মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিল — "তোদের বাসের কোন গোলমাল হয় নাই ত?" মেয়েরা বাসের

ভিতরে ছিল তাহারা বাহিরের কোন খবরই রাখে না, তাহারা বলিল "না, কিছুই হয় নাই।" ইহা শুনিয়া রেণু মায়ের দিকে তাকাইল। মা চুপ করিয়া রহিলেন। বিষ্ণু নামে একটি ছেলে ইহাদের সঙ্গে সিমলা গিয়াছিল। সে বাসের সম্মুখের দিকে বসিয়াছিল। সে একটু পরে আসিয়া মাকে বলিতেছিল "মা, আজ ভয়ানক বিপদ হইয়া যাইত। একটা মোটর গাড়ীর সঙ্গে আমাদের বাসটা ধাক্কা খাইতে খাইতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। আমিত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি রক্ষা করিলেন।" রেণু এইকথা শুনিয়া হাসিল, মাও হাসিলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে অমূল্য দাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন — "আমরা যদি সোলনে না আসিতাম তবেত এই বিপদ আসিতে পারিত না।" মা হাসিয়া বলিলেন — "তোমাদের যে আসিতেই হইবে।" তারপর কথায় কথায় মা বলিলেন, "এই শরীরটার ত যখন যা' হয়ে যায়। আজ তোমরা রওনা হওয়ার পর হতেই খেয়াল হচ্ছিল সকলে যেন হাসিমুখে ফিরে আসে। পাঠে যখন বসা হল তখনও খেয়াল হচ্ছিল এই ঘটনা হতে দেওয়া হবে না। যখন এইরূপ হয় তখন খেয়াল মত কাজ না হয়ে যায় না। আবার কত বিপদ হয়ে যাচ্ছে পাশে দাঁড়িয়ে বেশ দেখা হচ্ছে, কোন রকম কিছু খেয়ালই আসছে না।"

১৩ই আষাঢ়, সোমবার।

আজ দেবী ভাগবতের মাহাত্ম্য পাঠ হইল। আগামী কল্য হইতে পাঠ আরম্ভ হইবে। নয় দিন পাঠ চলিবে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে

দেবী ভাগবত পাঠ এবং প্রদোষ ব্রত সমাপন

রাজাসাহেব সস্ত্রীক প্রদোষ ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রতও এই সময় শেষ হইবে। দেবী ভাগবত পাঠের জন্য রাজাসাহেব কাশী হইতে বাটু দাদাকে আনাইয়াছেন।

২২শে আষাঢ়, বুধবার।

দেবী ভাগবত পাঠ সমাপ্ত হইল। রাজাসাহেব পাঠককে যথোপযুক্ত দক্ষিণাদি দিলেন। গতকাল রাজাসাহেব নির্জ্জলা উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রদোষ ব্রতের শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূজা শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল।

২৪শে আষাঢ়, শুক্রবার।

প্রদোষ ব্রতের জন্য দুই প্রস্ত শয্যা দান করিলেন। দানের জিনিষ পত্রাদি ছিল — ধুতি, শাড়ী, রেশমের জামা, শাল, বিভিন্ন প্রকারের সোনার গহনা, প্রসাধনের নানা প্রকার সামগ্রী, খাট, বিছানা, রূপার বাসন পত্র ইত্যাদি। দুই প্রস্ত দানই তুল্যরূপ। একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া কষ্ট সাধ্য বলিয়া রান্নার বাসন পত্র এবং টেবিল চেয়ারাদির পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। দুই ব্রাহ্মণ দম্পতি পোষাক এবং অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া দুই খাটে বসিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ জ্ঞানে তাঁহাদিগকে আরতি করা হইল। তাঁহারাও বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ফলদ্বারা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। রাজা সাহেব স্বয়ং উপস্থিত সমস্ত

ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন করিলেন এবং তাহাদের ভোজনান্তে নিজ হাতে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়া অনেক বেলায় জল গ্রহণ করিলেন। সকলেই রাজা সাহেবের ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, শাস্ত্রীয় কার্য্যে নিষ্ঠা এবং মুক্তহস্ত দানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সোলনের রাণী সাহেবাকে স্বপ্নে দর্শন

মা আজ সকালে বলিতেছিলেন, "গতকাল রাণীকে* দেখছিলাম। রাজা সাহেবের এই সব কাজে সঙ্গে সঙ্গেই আছে। কাল যখন প্রদোষের পূজা হচ্ছিল তখনও সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। তাহার ভাবটা এই রকম দেখাচ্ছিল যে পাঠ ইত্যাদি সব শুনে যেন এই কাজ করিতেছে। আজ সকাল বেলাও সব কাজেই পার্শ্বে বসা। একেবারে পরিষ্কার দেখা।"

রাণী সাহেবার পরিধানে কি রকম শাড়ী, কি রকম ব্লাউজ ছিল তাহাও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিলেন। গহনাদি কি কি গায়ে ছিল তাহাও বলিলেন।

২৫শে আষাঢ়, শনিবার

শেষ রাত্রি প্রায় ৩টায় হরিবাবা, মা ও আমরা কয়েকজন মোটরে দিল্লী রওনা হইয়া আজ সকালে দিল্লী পৌছিলাম। ঐখানকার ভক্তেরা নাম যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে। সন্ধ্যায় অধিবাস হইল।

---

*সোলনের রাণী সাহেবা যে দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

২৭শে আষাঢ়, সোমবার

গতকাল বেশ ভালমতই নামযজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে। মেয়েরা ৪টা অবধি কীর্ত্তন করিলেন। আজ ৯টার গাড়ীতেই মার সঙ্গে আমরা কাশী রওনা হইলাম।

২৮শে আষাঢ়, মঙ্গলবার

সকাল বেলা মা এলাহাবাদে নামিয়া সোজা "কৃষ্ণকুঞ্জে" গেলেন। সেখানে সারাদিন থাকিয়া সন্ধ্যা ৬টার গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় ১১টায় আমরা কাশী পৌছিলাম।

৩রা শ্রাবণ, সোমবার

কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা গঙ্গা দিদির মা আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ রোগে শয্যাগত আছেন। তিনি কাশীতেই বাসা করিয়া আছেন। পূর্ব্বে একবার গঙ্গা তীরে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য আশ্রমে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে আবার তিনি তাঁহার বাসায় চলিয়া যান। এবার কাশীতে আসিয়া মা'যখন জানিতে পারিলেন যে গঙ্গাদিদির মায়ের অবস্থা একটু বেশী খারাপ হইয়াছে তখনই তাঁহাকে দেখিতে গিয়া একেবারে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে লইয়া আসিলেন।

কাশী আশ্রমে গঙ্গা দিদির মায়ের মৃত্যু

গতকাল ঘর হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে গঙ্গার ধারে হল ঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। আজ জ্ঞান থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে ভুল বকিতে লাগিলেন

—বাড়ী বিক্রয়ের কথা, দলিল রেজেষ্টারি করিবার কথা, নিজের ছেলের কথা ইত্যাদি কতকটা অসংলগ্ন ভাবে বলিতে লাগিলেন। এই সব কথা শুনিয়া মা তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন,—**"মা, তোমার ত বাড়ীঘর কিছুই নাই। সবই গুরু নিয়ে গিয়েছেন। কাজেই আর রেজেষ্টারি করতে হবে না। তুমি ঐ সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শুধু গুরুকে চিন্তা কর। আর ছেলে? সে ত চাকুরী করেই খাচ্ছে। ছেলেকে গুরুই দেখবেন। গুরুই সব ব্যবস্থা করবেন। তুমি শুধু গুরুর চিন্তা কর।"**

এইসব কথা বলিয়া মুখের কাছে গিয়া বলিতেছেন—**"জয় গুরু, জয় গুরু, কি বল?"** বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া ঐ কথা মানিয়া নিল। মা বলিলেন,—**"এই ভাবে সৎ ভাব গুলি ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার।"**

বিকাল বেলা মা আবার হল ঘরে গেলেন। বৃদ্ধা আশ্রমে আসার পর মা প্রায়ই তাহাকে গিয়া দেখিয়া আসিতেছেন। বিকাল বেলা গিয়াও দেখিলেন যে বৃদ্ধার বেশ জ্ঞান আছে। জপের মালাটি হাতেই আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিলেন। তারপর হল ঘরের অন্যদিকে সকলকে নিয়া বসিলেন। ডাঃ পান্নালাল মাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছিলেন, কিন্তু সে দিকে মায়ের বড় খেয়াল নাই। মায়ের যেন খেয়াল রহিয়াছে বৃদ্ধার শ্বাসের উপর।

একটু পরেই সন্ধ্যা হইল। আশ্রমে আরতির কাসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার শ্বাসের গতিও খারাপ হইয়া উঠিল। আত্মানন্দজী (মিস ব্ল্যাঙ্কা) মাকে একটি মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। মা মালাটি হাতে করিয়াই ছিলেন। এইবার ঐ মালাটি আনিয়া তিনি বৃদ্ধার গলায় পরাইয়া দিলেন। হাত দিয়া বুকও একটু স্পর্শ করিলেন। নাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গঙ্গাদিদি শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার মাতার মস্তক স্পর্শ করিতে বলায় মা অমনি বৃদ্ধার মস্তক

হইতে পা অবধি সর্ব্বাঙ্গে দুই তিন বার হাত বুলাইয়া দিলেন। ইহার পরই বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কাশী ক্ষেত্রে, গঙ্গা তটে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে বৃদ্ধা সজ্ঞানে নাম করিতে করিতে মহাযাত্রা করিলেন। গঙ্গা দিদি মাকে বলিলেন, "মা, জীবনে ইনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। আর যেন কষ্ট পাইতে না হয়। উর্দ্ধগতি যেন হয়। মা বলিলেন, **"হঁা, ইনি এতদিন যে কষ্ট পেয়েছেন তার কারণই হল যে ইনি নিজের কর্ম্মক্ষয় করে যাচ্ছেন। বেশ চমৎকার গিয়েছেন।"**

ডাঃ পান্নালালজী বলিতেছেন, "মা, আমারও এইরূপ যেন হয়। এমন সুন্দর ভাবে আপনার সম্মুখে গঙ্গার উপরে মৃত্যু।"

মা হাসিয়া আমাকে বলিলেন, **"গঙ্গার উপর আশ্রম করে রেখেছিস কোথা হতে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এসে এখানে দেহত্যাগ করছে। এদের ত আশ্রমে আসার কথাও নয়। তুই করেছিস্ তাই তোরও কিছু কিছু ফল হচ্ছে।"** এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

২০শে শ্রাবণ, শুক্রবার।

প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ কাশী আশ্রমে যে সাবিত্রী মহাযজ্ঞ চলিতেছে তাহা আগামী পৌষ সংক্রান্তির দিন সম্পূর্ণ হইবে আশা করিতেছি। যজ্ঞের জন্য দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান বিধি। তাহার জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। মার কৃপাতে কিছু কিছু ব্যবস্থাও হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিরাট কাজ করা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। দেরাদুনে থাকিতে আমি মাকে একদিন বলিয়াছিলাম যে এতবড় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইতে চলিল আর পূর্ণ ভাবে বিধিমত ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইবেনা তাহা ভাল লাগেনা। মা হাসিতে

হাসিতে আমাকে বলিয়াছিলেন — "বেশত, তোর যখন কষ্ট হচ্ছে তখন আবার চেষ্টা করে দেখ্। যজ্ঞেশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হবে।"

হিসাব করিয়া দেখা গেল যে দক্ষিণা সহ প্রতিটি ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রায় আড়াই টাকা করিয়া পড়িবে। মা বলিয়াছিলেন — "ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ করে দেও। যেমন যেমন তোমরা পাও তেমন তেমন হবে আর কি।" মার নির্দ্দেশ মত গত পৌষ মাস হইতেই আশ্রমে নিত্য এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইতেছে। গত ২রা হইতে ২/১ দিন পর পরই একশত করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইতেছে। কোনও দিন বাঙ্গালী, কোনও দিন হিন্দুস্থানী, কোনও দিন মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, মাদ্রাজী ইত্যাদি এইভাবে।

২৩শে শ্রাবণ, সোমবার।

আজ ঝুলন পূর্ণিমা। গঙ্গাদিদির আগ্রহে এবং উদ্যোগে গত ২০শে হইতেই ঝুলন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মাকে সাজাইয়া দোলনায় বসান হইতেছে।

কাশীতে ঝুলনোৎসব

মা আবার একে একে কন্যাপীঠের সকল মেয়েকেই পার্শ্বে বসাইয়া দোল খাইয়াছেন। আজই বিশেষ উৎসব হইল। এই দিনই রাত্রিতে মার দীক্ষার খেলাটা আপনা আপনি হইয়া গিয়াছিল। ঐ দীক্ষার আনুমানিক সময় রাত্রি ১২টা হইতে ১২॥টা পর্য্যন্ত। ঐ উপলক্ষ্যে আজ অখণ্ড কীর্ত্তন হইল। কন্যাপীঠের হল ঘরেই এই উৎসব হইল। মাকে দিয়া সকলের হাতে আজ রাখীবন্ধন করান হইল। গঙ্গাদিদি মাকে কৃষ্ণের সাজে সাজাইয়া দোলনায় বসাইয়া দিলেন। কিন্তু একটু পরেই মা নিজের সাদা ধুতি চাহিয়া নিজের গায়ে জড়াইয়া লইলেন। তারপর আপন

ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়া সকলের মধ্যে দাঁড়াইলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সকলেই আত্মহারা হইয়া ঐ ভাবে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে চলিলে মা বসিয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রায় ১॥টা পর্য্যন্ত এই আনন্দোৎসব চলিল।

৩২শে শ্রাবণ, বুধবার

কাশীতে জন্মাষ্টমী উৎসব

আজ জন্মাষ্টমী উৎসব হইল। গঙ্গাদিদি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে মাকে সাজাইয়া রূপার সিংহাসনে বসাইয়াছেন। তাই আজ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজার পর মাকে সাজাইয়া রূপার সিংহাসনে বসাইলেন। মেয়েরা সকলে মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিল। প্রসাদ বিতরণ হইতে হইতে ভোর হইয়া গেল।

২রা ভাদ্র, শুক্রবার

গতকাল এবং আজও নন্দোৎসব চলিল। সন্ধ্যার পর মা কন্যাপীঠের ছাদে কতকগুলি বেলুন নিয়া খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন। ঐ বেলুনগুলি আজ বিকালে কোন ভক্তের দোকান হইতে ফিরিবার সময় মা নিজে পটলকে দিয়া ক্রয় করাইয়াছিলেন। এখন ঐগুলি নিয়া আনন্দ করিতেছেন। মা অনেককেই একটি একটি করিয়া বেলুন দিলেন। দিদিমাকেও একটি বেলুন দিলেন। দিদিমা আবার ঐ বেলুনটি মাকে দান করিলে মা উহা মস্তকে ধারণ করিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এ প্রণামও বেশ কিছুক্ষণ ব্যাপী। মার প্রতিটি কাজই আদর্শপূর্ণ। সকলইত আমাদের শিক্ষার জন্য।

আজ নীচের হল ঘরে সৎসঙ্গে বসিয়া কি কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন — "অহঙ্কার অর্থ কি? প্রথম যখন অজ্ঞান অবস্থায় অহঙ্কার থাকে তখন সেই অহং দ্বারা ক্রিয়া হয়। তাই উহা অহং-কার। আবার এই অহং যখন পরমার্থ পথে নিয়োজিত হয় তখন এই অহংঙ্কারই হয় সোহহং অর্থাৎ আর কেহ নাই।"

মায়ের নিজস্ব পরিভাষা

আবার বলিতেছেন — "তোমাদের কি সব পরোক্ষ-অপরোক্ষ আছে না? এই শরীরটাকেত লেখা পড়া শিখাও নাই তাই বলা হয় পরোক্ষ অর্থাৎ এইখানে কেবল পরীক্ষা করেই যায়। তারপর অপরোক্ষ কি না তখন আর পরীক্ষা অপরীক্ষার প্রশ্নই নাই। পরীক্ষা আর তখন কে করবে?"

পাগল অর্থ করিতে গিয়া বলিতেছেন — "যে পাওয়াতে কেবল গোলই বাঁধে, মীমাংসা আর হয় না।"

প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতেরও নূতন অর্থ করিলেন। মা বলিতেছেন, — "প্রাকৃত অর্থ কি না পর পর ক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে, আগে পরে আছে। আর অপ্রাকৃত যখন তখন আর আগে পরের প্রশ্ন নাই। কালাতীত আর কি।"

২৮শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।

কলিকাতাবাসীদের বিশেষ আহ্বানে গত ২৩শে মা কলিকাতা গিয়াছিলেন। ২৫শে তথায় থাকিয়া গতকাল আবার কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

'আজ মায়ের উপস্থিতিতে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিরোধান উৎসব হইল। সাধুদের ভাণ্ডারা দেওয়া হইল।

১লা আশ্বিন, রবিবার।

আজ সকালে মাকে লইয়া আমরা দেরাদুন রওনা হইলাম। দেরাদুনে এবার দুর্গোৎসব হইবে।

১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।

আজ আমরা হরিবাবার আহ্বানে বৃন্দাবন রওনা হইলাম। হরিবাবা গাড়ী লইয়া মার জন্য মথুরাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা

২০শে আশ্বিন, শুক্রবার।

মাত্র ৫।৬ দিন বৃন্দাবনে থাকিয়া আমাদের কাশী ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত রামধন দাস ঝাঝারিয়ার অনুরোধে মাকে আরও কয়েকটি দিন বৃন্দাবনে থাকিতে হইবে। কারণ তিনি মার উপস্থিতিতে ১০৮ ভাগবত সপ্তাহ করাইবেন বলিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মা উপস্থিত না থাকিলে তিনি এই উৎসব বন্ধ করিয়া দিবেন বলিতে লাগিলেন। মার শরীর বেশ খারাপ। অথচ মা না থাকিলে এই সব উৎসব বন্ধ হইয়া যায়।

৪ঠা কার্ত্তিক, শুক্রবার।

আজ কালীপূজা। বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবৎ সপ্তাহ সম্পন্ন হইলে মাকে

লইয়া আজ আমরা কাশীধামে আসিয়া পৌছিলাম। আগামী কাল আশ্রমে অন্নকূট উৎসব। তাই সকলেই মাকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইল।

আগামী পৌষ সংক্রান্তির দিন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি উৎসব। কথা হইয়াছে উৎসবের একমাস পূর্ব্ব হইতেই সাধুরা সকলে আসিবেন এবং যজ্ঞোৎসব আরম্ভ হইবে। সাত হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন এখনও বাকী। তাই আবার ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ করিতে হইবে।

১২ই অগ্রহায়ণ, সোমবার।

মার অসীম অনুগ্রহে আজ ব্রাহ্মণ ভোজন প্রায় নয় হাজার সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ইহা যে কি অদ্ভুত ভাবে হইয়া যাইতেছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। লোকে এইসব করিতে দেখিয়া হয়ত মনে করিতেছে বহু টাকা জমা আছে তাই এত বিরাট ভাবে করিতে পারিতেছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে কি তাহাত আমিই জানি। এত বড় কাজ অথচ ব্যবস্থা একেবারেই নাই। সকল যেন একেবারে স্বপ্নের মত মনে হয়। বাহিরের লোকের পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন। কর্ম্মে নামিয়া দেখি প্রতিটি কর্ম্মের পশ্চাতে মায়ের অপূর্ব্ব শক্তি অদ্ভুত করুণা অসীম কৃপা। ইহা অপরকে বুঝাইবার নয়। নিজে শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার।

৩০শে পৌষ, শনিবার।

আজ সংক্রান্তির দিনে মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। ঠিক একমাস পূর্ব্ব হইতে উৎসব সুরু হইয়াছে। মহাত্মারাও নানা প্রান্ত হইতে ঐ উপলক্ষে আসিয়া

একত্রিত হইয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে হরিবাবাজী, খান্না হইতে ত্রিবেণীপুরীজী, উত্তর কাশীর দেবী গিরিজী, বঙ্গের কৃষ্ণানন্দজী, পাঞ্জাবের অবধূতজী, বৃন্দাবনের চক্রপাণিজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, ঝুঁসীর প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী এবং অন্ধ সাধু শরণানন্দজী, স্বরূপানন্দজী প্রভৃতি অনেকেই কৃপা করিয়া যজ্ঞে যোগদানপূর্ব্বক ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। খান্না হইতে ত্রিবেণীপুরীজী এবং উত্তর কাশীর দেবী গিরিজী মহারাজ এত বৃদ্ধ বয়সেও মায়ের আহ্বানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। দেবী গিরিজীর নিকট মায়ের আহ্বান পৌছিলে তিনি এই দারুণ শীতের মধ্যে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া মায়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন — "আমারত আসিবার ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু মাতাজী আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন। ইহা সব মাতাজীর লীলা।"

সাবিত্রী মহাযজ্ঞের সমাপ্তি

শ্রীহরিবাবা ও অখণ্ডানন্দজীর আগমনের পর হইতেই আশ্রমে এক পক্ষ কাল ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠের ব্যবস্থা হয়। পূর্ণাহুতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রত্যহ গীতা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র পাঠ, অবধূতজী কর্ত্তৃক জ্ঞানমার্গের উপদেশ, স্বামী শরণানন্দজী কর্ত্তৃক ভক্তিমার্গের উপদেশ এবং কীর্ত্তনাদিতে প্রায় সমস্ত দিনটি কাটিয়া যাইত। ভোর হইতেই যজ্ঞোৎসবের সানাই বাজিয়া উঠিত। ইহার প্রভাতী সুরের রাগরাগিনী অর্দ্ধসুপ্ত নরনারীর কর্ণকুহরে ঝলকে ঝলকে অমৃতধারা বর্ষণ করে। ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারীরা প্রভাতী কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাস্নানাদি করিয়া যজ্ঞশালায় সমবেত হইয়া সমস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করে। সাবিত্রী মন্ত্র পুটিত হব্যবাহী ঐ যজ্ঞধূম প্রভাতের গঙ্গাবায়ুকে ভর করিয়া চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল পবিত্র করিয়া দেয়। সাধুমহাত্মাদের আগমনের পর হইতেই

আশ্রমের ভিতর দিয়া দিবারাত্রি কি এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবের ধারা বহিতেছে।

পাঠকীর্ত্তনাদির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও চলিতেছে। একদিন কাশীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রায় ১২৫ বেদপাঠীদের নিমন্ত্রণ করিয়া সোলনের রাজা সাহেবের হাত দিয়া প্রত্যেককে একটি পিতলের পাত্রে কিছু ফল, মিষ্টি, মায়ের দুইখানি পুস্তক এবং দক্ষিণা প্রদান করা হইল।

ইহার পরে মায়ের নির্দ্দেশ মত ১০৮টি কুমারী ভোজনও বিশেষ ভাবে করা হইল। ভোজনের প্রারম্ভে গীতবাদ্য সহকারে প্রতিটি কুমারীকে আরতি করা হইল। এই সময় মা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই সকল কাজ অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কাশীর মুখ্য মুখ্য দেবালয়ে পূজা ও ভোগ প্রদান, দণ্ডীস্বামী ও পরমহংস ভোজন, গোমাতা ও গঙ্গাদেবী পূজা, অখণ্ড নাম যজ্ঞ প্রভৃতি একটি না একটি অনুষ্ঠান নিত্য লাগিয়াই আছে। ইতিমধ্যে একদিন মায়ের ইচ্ছানুসারে বানর ও বায়স ভোজনের ব্যবস্থাও করা হইল।

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তবৃন্দের সমাগমে আশ্রম আজ পরিপূর্ণ। বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, দিল্লী, বিহার, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ কোনও প্রান্ত হইতেই ভক্তরা বাদ যান নাই। রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষ কেহই বাদ যায় নাই। এত লোকের যজ্ঞদর্শনে একত্র মিলন সে এক অপূর্ব্ব বস্তু। আনন্দের যেন হাট বসিয়া গিয়াছে। সকলের মুখেই এক কথা — "কি ভাবে যে আসা সম্ভব হইয়াছে তাহা আমিই জানিনা।"

কিন্তু এই উৎসবের মধ্যেও মার শরীরটা বেশ খারাপ চলিতেছে। কারণ কি তাহাও অজানা নয়। মার মুখ হইতেই শুনিয়াছি — "খেয়াল হয়েছিল

যারা যজ্ঞের কাজকর্ম্ম করবে তারা সকলে ভাল থাকুক, এই শরীরটার উপর দিয়াই যাহা হয় হোক।"

আজ পূর্ণাহুতি। গতকাল সমস্ত রাত্রি ইহার আয়োজন চলিয়াছে। মা স্বয়ং যজ্ঞশালায় দাঁড়াইয়া দানের সমস্ত জিনিষ পত্র ব্রহ্মচারীদের দ্বারা সাজাইয়াছেন। সমস্ত আশ্রমটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ফুলে মালায় সজ্জিত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। যজ্ঞশালার উপর শাস্ত্রীয় বিধান মত নানা বর্ণের নানারূপের নানা আকারের সব ধ্বজাপতাকা শোভা পাইতেছে। যজ্ঞশালার চতুর্দ্দিকে মহাত্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরা মায়ের দেওয়া নূতন নামাবলী গায়ে দিয়া যজ্ঞের নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত।

ভোর হইতে না হইতেই আশ্রমটি লোকে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আশ্রম প্রাঙ্গনে আর যেন তিলার্দ্ধ ধারণের স্থান নাই। ব্রহ্মচারীগণ যজ্ঞকুণ্ডের চারিধারে বসিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিতেছে। বেদ ধ্বনির সহিত পূর্ণাহুতির আয়োজনও চলিতেছে। সমস্ত কিছুই মার ব্যবস্থা মত। আচার্য্য বাটুদা বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন — "মা প্রতিটি বিষয় এমন শাস্ত্রোক্ত ভাবে করাইয়াছেন যে তাহা বলিবার না। আমাদের অনেক সময়ই ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মা তাহা নিজে খেয়াল করিয়া পূর্ণ করিয়াছেন।"

যথাসময়ে যথামত বেদধ্বনির সহিত পূর্ণাহুতি হইয়া গেল। এই সময় অগ্নিদেব যখন লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইলেন তখনই মায়ের আদেশে ঐ শিখা হইতে নূতন অগ্নি আহরণ করিয়া রাখা হইল এবং উহার পরেই আশ্রমের ছাদের উপর নূতন যজ্ঞমন্দিরে উহা বিধিপূর্ব্বক স্থাপন করা হইল।

পূর্ণাহুতির কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই মা প্রায় সকল ভক্তকেই বেশী বেশী করিয়া জপ করিতে বলিয়াছিলেন। যে জপগুলি অভুক্ত অবস্থায় করা হইবে সেইগুলির সংখ্যা একটি কাগজে লিখিয়া একটি বাদাম সহ উহা আমাদিগকে দিতে বলিয়াছিলেন। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে পূর্ণাহুতির পরে ঐ সকল বাদাম দিয়া আহুতি দেওয়া হইবে। কেবল তাহাই নহে, সকলকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যজ্ঞ শেষেও অভুক্ত অবস্থায় দৈনিক যে জপ করিবেন উহার সংখ্যা একলক্ষ হইলে কাশীর আশ্রমে জানাইলেই আশ্রমে যে নিত্য যজ্ঞ হয় সেই যজ্ঞে প্রত্যেকের নামেই একটি করিয়া আহুতি দেওয়া হইবে। যজ্ঞোপলক্ষে অনেকেই জপ করিতেছে জানিতে পারিলাম। আমিও জপ করিব ভাবিলাম। কিন্তু জপ করিতে গিয়া সংখ্যা রাখিতে পারিলাম না কারণ আমার মালা নাই। ভাবিলাম এই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা মাকে জিজ্ঞাসা করিব; কিন্তু কাজের ভিড়ে তাহাও হইয়া উঠিল না। পূর্ণাহুতির দিন সজল নয়নে অগ্নিদেবকে বলিলাম, "তুমিও যে মাও সে। আমিত জপের সংখ্যা রাখিতে পারিলাম না যতক্ষণ পূর্ণাহুতি শেষ না হয় ততক্ষণ আমি জপ করিব। তুমি উহা গ্রহণ কর এবং আমাকে দেখা দাও।" তারপর জপ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সাধ্য কি যে স্থির ভাবে জপ করিব। কিছুক্ষণ পরই অন্যমনস্ক হইয়া সব ভুলিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু অগ্নিদেবের দিকে চাহিয়া দেখি কি অগ্নিদেব যজ্ঞশালা ভেদ করিয়া আকাশে মিশিতে চলিয়াছেন। অগ্নিশিখা যজ্ঞশালার চূড়ার প্রধান ধ্বজদণ্ডের পাদদেশ স্পর্শ করিয়া যেন উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। ঐ দৃশ্য দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। আমি যেন আর আমাতে নাই, সব ভুল হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে যেন কোথাও কিছু নাই —

পূর্ণাহুতির সময় যজ্ঞকুণ্ডে অলৌকিক দর্শন

শুধু লেলিহান অগ্নিশিখা। ইহার মধ্যে আবার হঠাৎ দেখিতে পাইলাম একটি রক্তবর্ণ মুর্ত্তি যজ্ঞকুণ্ড হইতে উঠিয়া উর্দ্ধে মিলিয়া গেল। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিহ্বল ভাবে 'মা' 'মা' করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার চাহিয়া দেখি আমার আনন্দময়ী মাও ঐ ভাবে উঠিয়া শূন্যে মিশিয়া গেলেন। মা যে মূর্ত্তিতে আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন ঠিক সেই মূর্ত্তিতেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে উঠিলেন দেখিলাম। দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। দৃশ্যটি এতই জীবন্ত এতই প্রত্যক্ষ যে আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে অপরেও কেন এত স্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। ইহা যজ্ঞেশ্বরের কৃপা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

নেপালদাদাও এই তিনবৎসরে যজ্ঞশালার ভিতরে অনেক কিছু অলৌকিক দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাহা সব আমারও জানা নাই।

মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। সে যোগ্যতাও নাই। সময় হইলে এই মহাযজ্ঞের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়ত কখনও প্রকাশ লাভ করিতে পারে। তাহার প্রয়োজনত আছেই। কারণ এই দীর্ঘ তিনবৎসরের যজ্ঞের ইতিহাসের মধ্যে দিয়া মায়ের লীলার ও ঐশ্বর্য্যের যে কি অদ্ভূত প্রকাশ হইয়াছে তাহা ভক্তবৃন্দের জানা আবশ্যক। প্রতিটি ছোটখাট বিষয়ের মধ্যেও কি যে এক অলৌকিকতার প্রকাশ আছে তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ইতিহাস না জানিলে বুঝিয়া উঠা কঠিন। একটি মাত্র জিনিষ আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে মার উপর পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহা পূর্ণ করিয়াই থাকেন। নতুবা আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তিতে এবং জগতের এই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই বিরাট যজ্ঞের ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভব ছিলনা। যেখানে এক সহস্র টাকার সংস্থান নাই, সেখানে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকা কোথা হইতে আসিল এবং কিভাবে

ব্যয় হইল তাহা আমিও ঠিক ঠিক বলিতে পারিব না। কোথা হইতে কি ভাবে যে ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে তাহা সত্যই অদ্ভুত। বড় বড় মহাত্মারাও একবাক্যে বলিতেছেন যে এইরূপটি কখনও হয় নাই আর বোধহয় হইবেও না। "ন ভুতো ন ভবিষ্যতি।" ইহাকেই আমরা বলিয়া থাকি "লীলা" — ইংরাজীতে যাহাকে বলে —"miracle." অযাচিত ভাবে যাহারা যাহারা আসিয়া এই মহাকর্ম্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের কল্যাণের জন্য আজ মার চরণে প্রার্থনা জানাই। সকলের কল্যাণ হউক। বিশ্বের কল্যাণ হউক। প্রাণে প্রাণে মিলিয়া আজ যজ্ঞেশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই —

"যজ্ঞেশনারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মা, জগদীশ রক্ষ।"

এই মহাযজ্ঞের ফল কি তাহা মাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে মা গম্ভীর হইয়া স্পষ্ট ভাবে জবাব দিয়াছিলেন — "অগ্নিদেব যে এই ভাবে প্রকাশিত হয়ে এতদিন পর্য্যন্ত সেবা নিলেন তা কি সবই একেবারে অর্থশূন্য? ঐ যে অগ্নিকে এক মহাযজ্ঞে লাগিয়ে দেওয়া হবে বলে একটা কথা এই শরীরের মুখ হতে বের হয়েছিল তা কি শুধু কথার কথা? নিশ্চয় জেনো যা কিছু হচ্ছে সব কিছু তাঁর রাজ্যের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্পষ্ট অস্পষ্ট সমগ্র নিয়েই কোন ব্যাপার। যা কিছু তিনি এই ভাবে করিয়ে নিচ্ছেন তাকে ছেলে-খেলা মনে করো না। তিনিই এইরূপে প্রকাশ হয়ে যখন যা দরকার তা আপনা-আপনিই সব করিয়ে নিচ্ছেন।"

১লা মাঘ, রবিবার।

আজ মা ও অন্যান্য মহাত্মাদের সব সঙ্গে লইয়া নগর কীর্ত্তন বাহির

হইল। এই শোভাযাত্রা অনেক দূর ব্যাপী হইল। স্ত্রীপুরুষ সব নানা বর্ণের পতাকা হস্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। সেও এক খুবই সুন্দর দৃশ্য।

৯ই মাঘ, সোমবার।

মায়ের উপস্থিতিতে আজ সকলে মিলিয়া সরস্বতী পূজার আয়োজন করিয়াছে। আলমোড়া বিদ্যাপীঠের বালকেরা যজ্ঞোৎসব উপলক্ষে কাশীতে আসিয়াছিল। তাহারা শীঘ্রই আবার ফিরিয়া যাইতেছে। পূজাতে তাহাদের খুবই উৎসাহ।

১৩ই মাঘ, শুক্রবার।

আজ হরিবাবাকে সঙ্গে করিয়া মা বিন্ধ্যাচলে রওনা দিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ছেলে মোটর করিয়া মা এবং হরিবাবাকে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়া দিল। সঙ্গে ভক্তবৃন্দও অনেকেই আছেন।

যজ্ঞের সময় সকলকে যে অভুক্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ জপ করিতে বলা হইয়াছে এবং উহার সংখ্যা এক লক্ষ পূর্ণ হইলেই যে আহুতির জন্য কাশীর আশ্রমে জানাইতে বলা হইয়াছে এই সকল কথা একদিন উঠিলে মা বলিলেন—"এ লক্ষ জপের কথা ত অনেককে বলা হয়েছে, কে জানে এক লক্ষ করতে করতে কবে তাঁহার দিকে একলক্ষ্য হয়ে যায়।"

লক্ষ জপ করিতে করিতে তাঁর দিকে এক লক্ষ হইতে পারে

"দেখ, তোমরা আরও একটা কাজ করলে পার — তোমরা যদি পার তবে একটা সময় ঠিক রাখলে; সেই সময় যে যেখানে থাক সকলেই তাঁর ধ্যানে বা জপে মিলিত হলে। এইরূপ করলে কি হয় জান? মনে কর ঐ সময় এক জনের ধ্যান খুব জমে গেল, অন্যান্য যারা ঐ সময় ধ্যান করল তারাও ঐ জমাট ভাব হতে সাহায্য পাবে। কাশীতে ত পৌনে নয়টা থেকে নয়টা পর্য্যন্ত সকলেই মৌন থাকে। উহা ছাড়া আরও একটা সময় করে নিতে পার। গভীর রাত্রিতেও একটা সময় করে নিতে পার। যারা ঐ সময়ে ধ্যান করতে পারবে, যেদিন পারল তাই ভাল। কেউ যদি ঐ সময় স্মরণ করতে করতে ঘুমিয়েও পরে অথবা ঐ সময়ে বসে বসে ঝিমায় তবুও ভাল।"

সমবেত ভাবে ধ্যানের উপকারীতা

সকলের মত নিয়া স্থির হইল যে সকাল ৭-৫০ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি পৌনে ১২টা হইতে সোয়া ১২টা পর্য্যন্ত সকলে ধ্যান করিবে। মা বলিলেন — "এইরূপ দুই তিনটা সময় থাকলে কি হবে জান? একটা ধরতে না পারলে আর একটা ধরা যায়। যেমন এক গাড়ী ফেল করে অন্য গাড়ী ধরা যায়।"

জপ বা ধ্যানের বিভিন্ন সময় রাখার উপকারীতা

বিন্ধ্যাচলে আমার ছোট বোন বেলুর নিকট আজ একটি ঘটনার কথা শুনিলাম। একবার মা বিন্ধ্যাচলে ছিলেন। ঐ সময় ডাঃ ব্যাস দিল্লী হইতে মাকে কিছু আম পাঠাইয়াছিল। মা কাশী চলিয়া আসিবেন। বেলু এবং কমলাকান্ত বিন্ধ্যাচলে থাকিবে। মা তাহাদের দুই জনকে দুইটি আম দিলেন। তখন একটি আম মাকেও কাটিয়া খাওয়ান হইতেছিল। মা বেলুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, — "তোর আমটা কেমন?" বেলু আমটি একটু খাইয়া দেখিয়াছিল যে আমটি টক্; কিন্তু উহা মায়ের দেওয়া বলিয়া সে মায়ের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। এদিকে মা খুব আগ্রহ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, — "দেখি, দেখি, তোর আমটা কেমন। আমাকে একটু দে ত।" আমটি উচ্ছিষ্ট বলিয়া উহা সে মাকে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু মায়ের খেয়াল হইলে কি রক্ষা আছে? মায়ের পুনঃ পুনঃ তাগাদায় সে আমটি দিতে বাধ্য হইল। মা উহা মুখে দিয়া বলিলেন — "এত টক্। আমার আমটাত খুব মিষ্টি।" এই বলিয়া মায়ের আম হইতে বেলুকে এক টুকরা দিলেন। ইহা দেখিয়া বেলু মাকে বলিল — "মা, তোমার এই জাতীয় ব্যবহারেই আমরা তোমাকে চিনিতে পারি না। তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে আমদের ভুল হইয়া যায়। এইমাত্র তুমি আমার উচ্ছিষ্ট খাইলে।" মা আম খাইতে খাইতে অনুচ্চ কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলিলেন — **"যার চিনবার সে এর মধ্যেই চিনে নেবে।"** ঐ কথা বলিয়া মা তখনই অন্য কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বেলু ভিন্ন ঐ কথা উপস্থিত আর কেহ শুনিতে পাইল না।

যাহার চিনিবার সে চিনিবেই

২৬শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

প্রায় ১৪।১৫ দিন বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া আমরা হরিবাবা সহ আবার কাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। যোগেন দাদার ছেলেই - মোটরে করিয়া আমাদিগকে কাশীতে পৌঁছিয়া দিল। কথা হইয়াছে ২৯শে মাঘ মা ঝুসী গিয়া আবার ১লা ফাল্গুন বৃন্দাবনে রওনা দিবেন। দোলের উৎসব এবং উড়িয়া বাবার তিরোধান উৎসব এক সঙ্গেই একমাস চলিবে। অখণ্ডানন্দজী এক মাসের জন্য ভাগবত পাঠও আরম্ভ করিবেন।

বিন্ধ্যাচলে থাকিতে একদিন কথায় কথায় সেখানকার আম গাছটির কথা উঠিল। আশ্রমের অতি নিকটেই আম গাছটি ছিল। অনেক দিনই মা সকলকে নিয়া ঐ গাছটির তলায় যাইয়া বসিতেন। কখনও কখনও গাছটির তলায় শুইয়াও থাকিতেন। একবার মা বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছেন। তখন সবে মাত্র ছোট ছোট আম হইয়াছে। প্রবুদ্ধানন্দ স্বামীজী কয়েকটি আম কুড়াইয়া লইলেন। আবার পাথর দিয়া গাছ হইতে কয়েকটি আমও পাড়িলেন। মা গাছটির দিকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন — "সাধু নীচের আমও কুড়াল আবার গাছের ফলও পাড়ল।" শুধু এইটুকু।

বিন্ধ্যাচলের আম গাছের কাহিনী

কিছুদিন পরে মা আবার বিন্ধ্যাচল গিয়াছেন। তখন ঐ গাছ তলায় গিয়া দেখা গেল গাছটি অদ্ভুত ভাবে মরিয়া গিয়াছে। মা বলিলেন — "যেমন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে কোনও কোনও সাধুর দেহত্যাগ হয় এও ঠিক যেন সেই রকমই। বেশ বড় তাজা গাছ ছিল। অথচ তখনই কি রকমটা জানি দেখা গেল। তাই বলা হয়েছিল — আহা, সাধুদের ফল খাইয়ে দেহরক্ষা করল।"

পরে মা আবার বলিতেছিলেন যে কোনও কোনও স্থানে দেখা যায় সাধু মহাত্মারা বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই ঘটনার পরে স্বামী অখণ্ডানন্দজী ঐ গাছটি বিন্ধ্যাচলের নিত্য হোমের জন্য খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাও কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন ঐ গাছটির একটি অংশ রাখিয়া দিবার জন্য। কমলাকান্ত বেশ করিয়া কাটিয়া একটি টুকরা বড় রুলের মত করিয়া রাখিয়াছিল। কাশীতে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে মা কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই কাঠটি কোথায়? কমলাকান্ত উহা বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মার আদেশ মত সে ঐ টুকরাটি আনিয়া যজ্ঞাগ্নি যখন প্রথম কুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত করা হইল তখন ঐ কাঠটি আহুতি প্রদান করিল।

কে বলিবে এই বৃক্ষের সহিত সাবিত্রী মহাযজ্ঞের কি অদৃশ্য সম্বন্ধ আছে ? এই মহাযজ্ঞের বহু পূর্ব্বের এই ঘটনা। ইহা পূর্ব্বে ডায়েরীতে লেখা হইয়াছে কিনা তাহাও মনে নাই।

সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি উপলক্ষে বিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক ব্রহ্মচারী শৈলেশ একটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিল। মায়ের পুরাতন ভক্ত হিরণ দিদির কন্যা শ্রীমতী উৎপলা উহাতে সুর প্রদান করিয়াছিল। গানটি খুবই সুন্দর। প্রভাতী সুরে ভোরের বেলা সকলে মিলিয়া সমস্বরে যখন ইহা গাহিতেছিল তখন সকলের প্রাণেই এক অপূর্ব্ব ভাবের শিহরণ জাগিয়াছিল। গানটি আমারও খুবই ভাল লাগিয়াছে তাই তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

১

পরম পুণ্যধাম বারাণসী আশ্রম প্রণমি, নমো নমঃ যজ্ঞদেবতা
পুণ্য প্রবাহিনী বরুণা-অসি-ধারা মিলিত, চঞ্চল-চপল-তরঙ্গা,
সদা মুক্ত মহেশ্বর দেবেশ বিরাজিত ; ধৌত চরণতল গঙ্গা।
(হেন) পরম পুণ্য-ভূমি মাঝে (শ্রী) আনন্দময়ী রাজে
নিখিল চরাচর মাতা ॥
নমো রাজেশ্বরী (শ্রী) আনন্দময়ী নমোনমঃ যজ্ঞদেবতা
নমঃ হে, নমঃ হে, নমঃ হে।

২

শ্বেত-নীল-পীত পতাকা শোভিত উন্নত যজ্ঞশালা,
ছন্দে-গ্রথিত চূত-পল্লব-সজ্জিত কুসুম মালা ;

(মাঝে) গণেশ-বরুণ-ইন্দ্র দশদিশি একাদশ রুদ্র,
গায়ত্রী, ভাগীরথী ব্রহ্মা।
বর, ধ্রুবাধর, অনল, প্রভঞ্জন, প্রত্যুষ, প্রভাত, সোমপা।
নমঃ হে, নমঃ হে, নমঃ হেঃ ॥

৩

যজ্ঞকুণ্ড মাঝে মূর্ত্ত বিরাজিত অখণ্ড অনল-শিখা।
কুণ্ডলিত ধূমে দিশি দিশি বিথারি' লিখিছে অমর-লিখা
আবাল্য ব্রহ্মচারী ঐ বসে সারি সারি
গাহিছে ওঙ্কার-গাথা
ত্রিভুবন-শান্তি-প্রদায়ন, জয় হে সর্ব্ব সঙ্কট-ত্রাতা।
নমঃ হে, নমঃ হে, নমঃ হে ॥

৪

শুক্লাম্বরধর মাল্য বিভূষিত ললাট-চন্দন-লিপ্ত,
বিবিধ দেশাগত ব্রাহ্মণ শত শত ভোজন আজি সমাপ্ত।
কত শত নরনারী আসে দরশ পরশন আশে
সম্ভ্রমে আনত মাথা।
ব্রহ্মাদি, শিষ্যাদি, মাতৃকা, যোগিনী, ঋষি, গ্রহ, বাস্তুদেবতা।
নমঃ হে, নমঃ হে, নমঃ হে।

৫

আজি লক্ষ শত আহুতি পূরিত যজ্ঞ এ অশ্রুত-পূর্ব্ব
সুর-নর-কিন্নর-যক্ষ-বিদ্যাধর হেরিছে চরাচর সর্ব্ব।
শত শত মঙ্গল শঙ্খে অগণিত নরনারী কণ্ঠে
ধ্বনিছে জয় জয় গাথা।
অম্বর ভেদিয়া, বিশ্ব নিনাদিয়া বল হে, জয় জয় যজ্ঞদেবতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে শ্রীআনন্দময়ী মাতা॥

২১শে ফাল্গুন, রবিবার।

মা বৃন্দাবনেই আছেন। আজ প্রায় সাত আট মাস অবধি মায়ের শরীর অসুস্থ চলিতেছে। পিত্তকোষের গণ্ডগোল। এই অসুস্থ শরীর লইয়াই মা যজ্ঞের সময় সাধুদের সমস্ত প্রোগ্রামে যোগ দিয়াছেন। আমাদিগকেও সর্ব্ব বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এখনও যখন শরীরটা খুব বেশী অসুস্থ বোধ করেন তখন একটু শুইয়া থাকেন, আবার একটু উঠিয়া হাসিমুখে চলাফেরা করেন। দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে মা এত অসুস্থ। কিন্তু শরীর বড়ই শুকাইয়া যাইতেছে। এবং দিন দিন মা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন।

মায়ের অসুস্থতার জন্য হরিবাবার অন্ন ত্যাগ

কাশীতে থাকিতে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় সর্ব্বদা আসিয়া মাকে দেখাশুনা করিতেন। মা ঔষধ খান না কাজেই ঐদিক দিয়া কিছু করিবার উপায় ছিল না। শুধু পথ্য সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দেশ দিতেন। মায়ের জন্য তাঁহার চিন্তার অবধি ছিল না।

হরিবাবা তখন মাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে অনশনব্রত অবলম্বন করিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু মা এবং অন্যান্য সকলে নিষেধ করায় তাহা করিতে পারেন নাই। তবে ঐ সময় হইতেই তিনি ভাত বা রুটি তরকারী খান নাই। শুধু ফল এবং দুধ খাইয়া থাকিতেন। তাঁহাকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছু বলিতেন না। মা যাহাতে আরোগ্য লাভ করেন সেজন্য তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া চণ্ডীপাঠ, অখণ্ড রামায়নপাঠ, হনুমান চল্লিশা পাঠ ইত্যাদি করাইতেছেন। এখনও তিনি অন্নাহার করিতেছেন না। ভোগের মধ্যে শুধু তরকারী সিদ্ধ এবং দুধ খাইতেছেন।

হরিবাবার আহারের এই কঠোরতা শুনিয়া আজ বেলা ১২টার সময় মা সৎসঙ্গ হইতে উঠিয়া আসিয়াই সাধারণের জন্য যেখানে পাক হয় সেইখানে চলিয়া গিয়া যিনি ঐখানে রান্না করেন তাহাকেই ঐখানে যাহা যাহা রান্না হইয়াছে তাহা মাকে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। তিনি কিছুক্ষণ খাওয়াইয়া দিলে পরে মা যোগেশ (ব্রহ্মচারী) দাদার হাতে খাইলেন।

এদিকে আমি এসব কিছুই জানি না। আমি জানি মা সৎসঙ্গে আছেন। সেখান হইতে আসিয়া শুইয়া পরিবেন, আজ চারি দিন যাবৎ সারাদিন শুধু জল খাইয়া থাকেন এবং রাত্রিতে একটু কোয়েকার ওটস্ মাত্র খান। তাই আমি মায়ের বিছানাটা ঠিক করিয়া রাখিতেছি। নীচে গিয়া দেখি যে মা রান্নাঘরে বসিয়া আহার করিতেছেন। যাঁহাকে আজ ছয় সাত মাস যাবৎ তৈল, ঘি শূন্য পেঁপে পটলের ঝোল কত সাবধান মত খাওয়ান হইতেছে তিনি আজ যাহা যাহা সাধারণের জন্য রান্না করা হইয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল এবং লঙ্কা দিয়া তাহাই খাইতেছেন ও বড় বড় গ্রাসে মহা আনন্দের সহিত। আবার মোটা মোটা রুটিও চাহিয়া চাহিয়া খাইতেছেন। আমি কাছে গেলে আমাকেই ডাকিয়া ঐসব খাওয়াইতে বলিলেন। আমরা সকলেত এ সব দেখিয়া অবাক্।

কতকাল মার এইরূপ খাওয়া দেখি নাই। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম — "এখনও তোমার এইরূপ পাগলামি আছে তাহাত জানিতাম না। এখনত খাওয়া দাওয়ার একটু এদিক ওদিক হইলেই অসুস্থ। কত কি লীলাই যে দেখাও।"

যাহা হউক মা ঐভাবে আহার করিয়া উঠিলেন। উঠিয়াই বলিলেন, "হরিবাবা ভাত খান না। আমিই তাই খেয়ে নিলাম।"

আশ্চর্য্যের বিষয় যে আজ এত গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিয়াও কোন অসুস্থতা বোধ করিলেন না। অন্যান্য দিন লঘুপথ্য করিলেও অম্বল হইয়া যায়

২২শে ফাল্গুন, সোমবার।

আজও আহার সম্বন্ধে মার অনিয়মই চলিল। মা হরিবাবাকে বলিলেন, "বাবা, আমিত ভাত খাইয়াছি, তুমিও ভাত খাইও।" হরিবাবাও অগত্যা খাইতে স্বীকৃত হইলেন।

দুইদিন মা ভালই রহিলেন। ইহার পর হরিবাবা মার সঙ্গে দেখা করিয়া মাকে বিন্ধ্যাচলে কিছুদিন থাকিতে বলিলেন, কারণ তাহা হইলে মার শরীর ভাল হইতে পারে। মা হরিবাবাকে বলিলেন — **"এই শরীরের জন্য যে অন্যত্র যেতে হবে এরূপ ত কথাই নাই। এ শরীরের ত কোন বাড়ীঘর নাই যে সেখানে গিয়া ভাল হতে হবে। এ শরীরের এখানেও যেমন, বিন্ধ্যাচল বা অন্যত্রও তেমন। এখানেও শুয়ে বসে আছি, অন্যত্র গিয়েও তাই থাকব।"**

মা গঙ্গাদিদির সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন। উহার মধ্যে কথায় কথায় বলিলেন — **"দেখ, এই শরীরের কাছে সৎসঙ্গে বসে থাকাও যা,**

আর সংসারী মেয়েদের কাছে তাদের সংসারের কথা শুনাও তা।' সবটাই এ শরীরের কাছে একেবারে সমান। এই যে ওরা সব জিজ্ঞাসা করলে নানা ব্যবস্থার কথা বলে দেওয়া হচ্ছে, আশ্রম তৈয়ার করা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে সম্বন্ধেও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সব বলে দেওয়া হচ্ছে, উৎসবের সময় যে যে-কথাই জিজ্ঞাসা করেছে তাও খুটিনাটি সব বলে দেওয়া হয়েছে। অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তাও বিস্তার করে বলা হয়ে যাচ্ছে, আধ্যাত্মিক কথাও ঐ ভাবেই বলা হচ্ছে — এই সব বিষয়ই শরীরের কাছে একেবারে এক। এতটুকুও তফাৎ নাই। তফাৎ থাকলে হয়ত এই ভাবে বলা হত না। আবার একটা সময় গিয়েছে যখন বিষয়ের কথা, সাংসারিক ভাবগুলি যেন বিষের মত লেগেছে। ঐ সব কথা শুনলেও শরীর যেন কেমন হয়ে যেত। সেই এক ভাব ছিল। এখন আবার এইরূপ ভাবে চলছে।"

মায়ের নিকট আধ্যাত্মিক এবং সাংসারিক বিষয়ের মধ্যে তারতম্য নাই

বৃন্দাবনে একদিন দুপুর বেলা মাকে বিশ্রাম করিতে শোয়াইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। কিছুক্ষণ পরে মার কাছে গেলে মা বলিলেন — "শুইবার ভাবই নাই। আর ছাখ্, খোলকর-তালের আওয়াজে কান যেন ভরে যাচ্ছে। বহু লোক একত্র হয়ে এই শরীরটাকে মধ্যে রেখে খুম কীর্ত্তন করছে। তারা সব গাইছে —

মাকে লইয়া সূক্ষ্মদেহীদের কীর্ত্তন

'এস দিগম্বর তরুণ শিখর
এস, এস, এস হে।' এখনও বেশ শোনা যাচ্ছে" —

এই বলিয়া যে সুরে ঐ গানটি গাওয়া হইতেছিল সেই সুরে পদটি

গাহিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন — "অরুণ মানে কি?" "শিখর মানে কি?" আবার ঐ সঙ্গে নিজেও একটি পদ যোজনা করিয়া গাহিলেন —

'বাজিছে শিঙ্গা বিপুল নিনাদে
তব আগমন তরে হে।'

পরে আবার আপন মনে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন — **"এই শরীরটাকে মধ্যে রেখে গাইছে, যেন এই শরীরটাই শিব ঠাকুর"** — এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন যেন ইহা বিশ্বাসের যোগ্যই নয়। পরে আবার আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন আপন মনেই আস্তে আস্তে বলিতেছেন — **"কি জানি বাবা, তোদের শিব প্রতিষ্ঠা না, কি সব আসছে। তাই নাকি কে জানে।"**

মার কথা শুনিয়া আমার হঠাৎ মনে হইল তাই ত, আগামী ৭ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমাদের কাশী আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা হইবে। কাশীর আশ্রম করিবার সময় যে দুইটি শিব লিঙ্গ মাটির নীচে পাওয়া গিয়াছিল তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছে। এতক্ষণে মায়ের সুক্ষ্ম দর্শনের অর্থ বুঝিলাম। মায়ের কথায়ই এই দিকে আমার খেয়াল আসিয়া গেল।

২৬শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

আজ মার সঙ্গে আমরা বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। রাত্রি ১২টায় এটোয়াতে ট্রেন পৌছিল। বাহিরে চাহিয়া দেখি জয়নারায়ণ ভাই অনেক লোক জন সহ মায়ের দর্শনের আশায় দাঁড়াইয়া আছেন। মা যখনই এটোয়া দিয়া কোথায়ও যান খবর পাইলেই জয়নারায়ণ দাদা মায়ের এবং তাঁহার সঙ্গীয় লোকের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাবার হাতে করিয়া তাঁহার দলবল সহ এই ভাবে দাঁড়াইয়া

মায়ের সেবায় এটোয়ার দাদাজী

৪

থাকেন, এখন যত রাত্রিতেই গাড়ী এটোয়াতে আসিয়া পৌছুক না কেন। ইনি অতি চমৎকার লোক। এটোয়ার ভক্তদের সকলেই ইহাকে শ্রদ্ধা করেন এবং সকলেই ইহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে। মায়ের প্রতি ইহার ভক্তিও অসীম। কাহাকেও মায়ের চরণে পৌছিয়া দিতে পারিলেই ইনি নিজকে কৃতার্থ বোধ করেন।

২৮শে ফাল্গুন, রবিবার।

গতকাল আমরা বিন্ধ্যাচলে পৌছিয়াছি। বৃন্দাবনে যে দিন মা নিজের খেয়ালে ঝাল চচ্চড়ি ইত্যাদি খাইয়া ছিলেন সেইদিন হইতেই যেন মায়ের শরীর একটু একটু করিয়া ভাল হইতেছিল।

আজ মা নিজে ইচ্ছা করিয়াই স্নান করিলেন। এই স্নান বোধ হয় প্রায় এক বৎসর পরে করিলেন। মা বলিতেছিলেন — "স্নানের ব্যাপারটা যেন ভুল ভুল হয়ে যাচ্ছে।" দুপুর বেলা পটল কাশী হইতে আসিয়াছে। বিকাল বেলা ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ও সপরিবারে আসিলেন। তখনও মায়ের খাওয়া হয় নাই। একটু পরেই মায়ের ভোগ হইল।

১২ই চৈত্র, রবিবার।

আজ হইতে আশ্রমে বাসন্তীপূজা আরম্ভ। দুই এক দিন হয় মা কাশী আসিয়াছেন। এবার বাসন্তীপূজা গোপাল দাদা করিলেন। পূজা বেশ ভাল ভাবেই হইয়া গেল।

কাশী আশ্রমে বাসন্তী পূজা

একদিন মা দুপুরে যজ্ঞের ঘরে শুইয়া আছেন। আমি বারান্দায় বসিয়া

চিঠি লিখিতেছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম যে মা শুইয়া শুইয়া গাহিতেছেন —

"হরি হরি বল
দুটি বাহু তোল
চল চল চল
দয়াল গাঝির নায়।"

মনে হইল যেন মহানন্দে গাহিতেছেন। আজ কাল শরীরটা অসুস্থ বলিয়া একটু বেশী সময় ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া মাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। মা কখনও গান করেন, কখনও চুপ করিয়া শুইয়া থাকেন, কখনও আবার দরজা খুলিয়া বাহিরে আসেন। গানের পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ আমাকে ডাকিলেন — "দিদি, শোন্"। (আজকাল মা আমাকে দিদি বলিয়াই ডাকেন। বলেন — "সবটার মধ্যে সব আছে ইহাত সর্ব্বদাই বলা হয়।")

আমি কাছে গেলে বলিলেন — "এখন ত নবরাত্রি চলছে। এই দিনে হঠাৎ আমার একটা কথা খেয়ালে আসছে। কেন, কে জানে? শোন, খেয়াল হচ্ছে, দিদিমা, দাদা মহাশয়, মাখন (মায়ের মা, বাবা এবং ভাই) সকলকে যে তোর আদর যত্ন করবার ইচ্ছাটা, আর আমিও 'দিদি' 'দিদি' ডাক সুরু করেছি" — এই কথাগুলি একটু মৃদু হাসিয়া এমন ভাবে বলিলেন যে বাকী টুকু আমার মুখ দিয়াই বাহির হইয়া গেল। আমি বলিলাম — "কি তোমার পূর্ব্বে যে এক বোন হয়ে মারা গিয়েছে আমিই বুঝি সেই?"

মায়ের মুখে দিদির পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে ইঙ্গিত

মা অমনি হাসিয়া বলিলেন — "তুই কিন্তু বল্লি।"

ইতিমধ্যে বেলুও আসিয়া পড়িল। মা তাহাকে বলিতেছেন — "ভাখ্ দিদির মুখ দিয়া কি বের হল। ও বলছে 'আমিই তোমার সেই বোন নাকি ?" — এই বলিয়া খুব হাসিতেছেন। ভূপেন একটু দূরে ছিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম। অমনি মা বলিলেন — "বাস্, এখন আর কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিস্ না।" মা বেলুকে বলিলেন — "ওর (অর্থাৎ আমার) এই শরীরের সংশ্রবে কেন জন্ম হল না এই বলে ও দুঃখ করত। কি বলিস্ ? শা' বাগে বলতিস্ না ?" আমি বলিলাম — "হাঁ।" পরে অন্যান্য কথা হইতে লাগিল।

২৫শে চৈত্র, শনিবার।

গত ১৭ই চৈত্র মা পুনরায় বিন্ধ্যাচলে রওনা হইয়া গিয়াছেন। আজ ঘোষাল দাদা* মাকে বিন্ধ্যাচল হইতে এলাহাবাদে লইয়া গেলেন। সেখান হইতেই আমরা দেরাদুন রওনা হইলাম।

২৭শে চৈত্র, সোমবার।

যোগীভাই তাঁহার মোটর পাঠাইয়া আজ আমাদিগকে হরিদ্বারে তাঁহার নূতন ক্রীত ধর্ম্মশালায় লইয়া গেলেন। ৩০শে হরিদ্বারে কুম্ভ স্নান। মা যাহাতে সকলকে লইয়া কুম্ভ স্নান দেখিতে পারেন সেইজন্য তিনি ২৪ ঘণ্টার জন্য ৫০০৲ টাকা দিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের উপর একটি কোঠা ভাড়া করিলেন।

হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ স্নান

* উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট রোড্ওয়েজের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষাল।

৩০শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

গতকাল রাত্রি ১২টা হইতে স্নান আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তা দিয়া যানবাহন চলা নিষিদ্ধ। রাজাসাহেবের ধর্ম্মশালা খড়খড়ি হইতে ব্রহ্মকুণ্ড মন্দ দূর নয়। কিন্তু ডাঃ পান্নালালজী এবং নিগম সাহেব যিনি মেলার চার্জ্জে আছেন, ইঁহাদের চেষ্টায় আমরা রাত্রি ১১টার সময় ব্রহ্মকুণ্ডের উপরে ঐ কোঠায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ২৪ ঘণ্টা ঐখানে ছিলাম। মা সমস্তটা সময় বসিয়া বসিয়া এই জন-সমুদ্রের স্নান দেখিলেন। ডাঃ পান্নালালজী এবং নিগমের চেষ্টায় আমরা পুনরায় মোটরে করিয়া রাত্রি ১১টার সময় রাজাসাহেবের ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। ফিরিবার সময় মা মোটর গাড়ীটা ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে লইয়া যাইতে বলিলেন। মা বলিলেন, "এত সাধু স্নান করেছে। চল আমরাও জল স্পর্শ করে আসি।" তাহাই করা হইল। মাও ব্রহ্মকুণ্ডে নামিয়া মাথায় মুখে একটু জল দিলেন।

১লা বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫৭ সন।

আজই মার কাশী ফিরিবার কথা হইয়াছে। সকাল বেলা সকলে মাকে নিয়া বসিয়া আছেন। বেলা ১০টার সময় মা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,

গঙ্গা স্নান করিতে গিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া থাকা

"চল গঙ্গা স্নান করে আসি।" আমি তখন মায়ের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছিলাম। ঐ খবর আমার কাছে পৌঁছিলে আমি ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিলাম। আমাকে দেখিয়াও মা বলিলেন —"চল গঙ্গা স্নান করে আসি।" এই বলিয়াই মা গঙ্গার দিকে রওনা হইলেন। আমিও তাড়াতাড়ি মায়ের কাপড় গামছা লইয়া ঘাটের দিকে গেলাম। মায়ের সঙ্গে অনেকেই গঙ্গা স্নানে গিয়াছেন।

আমি ঘাঠে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলাম যে মা সাঁতার কাটার ভাবে জলের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িলেন। সঙ্গীয় মেয়েরা কিন্তু মাকে ঘিরিয়াই দাড়াইয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মাকে সকলের সহিত উঠিয়া আসিতে দেখিয়া আমিও তাড়াতাড়ি দুইটা ডুব দিয়া নিলাম। মা কাপড় না ছাড়িয়াই ধর্ম্মশালার দিকে চলিলেন। মায়ের মুখখানাও যেন গম্ভীর দেখিলাম। পথে চলিতে চলিতে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে মা ত আমাদের সকলের সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু যখন জলে ডুব দিলেন তখন কিছুক্ষণ আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না। অথচ যেখানে আমরা স্নান করিলাম সেখানে জলও বেশী নয় এবং জলের নীচের সমস্ত জিনিষই দেখা যাইতেছিল। পরে মাকে ঐ কথা বলা হইলে মা বলিলেন — **"গ্যাখ, এটা হতে পারে। এক বৎসর স্নান করা হয়নি। আবার জলে নেমেও মনে হল যে চৌকির উপরেই যেন শুয়ে আছি।"** আমি মাকে সাঁতার কাটার কথা বলায় মা বলিলেন — **"সাঁতারের কোন ভাবই ছিল না। যে ভাবে চৌকিতে শুয়ে থাকি ঠিক সেই ভাবে ছিলাম। এই শরীরটাকে ওরা যে খানিকক্ষণ দেখে নাই তা হতে পারে। কেমন যেন ভাবটা হয়ে গিয়েছিল। ঐ রকম ভাবটা যেন আর কখনও আসে নাই। ভাবটা যদি গাঢ় হয়ে যেত তবে হয়ত আর জল হতে উঠা নাও হতে পারত। কেউ হয়ত আর দেখতও না।"** এইজন্যই বোধ হয় জলে নামিয়াও মা সকলকে বলিয়াছিলেন — **"শরীরটাত ঠিক নাই। তোমরা সকলে দেখে রেখো।"**

মায়ের মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কি ভয়ানক ব্যাপারই না হইতে পারিত। কুম্ভস্নানের ৬ মাস পূর্ব্ব হইতেই মায়ের শরীর খারাপ চলিতেছিল। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল না যে মা এই স্নানে আসেন।

কিন্তু মায়ের একবার খেয়াল হইলে ত আর রক্ষা নাই। উহা করিতেই হইবে। মা নিজেও বলিলেন — **"কুম্ভে আসবার কি খেয়ালটাই না হয়েছিল!"**

আজ কাশী রওনা হইতেছি। রাত্রি ৯টার সময় আমরা ষ্টেশনে আসিলাম। ডাঃ পান্নালালজী, নিগম সাহেব এবং পুলিশ সুপারীণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে পুলিশের সাহায্যে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিলেন।

৭ই বৈশাখ, শুক্রবার।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কাশী আশ্রমে দুইটি শিব স্থাপন হইয়া গেল। কাশীর আশ্রম করিবার সময় এই দুইটি শিব পাওয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ শিব স্থাপন উপলক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট মহাত্মাও মায়ের সঙ্গে হরিদ্বার হইতে আসিয়াছিলেন — স্বামী অখণ্ডানন্দজী, কৃষ্ণানন্দজী, স্বরূপানন্দজী, অবধূতজী, শরণানন্দজী প্রভৃতি। শিব স্থাপন ব্যাপারে কুসুম এবং যোগেশ দাদাই সকল কাজ করিলেন এবং বিশু দাদা পৌরহিত্য করিলেন। শিবলিঙ্গ দুইটির নাম হইল, "স্বয়ম্ভু-বিশ্বনাথ"।

কাশীর আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা

আজ আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল নেপাল দাদা প্রভৃতির সন্ন্যাস গ্রহণ। নেপাল দাদার সন্ন্যাস নাম হইল নারায়ণানন্দ তীর্থ। এই সঙ্গে ব্রহ্মচারী মৃন্ময়, প্রকাশ, স্বরূপ এবং কেশবেরও সন্ন্যাস হইল। আশ্রমের চত্বরের উত্তর দিকে মন্দির করিয়া অখণ্ড মহাযজ্ঞের অগ্নি রক্ষা করা হইতেছিল। চত্বরের দক্ষিণ দিকেও একটি মন্দির তৈয়ার হইতেছিল উহা তখনও সম্পূর্ণ

নেপালদাদা প্রভৃতির সন্ন্যাস গ্রহণ

হয় নাই। মায়ের আদেশে ঐখানেই নেপাল দাদা বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মা বলিলেন — **"এই স্থানটি বিরজা হোমের জন্যই থাকল। একদিকে অগ্নি রক্ষা, আর এক দিকে অগ্নি ত্যাগ।"**

৮ই বৈশাখ, শনিবার।

অনেক রাত্রি। মা শুইয়া আছেন। আমিও মায়ের ঘরের দরজায় শুইয়া আছি। কারণ সাধারণতঃ আমরা কেহই মায়ের ঘরে শয়ন করি না।

সূক্ষ্মাত্মাদের মায়ের কাছে আগমন

এমন সময় মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন — **"তুমি এখানেই শুয়ে পড়। কত লোক যে এসেছে। কেউ কেউ এ শরীরটার চুলও আঁচড়াচ্ছে, সেই জন্য চুলেও টান পড়ছে।"** বুঝিলাম মা সূক্ষ্ম দেহধারীদের বিষয়ে বলিতেছেন।

১৪ই বৈশাখ, শুক্রবার।

আজ আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম। সেখানে কোহিনুর দাদা* নূতন বাড়ী করিয়াছেন। উহার গৃহ প্রবেশ হইবে। সেই উপলক্ষে তিনি মাকে কলিকাতা নিতেছেন।

---

*কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত। বর্ত্তমানে ইনি মহীশূর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীরদ রঞ্জন দাশগুপ্তও কলিকাতার একজন বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার। উভয়েই মায়ের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাভক্তি সম্পন্ন।

১৬ই বৈশাখ, রবিবার।

গতকাল কলিকাতা পোঁছিয়া মা আশ্রমেই ছিলেন। আজ কোহিনূর দাদার বাসায় চলিয়া আসিলেন। আজই মায়ের উপস্থিতিতে গৃহ প্রবেশ হইল।

১৯শে বৈশাখ, বুধবার।

আজ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। এই সঙ্গে কলিকাতায় মায়ের জন্মোৎসব ভাগবত সপ্তাহও আরম্ভ হইল। বাটু দাদাই পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।

২২শে বৈশাখ, শনিবার।

এবার মায়ের উৎসব মাত্র তিন দিন ব্যাপী। আজ শেষ রাত্রিতে মায়ের তিথি পূজা হইল। ভক্তেরা ফুল দিয়া মায়ের খাটখানি অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া ছিলেন। অবনী দাদা * মায়ের পূজা করিলেন।

২৯শে বৈশাখ, শনিবার।

গত ২৭শে ভাগবৎ সপ্তাহ বেশ ভালমত সমাপ্ত হইয়া গেল। এই সপ্তাহ মায়ের নির্দ্দেশে এবার ৺কুলদা দাদার আত্মার কল্যাণার্থে করা হইল।

---

*বহরমপুরের পুরাতন ভক্ত শ্রীঅবনী মোহন শর্ম্মা। বর্ত্তমানে ইনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে আশ্রম বাস করিতেছেন।

কিছুদিন হয় ঢাকাতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় রমনা আশ্রমের বাহিরে মুসলমানেরা তাঁহাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। ঢাকা আশ্রমে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ ছিলেন। মধ্যে ভারতেও আসিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মার অনুমতি না লইয়াই পুনরায় ঢাকাতে গিয়া তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইল।

কোহিনূরদার বাসাতে আমরা যে কি আনন্দেই আছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহারাও মহানন্দে মায়ের সেবায় দিন রাত্রি ব্যাপৃত আছেন। আহার নিদ্রারও খেয়াল নাই। আনন্দের যেন একেবারে প্রবাহ বহিতেছে। কিন্তু আজই আমাদের পুরী রওনা হইবার কথা হইয়াছে।

কাটজু সাহেব* একদিন মার দর্শনের জন্য আসিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দেশের অশান্তির জন্য মার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিলেন যে মার চরণে আসিলে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না। ভাবটি খুবই সুন্দর। মার কাছে পূর্ব্বে আরও আসিয়াছেন।

১লা আষাঢ়, শুক্রবার।

মা প্রায় এক মাসের উপর পুরীতেই আছেন। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নিয়োগীর (বিনু দাদার) বিশেষ আগ্রহেই পুরী আসা হইয়াছে। আমরা প্রায় ৩৫ জন মায়ের সঙ্গে আসিয়াছি। কাশ্মীরী ভক্ত এস, এন সোপোরী সাহেবও সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গে আছেন। পুরীর আশ্রম ছোট বলিয়া কেহ কেহ শশধর দাদার বাড়ীতে উঠিলেন, কেহ কেহ আবার হোটেলেও জায়গা লইলেন। কিন্তু রাত্রিতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ

পুরী আশ্রমে শ্রীশ্রীমা

* ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু তখন পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর ছিলেন। এলাহাবাদে প্র্যাকটিশ করার সময় হইতেই ইহার মার সঙ্গে পরিচয়।

আসিলে সকলে মিলিয়া আশ্রমেই প্রসাদ পাইতেন। স্থানাভাবে আশ্রমে অসুবিধা যথেষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলেই যেন মহানন্দে আছেন। সমুদ্রের একেবারে তটে আমাদের আশ্রমটি। দৃশ্য খুবই মনোহর। মায়ের সঙ্গে সকলে সমুদ্র তীরে বেড়াইতেছেন। বালুর উপর মায়ের সঙ্গে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সমুদ্রের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতেছেন এবং শোভা দেখিতেছেন। মধ্যে মধ্যে মা নিজেও কীর্ত্তন করেন এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে গান করি —

"গোপাল গোপাল ব্রজের রাখাল,
নন্দ দুলাল প্রেম গোপাল"

কখনও বা,

"ব্রহ্মময়ী মা আমার ব্রহ্মগোপাল"

একদিন মা সকলকে নিয়া জগন্নাথ দেবের পান্তা প্রসাদ খাইলেন। মা নিজে সকলকে মুখে দিয়া দিতেছেন আবার ঐ পাত্র হইতে সকলেই মাকে একটু একটু খাওয়াইয়া দিতেছে। পর দিন আবার মা পান্তা প্রসাদ নিজ হাতে মাখিয়া সকলকে দিলেন। সকলে যেন উহা অমৃতের মত খাইল। এইভাবে কত আনন্দই চলিতেছে! পুরীতে আরও কিছুদিন থাকার কথা।

একদিন গঙ্গা দিদি মাকে বলিলেন — "মা, শীলা লিখিয়াছে যে আর কত দিন মা আমাকে সংসারে আটকাইয়া রাখিবেন?" মা অমনি জবাব দিলেন — **"লিখে দাও যতদিন উহার সংসার ভাল লাগে।"** কত অল্প কথায় মা কত বড় সত্যই না প্রকাশ করিয়া দিলেন।

স্বপ্নে গোপীবাবুকে দর্শন

একদিন মা বলিলেন — **"ভোর বেলা দেখলাম যে গোপীবাবার সঙ্গে এক স্থানে বসে কথা হচ্ছে। তারপর বাবা নিজেদের গুপ্ত ধারার ক্রিয়া করে দেখাল। খুব গম্ভীর ভাব।"**

৪ঠা আষাঢ়, সোমবার।

এবার পুরীতে কলিকাতার মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় হইল। তিনি ইতি পূর্ব্বে যদিও মাকে আর দেখেন নাই; নাম অনেক শুনিয়াছেন। এই অল্প কয়েকদিনের পরিচয়েই তাঁহারা স্বামীস্ত্রী যেন কত আপন জন হইয়া গিয়াছেন। উভয়েই বেশ সরল ও মধুর সভাব।

গোপাল দাদা* এবং পাটনার প্রফেসার সুধীর দাদা মাকে একবার পাটনায় যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। কথা হইয়াছিল পুরী হইতে কাশী ফিরিবার পথে পাটনা হইয়া যাওয়া হইবে। এদিকে আবার এখানে ১৮ বৎসর পর ৺জগন্নাথ দেবের নবকলেবর উৎসব হইবে। তাই অনেকেই মাকে এখন পুরীতে থাকিয়া যাইতে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। তবে ঐ উৎসবের এখনও অনেক দেরী আছে বলিয়া মা আজই পাটনা যাইবার জন্য কলিকাতা রওনা হইলেন।

৮ই আষাঢ়, শুক্রবার।

গত ৫ই আষাঢ় কলিকাতা পৌছিয়া আবার বিকালের গাড়ীতে মা নবদ্বীপ রওনা হইলেন। পরদিনই কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া আবার আজ রাত্রে আমরা পাটনা রওনা হইলাম।

---

* ৺আচার্য্য গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এলাহাবাদের সত্যগোপাল আশ্রমের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা।

৯ই আষাঢ়, শনিবার।

পাটনায় শ্রীশ্রীমা

আজ আমরা পাটনা পৌছিলাম। গোপাল দাদা, সুধীর দাদা সকলেই ষ্টেশনে ছিলেন। সুধীর দাদার বাসার নিকট অন্ধদের এক স্কুলে মায়ের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবস্থাটি ভালই। ঐখানে সাত দিন থাকার কথা হইয়াছে। গোপাল দাদা এবং সুধীর দাদা মাকে নিয়া নানা স্থানে যাইবেন কথা।

১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার।

পটল কাশী হইতে আসিয়াছে। তাহার বিশেষ আগ্রহে মা আজ কাশী রওনা হইলেন। তথায় একদিন থাকিয়াই আবার কলিকাতা হইয়া ৺পুরীধামে যাইবার কথা।

২০শে আষাঢ়, বুধবার।

আজ মার সঙ্গে আমরা পুরী আসিয়া পৌছিলাম।

পুরীতে সাধু দর্শনে শ্রীশ্রীমা

শশধর দাদা এবং শ্যামসুন্দর সোপোরী সাহেব প্রভৃতি মাকে এক সাধুর নিকট নিয়া গেলেন। কিছুদিন যাবৎই দেখিতেছি যে মা কাহারও নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহার কোলে অথবা বুকের কাছে নিজের মাথাটি একটু রাখিয়া — **"বাবা তা হলে আসি"** বলিয়া চলিয়া আসেন। এই সাধুকে দেখিয়া ফিরিবার সময়ও তাহাই করিলেন। ইহাতে ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন — "মা, তুমি ঐরূপ করিয়া কি প্রণাম জানাইলে ?" উত্তরে

মা বলিলেন — **"প্রণাম নয়। কোন কোন সময় কারো কারো সঙ্গে এইরূপটা হয়ে যায়। এক কর্ম্মের মধ্যেও অনেক দিক থাকতে পারে। এই ছোট্ট মেয়েটাত সকলেরই। প্রেমে যে সময়েতে যে যেমন করিয়ে নেয়।"**

মায়ের এই লীলা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। কখনও হয়ত কাহাকেও স্পর্শ প্রদান করিয়া ভগবৎ অভিমুখে যাওয়ার সহায়তা দান করিতেছেন। আবার কখনও হয়ত অন্য রকমে বা অন্য কারণে কিছু করিতেছেন। আবার অনেক সময়ে শত বলিলেও কিছু করা আসে না দেখিতে পাই। মা তাই বলেন — **"তাঁরই সব। তিনিইত স্বয়ং সর্ব্বরূপে। যখন যে রূপে নিজেকে নিয়ে নিজেই খেলেন।"**

২১শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।

কুল থাকিতে কুল পায় না

আজ দুপুর বেলা একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া মায়ের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। মাকে দেখাইয়া দিলে তিনি প্রণাম করিয়া মাকে বলিলেন — "অনেক দিন যাবৎ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল আজ তাহা পূর্ণ হইল। আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন — "মা, কি করিয়া তাঁকে পাওয়া যায়?"

মা — **"কুল থাকতে কুল পায় না। ব্যাকুল হলেই কুল পায়।"**

ভদ্রলোক — "কিসে বিশুদ্ধা ভক্তি হয়?"

মা — **"গুরু কৃপায়।"**

ভদ্রলোক — "কৃপায় কতটুকু হয়?"

মা — "সব হতে পারে।"

ভদ্রলোক — "মা, ছয়টি ছিদ্রত আছে?"

মা — "নাগের দ্বারা সব ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়।"

২৫শে আষাঢ়, সোমবার।

মা এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত দিনের বেলায় অন্নগ্রহণ করেন না। রাত্রিতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ আসিলে সামান্য একটু গ্রহণ করেন। আজ প্রসাদ আসিতে দেরী হইতেছে তাই আমরা সকলে শুইয়া আছি। রাত্রি ১২টার সময় প্রসাদ আসিল। মাকে উঠাইয়া বসান হইল। মা সামান্য একটু প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই পায়খানায় যাইবেন বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মায়ের চলিবার গতি দেখিয়া আমি একরূপ দৌড়াইয়া গিয়া মাকে ধরিয়া ফেলিলাম। মা উঠানের মধ্যেই একটি কোণে আমার শরীর ভর করিয়া একটু দাঁড়াইলেন এবং তখনই ঐখানে জল কাদার মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। শরীরের ভাবটা অস্বাভাবিক মনে হইল। পা দুটি সটান করিয়া মেলিয়া দিলেন। শরীরের অর্দ্ধেক অংশ আমার কোলের মধ্যে রহিল। পা দুইটি মেলিয়া দিয়া কেমন যেন একটা শব্দ করিয়া একটু কাত হইয়া শুইয়া যেন শরীর ছাড়িয়া দিলেন। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সাধন ব্রহ্মচারীকে চিৎকার করিয়া ডাকিলাম। সেও আসিয়া মায়ের অবস্থা দেখিয়া থতমত খাইয়া মাকে ধরিতে গেল। আমি তাহাকে পরমানন্দ স্বামীজীকে ডাকিতে বলিলাম। স্বামীজী তখন শুইয়া ছিলেন। স্বামীজী আসিতেই মা হঠাৎ যেন একটু নড়িয়া উঠিয়া অস্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন যে পায়খানায় যাইবার শক্তি নাই, ঐখানেই পায়খানা করিবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ত্যাগের উপক্রম

আমি মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াই রহিলাম। একটু পায়খানা হইলে মাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলাম।

সারারাত মা অসাড় ভাবে পড়িয়া রহিলেন। আমিও মায়ের কাছে বসিয়াই রহিলাম।

২৬শে আষাঢ়, মঙ্গলবার।

আজও মায়ের শরীর ঠিক হয় নাই। বিছানায় শুইয়া আছেন। গিরীন দাদা* নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। নাড়ীর গতি অতি মৃদু। পরে মায়ের মুখে তাঁহার এই অবস্থার বিষয় যাহা শুনিলাম তাহার মর্ম্ম এই —

গতকল্য মা আহারে বসিয়া একটু পরেই শরীরের গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন যে শরীরের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। পায়খানার যে বেগ হইল তাহাও লোকের শেষ অবস্থায় নাড়ীর গতি শিথিল হইয়া যেমন হয় তেমন। তারপর যখন চলিতে লাগিলেন তখন লক্ষ্য করিলেন যে চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ ভাবে গিয়াই উঠানের এক কোণে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। মা বলিলেন — **"এর মধ্যে আরও কথা আছে যা এখন বলা আসছে না।"** তারপর শেষ সময়েতে যেমন পা টান হইয়া যায় তাহাও হইল। সবই দেখিতেছেন কিন্তু কোন কষ্ট বোধ নাই। শেষ মুহূর্ত্তে কাহারও কাহারও

---

* ডাঃ গিরীন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র — মায়ের বিশেষ পুরাতন ভক্ত। ইনি কয়েক বৎসর হয় পুরীধামের আশ্রমে থাকিয়া একান্তবাস করিতেছেন। ইঁহার একটি কন্যাও বাল্যকাল হইতেই মায়ের আশ্রমে আছে।

শরীর একটু বাঁকা হইয়া যেমন প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায় সেই ভাবে শরীরটা একটু বাঁকা হইল। আমি ধরিয়া বসিয়াছিলাম বলিয়া ঐরূপ হইল তাহা না হইলে নাকি শরীরটা একেবারে চিৎ হইয়া যাইত। মা দেখিলেন যে প্রাণবায়ু সমস্ত রন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া মহাবায়ুতে মিশিয়া যাইতেছে। মা বলিলেন — **"উহার পরের অবস্থা এখন ভাষায় বলাটা আসছে না। যদি কখনও বলবার হয় তবে বলব।"**

মায়ের অবস্থার ঐ বিবরণ শুনিয়া আমরা ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্! অসুখ ইত্যাদি কোন উপলক্ষ্যই নাই অথচ অন্তিম দশা উপস্থিত। কি ভয়ানক ব্যাপার! মা বলিলেন — **"আবার কেন যে ফিরে আসা হল সে সব কথাও বলা আসছে না।"**

আগামী সোমবার রথযাত্রা। মায়ের শরীরের যে অবস্থা ইহা লইয়া মা রথ টান দেখিতে যাইতে পারিবেন কি না তাহাই সকলে ভাবিতেছেন। অথচ সকলেরই ইচ্ছা যে মাকে সঙ্গে লইয়া এই রথযাত্রা দর্শন করেন। ইহাদের আগ্রহের জন্যই বোধ হয় মায়ের শরীর একটু স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

৩রা শ্রাবণ, বুধবার।

গত সোমবার রথযাত্রা দেখিতে গিয়া মা প্রায় একঘণ্টা বসিয়া রহিলেন। পরদিন বেলা প্রায় ১২টায় রথ টানা হইল।

আজ আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম।

৬ই শ্রাবণ, শনিবার।

আজ কলিকাতা হইয়া মাকে লইয়া আমরা কাশীতে আসিয়া পৌছিলাম।

মার শরীর এখনও সুস্থ নয়। তবে ঐ অস্বাভাবিক ভাবের রেশটা কিছু কমিয়া গিয়াছে সত্য। ঐ প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন যে সেদিন অন্ধকারের মধ্যে ঐরূপটা না হইলে আলোতে মার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই ভীত হইয়া পড়িতাম। এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখি নাই। পরমকরুণাময়ী মা আমাদের ন্যায় নগণ্য আশ্রিত জনের প্রতি অসীম কৃপা করিয়া যে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়াছেন তাহা ভাবিলেও চিন্তার গতি রুদ্ধ হইয়া যায়।

কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন

৮ই শ্রাবণ, সোমবার।

রোজই সন্ধ্যায় গোপাল দাদা * সপরিবারে মার দর্শনের জন্য আসেন। সমস্ত পরিবারটিই বেশ ভাল।

মার ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কথায় কথায় পুরীধামে মার যে অবস্থা হইয়াছিল সেই কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন — "**এই যে বলা হয় সর্ব্বদাই যে এক নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। দেখ না ঐ যে ঘটনা হয়ে গেল মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। আবার যেন ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাবার মত টক্ করে ফিরে আসা। এই যে চোখ কান ইত্যাদির ব্যবহার সব একেবারে বন্ধ। তারপর শ্বাস-বায়ুও একেবারে গায়েব।** দিদি বলছিল যে এর পরে যখন পায়খানা করতে বসাল তখনও দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখে ওর ভয় করছিল। তাত হবেই কারণ

---

* বেনারস ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত Chief Medical Officer ডাঃ গোপাল প্রসাদ দাশগুপ্ত — বারাণসীর একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক।

দৃষ্টি একেবারেই স্বাভাবিক না কিনা। এর মধ্যে আরও একটি ঘটনা আছে যা তোমরা শোনই নাই বুঝি ?"

এই বলিয়া একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। সেইদিন কি একটু সামান্য কারণে সাধনের মার উপরে বিশেষ অভিমান হওয়ায় সে নিজের ভাবে একদিকে বাহির হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে সে ব্যাপারটা একটু ভুল বুঝিয়াছিল। মায়ের এদিকে সারাদিনই সাধনের কথা মনে হইতেছিল। মায়ের খেয়ালেই সে আবার ফিরিয়া আসিল। মার সঙ্গে কথা বলিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সে পরে খুব অনুতাপও করিয়াছে। পরে সেই রাত্রিতেই মার শরীরের ঐরূপ সাংঘাতিক অবস্থা হইয়া পড়িল।

মা আবার বলিতেছেন — "পরমানন্দের মনে এসেছিল যে সাধনের জন্যই এই শরীরটার ঐ রকম অবস্থা হয়েছিল। কারণ একদিন কি কথায় কথায় এই শরীরের মুখ হতে বের হয়েছিল — 'তোমরা এইরূপ করলে এই শরীরটা তোমাদের কাছে নাও থাকতে পারে।' সাধনেরও ঐ কথাটাই বার বার মনে আসছিল।"

মার এই কথাটা শুনিয়া আমি বলিলাম — "দেখুন, মার এক কাজের কিন্তু নানাদিক থাকে। মাও বলেন একটি কাজের অনন্ত কারণ। কাল হয়ত আবার এই কথাই উঠলে মা বলবেন সম্পূর্ণ অন্য একটি দিক।"

মা আমার কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন — "অতি সত্যি কথা, বাবা। **সবটারই যে অনন্ত দিক আছে।"**

কথায় কথায় আরও অনেক কথা উঠিল। মা কখনও হয়ত বলিলেন ঘটিতে জল আছে কিনা দেখিতে। গিয়া দেখা গেল জল আদৌ নাই। তখন আমাদের মনে হইতে পারে যে মা বলিলেন অথচ ঘটিতে জল নাই। এই সব ব্যাপারে মা বলিয়া থাকেন — **"এটা হল ব্যবহারিক ভাব। যদি**

প্রত্যেকটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক তাই হওয়ার হত তবেত তোমাদের সঙ্গে কোনও জাগতিক ব্যবহারই চলত না। তবে বাবা, মা, কেমন আছ — ইত্যাদি জিজ্ঞাসারই বা কি অর্থ? সেদিক দিয়া দেখলেত সবই জানা। কথা বলারই কিছু নেই। এদিকে তোমাদের সঙ্গে সবটাই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা অবস্থা আছে যখন হরিকথা ছাড়া মানে শুধু ঐ বিগ্রহের কথা ছাড়া অন্য সব বাজে কথা। কিন্তু আবার আর একটা স্তর আছে যখন সবই যে তিনিই। তিনি ছাড়া যে অন্য আর কিছুই নেই। রান্নার জিনিষ বল, বিল্ডিংয়ের কাজ বল, যে কোনও কাজ বা যা কিছু বল তিনি ছাড়া আর যে কিছুই নেই। তিনি ছাড়া এটা — এ কথা বললে যে তাঁর সর্ব্বব্যাপীত্বে দোষ আসে। তিনিই সব; আর কিছুই নেই। তাই কোনও কথায় কোন ব্যাবহারেই বাধা আসে না। একই ভাব সর্ব্বদা। তোমাদের জন্যই এই শরীরটাকে দিয়া তোমরা যখন যা হয় করিয়ে নেও। তোমাদের জন্যই এই শরীরের যা কিছু বলা — চলা — কাজ কর্ম্ম।"

১৩ই শ্রাবণ, শনিবার।

আজ গুরু পূর্ণিমা উৎসব। নেপাল দাদার বিরজা হোম যেখানে হইয়াছে সেখানে মনমোহনদার* পর্য্যবেক্ষণে একটি অতি মনোহর মন্দির নির্ম্মিত

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত Steward শ্রীযুক্ত মনমোহন ঘোষ— মায়ের অতি পুরাতন ও বিশিষ্ট ভক্ত পরিবার।

বিরজা মন্দিরে মায়ের প্রবেশ

হইয়াছে। সকলেই মন্দিরটি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছেন। এরূপ মন্দির কাশীতেত নাই-ই — অন্যত্রও সচরাচর দেখিতে পাওয়া কঠিন। সুন্দর ছোট্ট মন্দিরটি একেবারে যেন ছবির মত।

ইহা ছাড়া সাবিত্রী মহাযজ্ঞ যেস্থানে হইয়াছিল সেই যজ্ঞকুণ্ডের উপরে মার ইচ্ছানুযায়ী একটি কুশের ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। বিরজামন্দির এবং এই নূতন কুটিরের গৃহ প্রবেশ আজ এই শুভদিনে হইল।

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে আজ আশ্রমে উদয়াস্ত নামকীর্ত্তন চলিল। ভক্তেরা সকলে মার পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিলেন। পূজা মার ছবির উপরেই করা হইল। বেশ আনন্দের সহিত মার উপস্থিতিতে উৎসব সম্পন্ন হইল।

১৫ই শ্রাবণ, সোমবার।

আমেদাবাদ হইতে কান্তিভাই আসিয়াছেন। তিনি মাকে লইয়া মোটরে ৩৬।৩৭ মাইল দূরে একটি জায়গায় এবং বিন্ধ্যাচল ঘুরিয়া আসিলেন। আমিও মার সঙ্গে ছিলাম। মোটরে বসিয়া পুরীতে মার শরীরের অবস্থার কথা উঠিল। মা বলিলেন —"আর একটা কথাও খেয়াল হয়েছিল যে আঠার বছর আগে পুরীতে যখন জগন্নাথ দেবের নবকলেবর উৎসব হয়েছিল তখনও আসা হয়েছিল। তখন সন্তোষ চলে গেল। এবারও নব কলেবর। এই শরীরটারত কত রকমই হচ্ছে। আর এই শরীরটাকে উপলক্ষ করে কত লোকেই এসেছে। সকলে যেন ভালমত ফিরে যায়। এইরকম একটা খেয়াল ছিল।"

এই সব শুনিয়া কান্তিভাই বলিলেন — "একটা আশ্চর্য্যের কথা যে

আমরা মার একটা জন্মকুণ্ডলী বানাইয়াছিলাম তাহার মধ্যেও এই সময়টা এই রকম একটা গোলমাল ছিল। আমরা সেইজন্য আর এই বিষয় লইয়া কোনও আলোচনাই করি নাই।"

আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে সেবার কলিকাতাতেই ২।১ জন মাকে বলিয়াছিল যে তাহারা মার সম্বন্ধে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। মার ঐ ঘটনাটির পরদিনই কলিকাতা হইতে রায়বাহাদুর সুরেনবাবুর তার গেল মার সংবাদের জন্য। অদ্ভুত ব্যাপার।

পুরীর ঐ ঘটনার পর হইতে মার স্বাভাবিক অবস্থা যেন আর আসিতেছে না। মা যদিও যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য দিয়াই চলিতেছেন। কিন্তু তবু বিশেষ লক্ষ্য করিলেই ইহা ধরিতে পারা যায়। সাধারণে হয়ত এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারে না। কিন্তু আমরা ইহা পরিষ্কার বুঝিতেছি। গত কয়েক বৎসর যেমন সর্ব্বদা সব দিকে একটা 'চট্‌পটে ভাব' (মার ভাষায়) ছিল, এখন যেন সেটা নাই। সর্ব্বদাই কেমন যেন একটা এলান ভাব। জোর করিয়া যেন সব দিকে যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য দিয়া চলিতেছেন।

২২শে শ্রাবণ, সোমবার।

সন্ধ্যার সময় মা তাঁহার ঘরে খাটের উপর শুইয়া আছেন। কি কথা বলিতে বলিতে মা একেবারে স্থির। কথা বন্ধ হইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখে গেলাম। চোখের দিকে চাহিয়া দেখি পলকশূন্য স্থির দৃষ্টি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন এইরূপ ভাবাবস্থা হইলে মুখের অপূর্ব্ব শোভা হইত এখনও তাহাই। কয়েকদিনই যাবৎ মা বলিতেছেন যে শ্বাসের গতিটা যেন কেমন। দম বেশীক্ষণ থাকে না। গোপালদাদা

মায়ের ভাবাবস্থা

নিকটেই ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি একটু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন শরীরেরত কোনও ব্যাধিই নাই। হার্ট বরং খুব ভালই আছে। চিকিৎসকের দিক দিয়া সব ঠিকই। কিন্তু মার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উঠা যে তাঁহাদের বিদ্যা এবং শক্তির বাহিরে।

এইভাবে মার বহুক্ষণ কাটিল। গোপালদাদা মার এইরূপ ভাব কখনও দেখেন নাই। তিনি মাকে একটু কথা বলাইবার জন্য হাসাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিশুর মত আধ আধ ভাষায় সামান্য দুই একটি কথা এবং সেই ভাবেরই একটু একটু হাসি ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পাইল না। একটু একটু কথা বলিতে বলিতে আবার যেন ঐ ভাবে ডুবিয়া যাইতেছেন। আমরাও সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছি দেখিয়া মা আস্তে আস্তে বলিলেন — "যাও, শোও গিয়া। কোনও অসুখত নাই। ভালইত আছি।"

অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। পটল তখনও দাঁড়াইয়া আছে। মা না শোয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ আশ্রম হইতে বাড়ী ফিরিয়া যায় না, সে রাত্রি ২টা কি ৩টা যাহাই বাজুক না কেন। এই অবস্থার ভিতরেও মা একবার পটলের খোঁজ করিয়া তাহাকে বাসায় যাইতে বলিলেন। অনেক বলায় সে অনিচ্ছাসত্ত্বেই চলিয়া গেল।

২৩শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ মার স্বাভাবিক ভাব যেন একটু ফিরিয়া আসিল। তখন উঠিয়া ছাতে একটু হাটিতে লাগিলেন। আধঘণ্টা পরে আসিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পটলও একটু পরেই আসিয়া হাজির। মা শুইয়া আছেন শুনিয়া সে তখন চলিয়া গেল।

আজ সারাটি দিন মা প্রায় ঐরূপ একটি ভাবাবস্থার মধ্যেই রহিলেন। কখনও কখনও দুই একটি কথা বলেন আবার যেন কোথায় ডুবিয়া যাইতেছেন।

২৪শে শ্রাবণ, বুধবার।

আজও মার ভাবটি স্বাভাবিক না। মধ্যে মধ্যে কেমন যেন হইয়া যান।

দিল্লী হইতে ডাঃ জে, কে, সেন মহাশয় কিছুদিন যাবতই মাকে একবার দিল্লী নিয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিতেছেন। কিন্তু মার যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না। ইতিমধ্যে পঞ্চুদাদাও প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে তাঁহার বাড়ীর গৃহপ্রবেশের সময় মা যদি কৃপা করিয়া উপস্থিত থাকেন। সেইজন্য আগামী ২৬শে মার দিল্লী রওনা হইবার কথা হইল। আবার হয়ত ঝুলনের পূর্ব্বে এখানেই ফিরিয়া আসিবেন।

২৮শে শ্রাবণ, রবিবার।

গতকাল আমরা মাকে লইয়া দিল্লী আসিয়াছি। ডাক্তার সেনের বাসাতেই আছি। আজ এখানে ছেলেরা সকলে মিলিয়া নামযজ্ঞ উৎসব করিল।

দিল্লীতে শ্রীশ্রীমা

মা অধিকাংশ সময় ঐ স্থানেই বসিয়া রহিলেন। কখনও কখনও আবার সকলের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম কীর্ত্তনেও যোগ দিতেছেন। নামযজ্ঞ উৎসব খুবই সুন্দর হইল।

৩১শে শ্রাবণ, বুধবার।

আজ পঞ্চুদাদার অনুরোধে সকাল বেলাতেই মা তাঁহার বাসায় গেলেন।

খোলা মাঠের মধ্যে বাড়ী। মা সেখানে ঘুড়িয়া ফিরিয়া অনেকটা স্বাভাবিক ভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ও আনন্দ করিতে লাগিলেন।

৩২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

পঞ্চুদাদার বাসায় তুইদিন থাকিয়া আজ রাত্রে দেরাতুন রওনা হইবার কথা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে এক একদিন পুরাতন ভক্ত সুধীরদা, চারুদা ও অমলদা প্রভৃতির বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। নারায়ণ দাসজীও মাকে বিরলাজীর অনুরোধে তুইদিন বিরলা মন্দিরে লইয়া গেলেন। মার দর্শনের জন্য সেখানে খুবই ভীর হইত। সকলের অনুরোধে মা নামও করিয়াছেন।

সেদিন সুধীরদার বাসায় নাম করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন — "দেখত, কতগুলি কি খাইয়ে দিয়ে গেল। আমি এখন ভাল করে নাম করতে পারছি না।" মার কথাতে বুঝিলাম সূক্ষ্মশরীরী কেহ আসিয়া মাকে কিছু খাওয়াইয়াছেন।

সূক্ষ্মে মায়ের ভোজন

বিরলা মন্দিরে মাকে কেহ প্রশ্ন করিলেন যে মনকে কিভাবে ভগবৎমুখী করা যায়। মা উত্তর দিলেন — **"জীবনে প্রত্যেকটি কর্ম্ম তাঁকে সমর্পণ করার চেষ্টা করা দরকার। এমন কি খাওয়া-দাওয়া, হাটা-চলা, দেখা-শুনা-বলা সব কিছু। তাঁহার হাতের যন্ত্র এই শরীর দ্বারা যা কিছু হইতেছে সব তাঁহাকে সমর্পণ করা। ভোর বেলা জাগরণের পর হইতে নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবটি রাখিতে চেষ্টা করা। তাহার পর মনে মনেই তাঁহার চরণ চিন্তা করিয়া জপ কিংবা ধ্যানের ভাবটি**

মনকে ভগবন্মুখী করার উপায়

সহ চরণের উপর নিজের মাথাটি লুটাইয়া দিয়া সর্ব্ব সমর্পিত ভাবটি নিয়া শুইয়া পড়া। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ মনে আসিবে যে লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি সব খারাপ বস্তু তাঁহাকে দিব কি করিয়া? তিনি যে আমার কত প্রিয় — আপন জন। প্রিয়জনকে কি খারাপ জিনিষ দেওয়া যায়? এই ভাবিতে ভাবিতে আর খারাপ কাজ করাই চলিবে না। তাহার পর তোমার যতটুকু শক্তি সবই যখন তাঁহার চরণে উজাড় করিয়া দিলে, নিজের বলিয়া আর কিছুই রহিল না। এই শুভ মুহূর্ত্তে তিনি কি করেন জান? তিনি তোমার এই অল্পত্ব পূর্ণ করিয়া দেন। তখন চাহিবার, পাইবার আর কিছুই বাকী থাকিবে না। যেই মুহূর্ত্তে তোমার এই সমর্পণ সেই মুহূর্ত্তেই নিত্য যা প্রকাশিত অখণ্ড পূর্ণত্ব তাহার প্রকাশ। আমার আমি, নিজ বলিয়া যা, তাহা অর্পণ মানেই নিজকে পাওয়া।"

৩রা ভাদ্র, রবিবার।

দেরাদুন হইয়া কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন

গত ১লা মার সঙ্গে দেরাদুনে পোঁছিয়া আমরা কিশনপুর, কল্যাণবন ও রায়পুর আশ্রমে ঘুরিয়া আসিলাম। নূতন সন্ন্যাসী স্বরূপানন্দ, প্রকাশানন্দ, চিন্ময়ানন্দ প্রভৃতি দেরাদুনেই আছে। তাহারা সকলে মাকে পাইয়া খুবই আনন্দিত। পরদিনই আবার দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া আজ আমরা কাশী পোঁছিলাম। গঙ্গাদিদির বিশেষ প্রার্থনায় মা গত ২।৩ বৎসর যাবৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমীতে কাশীতেই থাকেন।

১৮ই ভাদ্র, সোমবার।

আজ জন্মাষ্টমী উৎসব। ঝুলনের উৎসবও খুব ভাল মত হইয়া গিয়াছে। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসব চলিয়াছিল। প্রত্যহই মাকে সাজাইয়া ঝুলনে বসাইয়া আরতি ইত্যাদি করা হইত। জন্মাষ্টমীও মার উপস্থিতিতে খুব ধুমধামের সহিত হইয়া গেল। দিল্লী হইতে অনেকেই আসিয়াছেন। ২৪ ঘণ্টা অখণ্ড নাম চলিল।

কাশীতে ঝুলন জন্মাষ্টমী উৎসব

ইতিমধ্যে একদিন মার ঘরে বসিয়া নানা কথা হইতেছে। ঘরে অনেকেই আছেন। মার মুখ হইতে কেহ কেহ বীজ বা মন্ত্রাদি পাইয়া যাইতেছে এই কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন—"দেখ, এই শরীরেরত কোন সঙ্কল্পাদি নাই। এই শরীরটা কত সময়ই হয়ত আপন মনে আছে। হঠাৎ কত সময় নানা বীজ বা সন্ন্যাসের মন্ত্র সব মুখ দিয়া বের হয়ে আসছে। তখন হয়ত সে সব কেউ শুনে নিচ্ছে। আরও হয়ত নানা ভাবে কেউ কোনটা পেয়ে তাই ধরে নিচ্ছে। এই শরীরের কিন্তু সেজন্য দীক্ষা দেব বা কিছু সেই সব দিকই নাই। হয়ে যাচ্ছে। বাবা, এমন এমন ঘটনা হচ্ছে যে সাধারণ লোকে একেবারে স্থির করে নেবে যে নিশ্চয়ই পূর্ব্বের কিছু ঠিক ছিল। কিন্তু কিছুই কিন্তু না। যা হওয়ার তাই হয়ে যাচ্ছে। কেমন জান? যেমন মাটিত আছেই। গাছ থেকে একটি ফল পড়ে তার থেকে গাছ উঠল। কেউ বীজ কিন্তু লাগাল না। কিন্তু বীজ লাগালেও যেমন গাছ হত আপনি ফলটি পড়েও ঠিক তেমনই গাছটি হবে।

মায়ের নিকট হইতে অলৌকিক ভাবে বীজ ও মন্ত্রাদি লাভ

সেই গাছে ফল ফুলও এক রকমই হবে। অথচ কারও এইরূপ আগ্রহ বা সঙ্কল্পাদি কিছুই ত নাই। এই রকমই আর কি।"

২৬শে ভাদ্র, মঙ্গলবার।

আজ দাদা জয়নারায়ণ দাসজীর বিশেষ আগ্রহে মা এটোয়া রওনা হইলেন। এলাহাবাদে অল্প সময় থাকিয়া রাত্রির ট্রেনে রওনা হইলাম।

এটোয়াতে ছয় দিন

২৭শে ভাদ্র, বুধবার।

আজ সকালে মাকে লইয়া আমরা এটোয়া পৌছিলাম। ষ্টেশনে বহু স্ত্রী পুরুষ মাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আসিয়াছিল। মাকে স্থানীয় শিব মন্দিরে লইয়া গেল। দিল্লী হইতেও অনেকেই ইতিমধ্যে আসিয়াছে দেখিলাম।

৩১শে ভাদ্র, রবিবার।

গতকাল সন্ধ্যার পর অধিবাস হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি স্থানীয় ভক্তেরা বিশেষ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিয়াছে। আজ ভোর হইতে দিল্লীর ভক্তেরা নাম ধরিলেন। সন্ধ্যাবেলা কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে নগর কীর্ত্তনের সঙ্গে সকলে মাকে লইয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইলেন। মাকে একটি সুসজ্জিত ল্যাণ্ডোতে বসান হইল। এত ভীর যে প্রথমে আমরা দেখিতেই পারি নাই যে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে ভক্তেরাই পরম উৎসাহ সহকারে গাড়ী টানিয়া নিতেছে।

লোকে লোকারণ্য। কীর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে অনেক বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া লোকে মাকে ফল ফুল দিতেছে — আরতি করিতেছে। এই ভাবে কয়েক ঘণ্টায় নগর পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া মাকে 'লইয়া সকলে মন্দিরে ফিরিলেন। মন্দিরে যেন লোক আর ধরে না। মন্দিরের মালিকও মার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।

প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে মা যখন একা বিরাজ মোহিনী দিদিকে সঙ্গে লইয়া এটোয়া আসিয়াছিলেন তখন মা প্রথমে যমুনাতটে ছিলেন। সেখান হইতে মন্দিরের মালিক হরিবাবু মাকে এইখানে লইয়া আসিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে মাকে বলিলাম — "আচ্ছা, তুমি পূর্ব্বেই এসে জায়গা ঠিক করে গিয়েছিলে। আবার ঘটনাচক্রে এখন এখানেই আসা হল।"

স্থানীয় সকলেই মাকে এখানকার বিশেষ বিশেষ মন্দিরে নিয়া খুব সমাদর করিলেন। যমুনা তটে একটি শিব মন্দির আছে। সেখানে যাইতেই মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন —"তাইত এখানে শিবজীকে সেই সময়ে (১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে) বলে গিয়েছিলাম আবার এখানে এনো। তাইত আসা হল।" এই বলিয়া শিবলিঙ্গ ও শিব পার্ব্বতীর বিগ্রহকে ধরিয়া মুখে ও গালে একটু আদর করিলেন। সঙ্গায় অনেকেই বলিয়া উঠিলেন — "মা, আবারও বলিয়া যান।"

১লা আশ্বিন, সোমবার।

গতকাল সন্ধ্যায় অখণ্ড কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে পর স্থানীয় লোকেরা আবার নাম ধরিলেন। সারা রাত নাম চলিল। আজ ১২টার পরে মেয়েরা আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার সময় দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টা পরে নাম বন্ধ হইল।

এখানে এবার এত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে যে তাহা বলিবার না। খুব আনন্দ চলিতেছে। আর মার সঙ্গীদের এত সেবা যত্ন করিতেছে যে এরূপটা সাধারণতঃ দেখা যায় না। বড় ছোট সকলের মধ্যেই যেন ধর্ম্মের ভাব ও সেবার ভাব বেশ আছে।

২রা আশ্বিন, মঙ্গলবার।

আজ সকালে মা এলাহাবাদ রওনা হইলেন। সন্ধ্যায় এলাহাবাদ পৌছিতেই মাকে সোজা শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি নূতন আশ্রম করিয়াছেন। এখানে একবার আসিয়া থাকিবার জন্য মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিন রাত্রি এখানে থাকার কথা হইয়াছে।

এলাহাবাদে সত্যগোপাল আশ্রমে

তাহার পর ঝুসিতেও যাইবার কথা। কারণ এবার মা যখন কাশী হইতে এটোয়া যাইতেছেন তখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত মা ছোট লাইনের গাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ঝুসি ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই দেখা গেল শ্রীযুক্ত প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী সদলবলে কীর্ত্তন করিতে করিতে মাকে নিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে যদিও পূর্ব্বে কোনই খবর দেওয়া হয় নাই এবং ঝুসিতে তখন নামার কোন কথাই ছিল না। মাকে নামিবার জন্য প্রভুদত্তজী বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেইদিনই এটোয়া যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে অনেক কষ্টে বুঝান হইল। তবে কথা হইল আকস্মিক কোনও বাধা বিঘ্ন না হইলে ফিরিবার পথে মা নামিতে পারেন।

৫ই আশ্বিন, শুক্রবার।

শ্রীসত্যগোপাল আশ্রমে তিন দিন থাকিয়া আজ ঝুসি যাওয়া হইল। এই কয়দিন এখানে খুবই আনন্দে কাটিয়াছে। পূজা, পাঠ ও কীর্ত্তনাদি এখানে প্রত্যহই চলিতেছে। গোপাল ঠাকুর মহাশয় মাকে নিত্য যেভাবে মালা দিয়া সাজাইতেন এবং সাক্ষাৎ জগদম্বা ভাবে পুষ্পাঞ্জলী দিতেন তাহা একটি দেখিবার বস্তু। এইরূপ ভাবের পূজা অন্যত্র দেখা যায় না।

মায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু আজকাল অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। ইনি নূতন বাড়ী করিয়াছেন। একদিন মাকে তথায় নিয়া কীর্ত্তনাদি করিলেন। কৃষ্ণকুঞ্জে এবং ইঞ্জিনিয়ার শর্ম্মাজীর ওখানেও একদিন নিয়া গেলেন।

মাকে ঝুসিতে পাইয়া ব্রহ্মচারীজী খুবই আনন্দিত। বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মার হাতে নানারকমের ফল তুলিয়া দিতেছেন। বিকালে পাঠাদির পরই আমরা সন্ধ্যার গাড়ীতে কাশী রওনা হইলাম। ব্রহ্মচারীজীও দলবল নিয়া হাটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় দশটায় আমরা কাশীতে আসিয়া পৌছিলাম।

১০ই আশ্বিন, বুধবার।

কথা হইয়াছে এবার বহরমপুরে মার উপস্থিতিতে দুর্গাপূজা হইবে। যজ্ঞ উৎসবের সময়েই বহরমপুরের কয়েকজন আসিয়া বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছিলেন।

এদিকে প্রভুদত্তজীও মাকে এলাহাবাদের নিকটে কোথাও এক ললিতা দেবীর মন্দিরে মাকে নিয়া নবরাত্রির পূজা আরম্ভ করিতে চান। শাস্ত্রে

ললিতা দেবীর খুব বর্ণনা আছে। শুনিলাম এলাহাবাদের অতি নিকটেই নাকি সেই দেবীর মন্দির। উহা পীঠস্থানও। কিন্তু ইদানিং উহার কোনও প্রচার নাই। প্রভুদত্তজী যখন পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন তখন এই ললিতা দেবীর মন্দির লুপ্ত প্রায় অবস্থায় দেখিতে পান। উহার পুনরুদ্ধার করিবার ইচ্ছায় তিনি সেইস্থানে একটি নূতন মন্দির তৈয়ার করাইয়াছেন। প্রভুদত্তজীর বিশেষ খেয়াল হইয়াছে যে মাকে তথায় একবার লইয়া যাইতেই হইবে। মা একবার সেখানে যাইলেই ঐ স্থান আবার জাগ্রত হইয়া উঠিবে এই তাঁহার বিশ্বাস।

কিন্তু এবার বহরমপুরে দুর্গাপূজা বহু পূর্ব্বেই ঠিক হইয়া আছে বলিয়া অগত্যা তিনি অন্ততঃ প্রতিপদের দিন মাকে তথায় লইয়া পূজা আরম্ভ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহে রাজী হওয়া গেল। কথা হইয়াছে মা আগামী ২৪শে এলাহাবাদ যাইয়া পরদিনই আবার ফিরিয়া আসিবেন।

২৫শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

প্রভুদত্তজীর আহ্বানে এলাহাবাদ গমন

গতকাল রাত্রে মা এলাহাবাদে আসিয়াছেন। আজ প্রতিপদ। ভোর বেলাই প্রভুদত্তজী মাকে সেই মন্দিরে লইয়া গেলেন। পূজাদি আরম্ভ হইবার পরে মা এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে কাশী রওনা হইলেন। দুর্গাপূজা ২৯শে হইতে আরম্ভ।
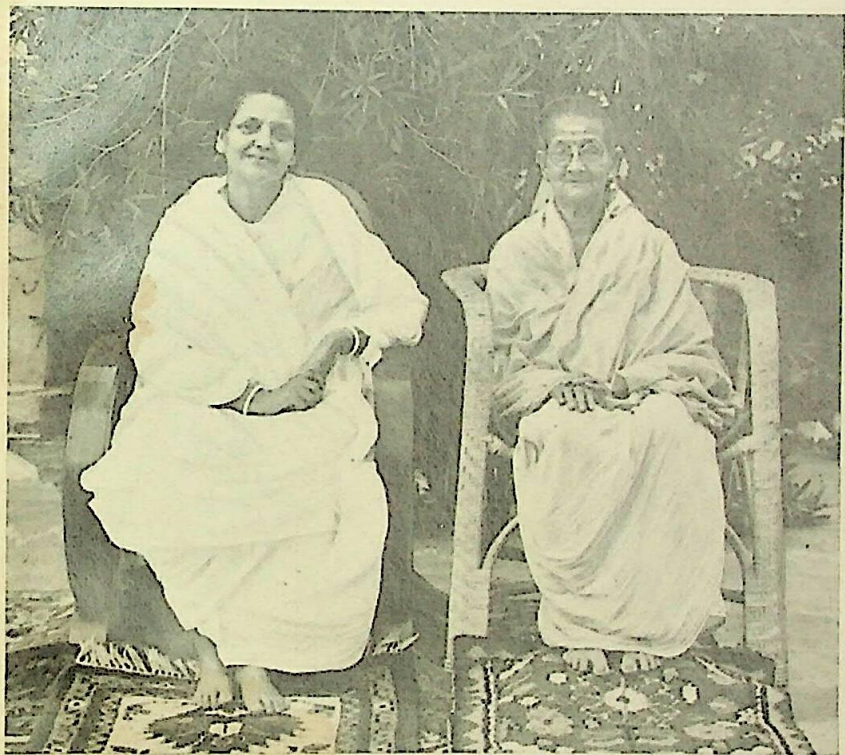
২৭শে আশ্বিন, শনিবার।

বহরমপুরে শারদীয়া পূজা।

গত পরশু রাত্রে মা কাশী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আজ কাশী হইতে কলিকাতা আসিয়া কয়েক ঘণ্টা আশ্রমে থাকিয়া প্রায় রাত্রি দশটায় মোটরে বহরমপুর আসিয়া পৌছিলাম। কাশিমবাজারের মহারাজার গঙ্গানিবাসে মার থাকিবার এবং পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিলাম।

৩রা কার্ত্তিক, শুক্রবার।

বহরমপুরে স্থানীয় ভক্তদের উৎসাহে পূজা বেশ ভালমতই হইয়া গেল। ইতিমধ্যে একদিন কাশিমবাজারেও মহারাজার বাসায় মাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী স্বয়ং ও মহারাণী নীলিমা দেবী মায়ের বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা মায়ের দর্শন পূর্ব্বেও আরও অনেকবার করিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদেরও সকলকে একেবারে রাজোচিত ভাবে আদর আপ্যায়ন করিলেন।

আজ দশমী পূজার দিন স্থানীয় ছেলের দল (বলা বাহুল্য তথাকথিত কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত) নানা প্রকার মিথ্যা প্রচার করিয়া পাকিস্থানের বাস্তহারাদের দ্বারা একটু গোলমাল লাগাইবার চেষ্টা করিল। ব্যাপারটি একটু হয়ত জটিলই হইয়া পড়িত। কিন্তু রায়বাহাদুর অনিল চট্টোপাধ্যায় আসিয়া স্থির ভাবে সমস্ত মিটাইয়া দিলেন। তাঁহার নির্ভীক বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেও পাইয়াছি। এবারও দেখিলাম। বিদ্রোহী দলকে তিনি তেজস্বীতার সহিত ২।৪ কথাতেই একেবারে চুপ করিয়া দিলেন।

৪ঠা কার্ত্তিক, শনিবার।

আজ ভোর বেলা আমরা মাকে লইয়া বেলডাঙ্গা চলিলাম। শ্রীযুক্ত রামধন দাস ঝাঝারিয়ার পুত্র জয়কিশনের বিশেষ আহ্বানেই মার যাওয়া হইল। সারাদিন তথায় থকিয়া রাত্রি একটায় আমরা কলিকাতা রওনা হইলাম।

৫ই কার্ত্তিক, রবিবার।

বরদা রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমা

আজ ভোরে শিয়ালদহ পৌছিয়া মাকে লইয়া আমরা মোটরে ডায়মণ্ড-হারবার গেলাম। তথা হইতে নৌকায় প্রায় তিন ঘণ্টা যাইয়া আরও ৪ মাইল পাল্কি করিয়া মাকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত বরদা গ্রামে লইয়া যাওয়া হইল। আমাদের সঙ্গে ৫।৬ জন মাত্র।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা মাকে বিশেষ প্রার্থনা করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন। নৌকা ঘাট হইতেই কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনির সহিত মাকে ঐ ৪ মাইল পথ লইয়া গেলেন। মাকে পাইয়া যে সকলের কি আনন্দ তাহা বাহির হইতেও আমরা পরিষ্কার অনুভব করিতে লাগিলাম। কিভাবে যে মা ও আমাদের সকলের আদর যত্ন করিবেন তাহা যেন কেহই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সকলের সরল স্বাভাবিক ও ভদ্র ব্যবহারে আমরা খুবই মুগ্ধ হইলাম। এখানে দুই দিন থাকার কথা।

৭ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

আজ সকালবেলা বরদা গ্রাম হইতে রওনা হইয়া আবার সেইভাবে

পাল্কি, নৌকা ও মোটরে করিয়া আমরা বৈকালে কলিকাতা আসিয়া পৌছিলাম। তখনই ননীদার বিশেষ আহ্বানে মা কাঁচড়াপাড়া চলিলেন। কলিকাতা ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

গতকাল আশ্রমে বেশ ধুমধামের সহিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা আশ্রমে লক্ষ্মীপূজা

শারদীয়া পূজাতে মা থাকেন নাই; তাই এই সময়ে মাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য সকলেই বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

আজ সকালে মা জামশেদপুর রওনা হইলেন। টাটানগরের পূর্ব্বে গালুডি ষ্টেশনে রঞ্জনদাদা * সস্ত্রীক আসিয়া মার দর্শন করিলেন। তিনি কিছুদিন হয় এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছেন।

জামশেদপুরে একরাত্রি

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা টাটানগর পৌছিলাম। টেলিগ্রামের কিছু গোলমালে সকলে ষ্টেশনে আসিতে পারেন নাই। তবু অনেকেই আসিয়াছিলেন। স্থানীয় একটি মন্দিরে মাকে লইয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বেও মা এখানে আসিয়া থাকিয়াছেন।

কথা হইয়াছে আগামী কালই মা পুরী রওনা হইবেন। অনেক দিনের প্রচেষ্টায় এবার জামশেদপুরের ভক্তেরা মাকে নিয়াছে। এত শীঘ্র মাকে ছাড়িতে তাহারা কেহই রাজী নন। কিন্তু মার কথার উপরেত আর কথা

---

* কলিকাতার স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার শ্রীনীরদ রঞ্জন দাশগুপ্ত। পূর্ব্বেও ইহার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে।

নাই। এখানকার ভক্তেরা সকলেই খুব সুন্দর স্বভাব বিশিষ্ট। পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতির বন্ধন। তাই সমস্ত কাজগুলি এত সুন্দর ভাবে মিলিয়া মিশিয়া করিয়া থাকেন।

১০ই কার্ত্তিক, শুক্রবার।

আজ সন্ধ্যায় আমরা টাটানগর হইতে রওনা হইয়া খড়গপুরে গিয়া পুরীর গাড়ী ধরিলাম।

১৪ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

পুরীতে দুইদিন

গত ১১ই সকালে পুরী পৌছিয়া মা সেখানে মাত্র দুইটি দিন ছিলেন। আবার গত কাল রাত্রে রওনা হইয়া আজ সকালে কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন। আজই রাত্রে কাশী যাইবার কথা। আগামী ২৪শে কাশীতে অন্নকূট উৎসব।

২৪শে কার্ত্তিক, শুক্রবার।

কাশী আশ্রমে নূতন অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা

আজ অন্নকূট উৎসব। ঢাকা হইতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও কালীমাতার বিগ্রহ কাশীতে আনা অবধি কোনও পৃথক মন্দির করা সম্ভব হয় নাই। এবার স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতি মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া বেশ বড় সুন্দর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মনমোহনদাদার তত্ত্বাবধানেই এই মন্দির বানান হইয়াছে। তিনি এই কাজের জন্য শারীরিক অসুস্থতাও সম্পূর্ণ উপলক্ষ্য করিয়া যে

ভাবে দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সত্যই আশ্চর্য্য। তাঁহার এইরূপ কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মদক্ষতা এবং মার্জ্জিত রুচির পরিচয়ে সকলেই একবাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে।

এই নবনির্ম্মিত মন্দিরে আজ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর বিগ্রহ আনা হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি শিব লিঙ্গও স্থাপনা করা হইল। খুব জাঁক জমকের সহিত অন্নকূট উৎসব হইয়া গেল। মার উপস্থিতিতে যে কোনও উৎসবই যেন অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠে।

২৫শে কার্ত্তিক, শনিবার।

আজ ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। অবধূতজী মহারাজও এখানে উপস্থিত আছেন। সন্ধ্যার পরে নীচের হল ঘরে মা বসিলেন। প্রায় শতাধিক লোক আছে। প্রথমে মাকে ফোঁটা দিয়া পরে সকলকে ফোঁটা ও মিষ্টি দেওয়া হইল। অবধূতজী এই "ব্রহ্ম বিন্দু" উৎসব সম্বন্ধে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

৩রা অগ্রহায়ণ, রবিবার।

গতকাল আশ্রমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাও বিশেষ ভাবে হইয়া গেল। শিব লিঙ্গের উপরই পূজা করা হইয়াছে। এই পূজা আশ্রমে এই প্রথম। এবারকার পূজার পশ্চাতে একটি বিশেষ ঘটনাও আছে। উদাস ১০ কোটি জপ সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প নিয়াছে। সে কি জানি এক স্বপ্ন দেখিয়াছে। সেইজন্যই এই পূজার আয়োজন।

আজ এলাহাবাদ হইতে শ্রদ্ধেয় গোপাল ঠাকুর মহাশয় আসিলেন।

আগামী কাল হইতে আশ্রমে গীতা জয়ন্তী উৎসব হইবে। প্রতি বৎসরই গোপালদাদা আসিয়া কাশীতে মার উপস্থিতিতে এই উৎসব বিশেষ ভাবে করিয়া থাকেন।

৯ই অগ্রহায়ণ, শনিবার।

গতকাল গীতাজয়ন্তী উৎসব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর ডাঃ পারিজা মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া গেলেন। সেখানে বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসব চলিতেছে। প্রথম দিন যাগযজ্ঞাদি করা হয়। সেই উপলক্ষেই মাকে নেওয়া। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর পুত্র গোবিন্দ মালব্যজী পূর্ণাহুতির সময় মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া মাকে দিয়া একটু স্পর্শ করাইলেন। পণ্ডিতগণ স্তোত্রাদি পাঠ করিলেন। মার হাত দিয়া প্রসাদ বিতরণও হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে একটি নূতন মন্দির হইতেছে সেখানেও মাকে মালব্যজী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখাইলেন। সভামণ্ডপেও মার একটু চরণধূলি দিবার জন্য মালব্যজী নিজেই মাকে লইয়া মোটরে সেখানে গেলেন। সেখানেও মা একটু সময় থাকিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে মায়ের গমন

১১ই অগ্রহায়ণ, সোমবার।

আজ মা দেরাদুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার রওনা হইলেন। নরেন্দ্র নগর যাইবার কথা।

১২ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

নরেন্দ্র নগরে শ্রীশ্রীমা

ভোর বেলা হরিদ্বার ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিতেই দেখি যোগীভাইর (রাজা সাহেব সোলন) সেক্রেটারী দেবীরামজী মোটর লইয়া হাজির। প্রায় দেড় ঘণ্টায় আমরা টিহরী গড়ওয়াল রাজ্যের রাজধানী নরেন্দ্র নগর আসিয়া পৌছিলাম।

টিহরীর বর্ত্তমান মহারাজা হইতেছেন শ্রীমান মানবেন্দ্র শাহ। তাঁহার পিতা মহারাজা স্যার নরেন্দ্র শাহ (যোগী ভাইর শ্যালক) প্রায় দুইমাস হয় মোটর দুর্ঘটনায় আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করেন। বিধবা মহারাণী খুবই শোকার্ত্তা। ইহাদের কুলের নিয়ম হইল যে এইরূপ মহাশোকের পর এক বৎসর অন্য কোথাও যাইতে পারে না। মার কাছে ইনি সেইজন্য যাইতে পারেন নাই। অনেকদিন যাবতই মাকে একবার আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মার আসা হয় নাই। এবার তাই যোগীভাইকে দিয়া মার কাছে বিশেষ আবেদন জানাইয়াছিলেন।

মা পৌছিবার একটু পরেই রাজমাতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মা কিছু কিছু সান্ত্বনা দিলেন। বর্ত্তমান মহারাজা, মহারাণী এবং ভগ্নীদের মধ্যেও অনেকেই আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া গেলেন।

রাজমহলের নিকটেই তাঁবু ও কানাত দিয়া ঘিরিয়া একটি যেন বড় বাড়ী তৈয়ার করা হইয়াছে। সঙ্গীয় সকলের জন্য রাজবাড়ীতে স্থান ঠিক করা আছে। মার যাহাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন দেখা গেল।

১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার।

মা এখানে বেশ ভালই আছেন। তবে সাতদিনের বেশী বোধহয় থাকা হইবে না। কারণ দিল্লী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি আসিতেছে।

রাজ পরিবারের সকলেই আসিয়া দুই বেলা মার কাছে অনেকক্ষণ বসেন। মাকে পাইয়া তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছেন। সমস্ত পরিবারটিই বেশ ধর্ম্মপরায়ণ। সাধারণতঃ রাজা মহারাজাদের মধ্যে যাহা খুবই দুর্লভ। রাজমাতাও পূজাপাঠ ও পতিসেবা লইয়াই জীবন কাটাইয়াছেন। শুনিলাম ইহাদের বংশই ধর্ম্মভাবের জন্য বিশেষ খ্যাত। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, উত্তর কাশী সমস্ত স্থানই ইহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখনও বদ্রীনাথের মন্দিরের প্রধান হইতেছেন টিহরী গড়ওয়ালের মহারাজা। সকলেই তাঁহাকে দেবতুল্য পূজা ও শ্রদ্ধা করেন।

আজ মা আমাকে বলিতেছিলেন — "দেখলাম গোপীবাবা এসে এই শরীর যে ঘরে ছিল সেই ঘরে ঢুকল। আর পরে কি বলবে বলে হাত দিয়া ইসারা করল। তারপর এই শরীরটা যেখানে বসেছিল সেখানে চুপ করে বসল।"

আরও একটি কথা শুনিলাম। বর্ত্তমান মহারাজার এখন নাকি খুব ফাঁড়ার সময়। বৎসর দুই মাত্র নাকি পরমায়ু। আর তাহা ছাড়া তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্রের আয়ুও নাকি খুবই কম। এইজন্য মার কাছে তাঁহারা সকলেই বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস যে মার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই সকলে সুস্থ থাকিবে।

১৮ই অগ্রহায়ণ, সোমবার।

আগামী কল্য আমাদের এখান হইতে দিল্লী যাওয়ার কথা। মহারাজা

সস্ত্রীক আজই দিল্লী চলিয়া যাইতেছেন। পূজা সমাপ্ত করিয়া মাকে প্রণাম করিতেই মা নিজের গায়ের চাদরখানি মহারাজার গায়ে দিয়া দিলেন। আর একখানি মার ব্যবহৃত তোয়ালে বাচ্চা ছেলেটির গায়ে জড়াইয়া দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলাম — "ফাঁড়া কেটে গেল।" মা আমাকে অমনি বলিলেন — "তোকে কে এখানে ডাকল ? চুপ কর।"

মায়ের কৃপায় টিহরীর মহারাজ কুমারের ফাঁড়া কাটিয়া যাওয়া

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মা মহারাণী সাহেবকে বলিলেন বাচ্চাকে পিতার কোলে দিতে। তিনি তাহাই করিলেন। আবার মহারাজাকে বলিলেন — "তুমি যোগীর (যোগী ভাই — মহারাজার পিসামহাশয়) কোলে দেও।" মা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন — "ব্যাস্। বাচ্চাত উহার হইয়া গেল।" যোগী ভাইকে বলিলেন — "এখন তুমি বাচ্চাকে তার পিতার কোলে দিয়া বল তোমরা ইহাকে যত্ন করিয়া লালন পালন কর। লালন পালনের জন্যই তোমাদের কাছে দিলাম।" যোগী ভাইও মার আদেশ যথাযথ পালন করিলেন।

মা যোগী ভাইকে আবার বলিলেন — "তুমি বাচ্চার একটা নাম দেও। তোমার মনে যা আসে।" যোগী ভাই অনেকক্ষণ বাচ্চার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন – "সুদর্শন।" মা বলিলেন — "বেশ।" ইহার পর সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

মা যে সকলের অলক্ষ্যে কি ভাবে কখন কি করিতেছেন তাহা সকলের বুদ্ধির অগম্য। রাজপরিবারের সেই ভয়াবহ ফাঁড়া যে কিভাবে দূর করিয়া দিলেন তাহা কে বলিতে পারে ? তবে মায়ের এই সব কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া শিশুপুত্রের নবজন্ম ও নামকরণ দেখিয়া আমার মনে একেবারে স্থির নিশ্চিত বিশ্বাস হইল যে উহাদের আর কোনও রকম বিপদ হইতেই পারে না।

সকলে চলিয়া গেলে আমি মাকে বলিলাম — "ইহাদের ফাঁড়াত কাটিয়ে দিলে। আর ফাঁড়ায় কোনই ক্ষতি হবে না।" একটু থামিয়া আবার বলিলাম — "তুমি যে কাকে কি ভাবে করছ তাত সকলে বুঝতেই পারে না। যেটুকু আমরা শুনি তাও সকলকে জানাতে দেওনা।" মা বলিয়া উঠিলেন — "আচ্ছা, এখন চুপ থাক ত।" কিন্তু কিছুতেই রাজী হইতেছি না দেখিয়া অগত্যা মা বলিলেন — "তোর যখন এতই ইচ্ছা তখন কোনও জায়গায় ঘটনাটা লিখে রেখে দে তারিখ দিয়ে।" কি আর করি ? মার আদেশ পালন করিতেই হইবে। তাই আর কাহাকেও কিছু বলা হইল না।

১৯শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায় আমরা মোটরে দেরাদুন রওনা হইলাম। রাজমাতা মোটরে উঠাইয়া দিতে আসিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে মা যেন হোলির পরেই আবার দয়া করিয়া আসেন। এক বৎসর বাহিরে যাওয়া নিষেধ। নতুবা এখনই মার সঙ্গে চলিয়া আসিতেন। মার আসাতে তিনি মনে খুবই বল পাইয়াছেন। মার আশীর্বাদে মন স্থির করিয়া ভগবানে মন লাগাইবার চেষ্টা করিবেন বলিলেন।

শুনিলাম স্বর্গীয় মহারাজা খুবই প্রভাবশালী ও চরিত্রবান রাজা ছিলেন। তিনি দুই ভগ্নীকে বিবাহ করেন। যিনি জীবিত আছেন তিনি জ্যেষ্ঠা। মা যেদিন এখানে আসিয়াছিলেন তাহার পরদিনই মা স্বপ্নে ৩ জনকে দেখিয়াছেন। উহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক এবং দুইজন পুরুষ ছিলেন। মার মুখে এই কথা শুনিয়া রাজমাতা এই পরিবারের ১৬জন পূর্ব্বপুরুষদের ছবি আনিয়া মাকে দেখাইলেন। মা যাহাদের দেখাইয়া দিলেন তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন

স্বর্গগত মহারাজা নরেন্দ্র শাহ। দ্বিতীয় তাঁহার ঠাকুর দাদা, তৃতীয় তাঁহার ছোট রাণী। আর একদিন মা দেখিলেন ৺মহারাজা নরেন্দ্র শাহজীর হাতে তুইটি সুবর্ণের ধুতুরা ফুল। পরে জানা গেল ইহাদের ইষ্টদেব হইলেন শিব। এই কথা রাজমাতাকে বলিলে তিনি বলিলেন যে টিহরীতে তাঁহাদের খুব পুরাতন তুইটি শিব মন্দির আছে। সেইখানে সুবর্ণের তিনটি ধুতুরা ফুল তিনি তৈয়ার করাইয়া দিবেন বলিলেন।

রাজ পরিবারের মধ্যে তুইজন স্বপ্নে মার সম্বন্ধে অনেক কিছু দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকাশ করা ঠিক না বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইল না। সমস্ত পরিবারই মার উপর বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সম্পন্ন দেখিলাম।

বিকালে আমরা কিশনপুর আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম। সন্ধ্যায় ভক্তেরা সকলে মিলিয়া অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিল।

২১শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

আজ ভোরে আমরা দিল্লী আসিয়া পৌছিলাম। সকলের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে মা এখানে একটি মাস থাকিয়া যান। কিন্তু ডাঃ জে, কে, সেন মহাশয় তাহার ছেলের অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। আরও ২।১টি কারণে কথা হইল এখানে দিন সাতেক থাকিয়া গুজরাটের দিকে মা যাইবেন।

দেরাতুন হইয়া দিল্লী আগমন

টিহরীর মহারাজা মহারাণী আসিয়া মাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। মণ্ডি রাজ্যের রাণীসাহেবাও আসিয়া বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে রাজা সাহেব মাকে একবার মণ্ডি নিয়া যাইবার জন্য একান্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন। মা যখন সুকেত গিয়াছিলেন তখন তাঁহারা সংবাদ না জানায়

মাকে মণ্ডির রাজধানী যোগেন্দ্র নগরে লইতে পারেন নাই। কিন্তু এখন মার পক্ষে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার।

আজ আট দিন হইল মা দিল্লীতে ডাক্তার বাবুর বাসায় আছেন। দিল্লীর ভক্তদের মহানন্দ। ভীর ত সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে।

ইতিমধ্যে রায়বাহাদুর নারায়ণ দাসজী মাকে একদিন বিরলা মন্দিরে লইয়া গেলেন। ছেলেরাও সকলে মিলিয়া একদিন প্রাণ দিয়া নামকীর্ত্তন করিল।

একদিন রাত্রে আমরা মার ঘরে বসিয়া আছি। মা আপন মনে আপন ভাবে বলিয়া যাইতেছেন — **"আট দিন।"** একটু পরেই আবার — **"সোমবার, শ্রাবণ মাস, অষ্টমী, আকৃতি, প্রকৃতি, সাক্ষী"** ইত্যাদি আরও কত কি।

আমেদাবাদ হইতে কান্তিভাই মাকে নিতে আসিয়াছেন। আজ মার রওনা হইবার কথা। প্রথমে মা ভীমপুরা আশ্রমে যাইবেন।

২৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

আজ ভোরে বরোদা ষ্টেশনে মুকুন্দ ভাই, চিনুভাই, অম্বাশঙ্করজী প্রভৃতি অনেকেই মার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। বরোদা হইতে ডাভোই

ভীমপুরা গমন

হইয়া আমরা চান্দোদ পৌছিলাম। সেখান হইতে নৌকা করিয়া নর্ম্মদার পাড়ে ভীমপুরা আশ্রম। এখানে রাজপিপ্‌লার ভক্তেরা মিলিয়া একটি বেশ বড় হলঘর নূতন বানাইয়াছেন।

রাজপিপ্‌লা হইতে ভক্তের মধ্যে অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাদের শ্রদ্ধা ও সেবার ব্যবস্থা দেখিবার জিনিষ। মা হয়ত ২।৩ দিন মাত্র থাকিবেন কিন্তু ইহারা একেবারে প্রায় মাসেকের ভোজনের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন দেখিলাম।

২রা পৌষ, সোমবার।

আজ ভীমপুরা হইতে আমরা রাজপিপ্‌লা আসিলাম। রাজপিপ্‌লার রাজার শিব মন্দিরে মার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিলাম। বিকাল বেলা মাকে ২।৩ স্থানে লইয়া গেল। বহুলোক মার দর্শনের জন্য আসিলেন। আমাদের সকলের জন্যই চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছে।

৩রা পৌষ, মঙ্গলবার।

আজ দুপুরে আমরা ডাভোই আসিলাম। যমুনাদাসজীর বাড়ীতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। মার থাকিবার ব্যবস্থাও এখানেই। আমাদের সঙ্গেও প্রায় ৩৫।৪০ জন লোক।

৪ঠা পৌষ, বুধবার।

আজ দুপুরে ডাভোই হইতে রওনা হইয়া রাত্রে মা আমেদাবাদে পৌঁছিলেন। সেখানে কান্তিভাই ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঠাকুরভাই মার জন্য তাঁবুতে বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন। মার প্রতি এই পরিবারের শ্রদ্ধাভক্তি অপরিসীম। এরূপ সুবন্দোবস্ত সাধারণতঃ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া মুকুন্দ ভাইয়ের স্বভাবও অতি

আমেদাবাদে শ্রীশ্রীমা

সুন্দর ও অমায়িক। কান্তিভাই প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ বন্ধুর ন্যায় মনে করেন।

৮ই পৌষ, রবিবার।

মা আমেদাবাদেই কান্তিভাইর বাসাতে আছেন।

আজ সকালে মাকে মুখ ধোয়াইয়া দিতেছি এমন সময় মা বলিলেন— "দেখলাম, নিশিবাবুর* স্ত্রী নিশিবাবুকে নিতে এসেছে। নিশিবাবু এই শরীরটাকে বলছে—দেখত মা, ও আবার আমাকে নিতে এসেছে। কিন্তু সে বলছে যে এখন নিশিবাবুকে নেবে। পরে ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েদের নেবে।"

মার মুখে এইসব কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম তবে বোধহয় বৃদ্ধের সময় হইয়া আসিল। অবশ্য মা যদি কৃপা করিয়া তাঁহাকে আরও পরমায়ু প্রদান করেন তবে ভিন্ন কথা।

ইতিমধ্যে একদিন স্থানীয় একটি বালকদের প্রতিষ্ঠানে মাকে লইয়া গেল। সেখানে ছেলেদের মধ্য হইতেই মাকে বেশ সুন্দর সুন্দর কয়েকটি প্রশ্ন করা হইল।

---

* ঢাকার পুরাতন ভক্ত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মিত্র। এই ঘটনার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রী পরলোকগমন করিয়াছিলেন। নিশিবাবু বর্ত্তমানে স্থায়ী ভাবে আশ্রমে থাকিয়া বাণপ্রস্থ জীবন যাপন করিতেছেন।

১৬ই পৌষ, সোমবার।

আজ প্রাতে আমরা মোরভি রওনা হইলাম। মোরভির মহারাজা সাহেব* অনেক দিন যাবতই মাকে নিতে চাহিতেছেন। কিন্তু মার যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। এবার বিশেষ আগ্রহ সহকারে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মোরভি গমন

আমেদাবাদ হইতে মোরভি প্রায় ১৫৬ মাইল। আমেদাবাদ হইতে ভিরামগাম, সুরেন্দ্রনগর হইয়া মোরভি যাইতে হয়। আমরা খুব ভোরে রওনা হইয়া বেলা প্রায় একটা নাগাদ মোরভি আসিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশনে বর্ত্তমান রাজমাতা স্বয়ং পুত্রবধূদের সঙ্গে লইয়া মাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। মাকে তাঁহারা সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

রাজপ্রাসাদে পৌছিয়া দেখিলাম মার জন্য বিরাট তাঁবু লাগান হইয়াছে অতি সুন্দর করিয়া সব কিছু সাজান।

বৃদ্ধ মহারাজা তাঁহার ছেলেকে রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ভার দিয়া বর্ত্তমানে রাজমহল ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন একটি বাড়ী করিয়া একান্তে সাধন ভজন করিতেছেন। বৃদ্ধা মহারাণীও তথায় থাকেন না। বৃদ্ধ মহারাজা শুনিলাম কিছুদিন যাবৎ শয্যাগত আছেন। বিকালে মাকে তাঁহার পূজার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। সকলে মার দর্শন পাইয়া যেন একেবারে চিরকৃতার্থ। বধূরাণীরা যেন একেবারে পাগল। অথচ এই প্রথম তাঁহারা মার দর্শন লাভ করিবার সুযোগ পাইলেন।

---

* বৃদ্ধ মহারাজা স্যার লুখদিরজী দীর্ঘকাল অসুস্থতার পরে গত বৎসর দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহারাজাও বিলাতে আকস্মিক ভাবে পরলোকগমন করেন। সমগ্র পরিবারই মায়ের বিশেষ ভক্ত।

১৭ই পৌষ, মঙ্গলবার।

সকলে ভাবিয়াছিল আমাদের সঙ্গে প্রায় ৫০।৬০ জন লোক থাকিবে। ওদিকে মা সঙ্গে মাত্র ৮।১০ জন নিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া দেখি তাঁহারা ৫০।৬০ জনের থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা সমস্ত পাকা করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি প্রত্যেকের জন্য বিছানা পর্য্যন্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। সকলের মধ্যেই যে সুন্দর সেবা ও ভক্তি ভাব দেখিতেছি তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজপরিবারের মহিলারা খুবই পর্দ্দানসীন। কিন্তু এই প্রথম মাকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়া তাঁহারা প্রথা ভঙ্গ করিলেন। বিকালেও দেখিলাম সৎসঙ্গের মধ্যে রাণীরা সকলেই গিয়া মার নিকট সকলের সম্মুখে বসিলেন। রাত্রিতেও মহিলারা অনেকেই আসিয়া মার কাছে তাঁবুর মধ্যে শুইলেন। রাত্রি প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত আমার কাছে বসিয়া বসিয়া মার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাদের সে কি আগ্রহ।

আজও মাকে বৃদ্ধ মহারাজার নিকট লইয়া গেল। তিনি মার দর্শনে যেন নিজেকে চিরধন্য মনে করিতেছেন। বৃদ্ধের কি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভক্তি। পরে মাকে তাঁহার রাজ্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানগুলি সব দেখান হইল। দেখিবার বস্তু অনেক আছে। মোরভি দেখিলাম বেশ বড় রাজ্য। পূর্ব্বেত খুবই বড় ছিল। এখন অবশ্য অধিকাংশই ভারত সরকারের হাতে।

আজ দুইটার গাড়ীতে আমরা আবার রওনা হইলাম। সকলেই মাকে আরও অন্ততঃ একটি দিন থাকিয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে কথা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মা আর থাকিতে রাজী হইলেন না। বর্ত্তমান মহারাজার স্ত্রী ও ভ্রাতৃবধুরা মাকে সঙ্গে লইয়া প্রায় ২৮ মাইল দূরে বঙ্কানের ষ্টেশনে আসিয়া মাকে ট্রেনে উঠাইয়া দিলেন। তখন পর্য্যন্ত ইহাদের খাওয়াও হয় নাই। মা কত বলিলেন কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। মার

ট্রেন ছাড়িবার সময় হইলে তাঁহারা অশ্রুজলে মাকে বিদায় দিলেন। এমন কি ছোট্ট একটি মেয়ে পর্য্যন্ত কাঁদিয়া আকুল। যেন কত একজন আপন জন চলিয়া যাইতেছে। মার প্রতি ইহাদের তীব্র আকর্ষণ (মাত্র একদিনের পরিচয়ে) দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই বিস্মিত হইলাম। সাধারণ জগতে ইহা কি কখনও সম্ভব ?

আমেদাবাদ হইতে পটলকে সঙ্গে নিয়া সতী, রেণু, সাবিত্রী ও গঙ্গাকে দ্বারকা দর্শনে মা পাঠাইয়াছিলেন। তাহারাও সকলে আমাদের সঙ্গে বঙ্কানের ষ্টেশনে আসিয়া মিলিত হইল। ভিরামগাম ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি কান্তিভাই ও মুকুন্দভাই মোটর লইয়া উপস্থিত। এখান হইতে মাকে মোটরেই লইয়া যাইবে।

মোটরে মার সঙ্গে কান্তিভাই, মুকুন্দভাই, বেলুন (হিরণদির মেয়ে), সতী (অমূল্যদাদার মেয়ে) ও আমি চলিলাম। মোটরে আসিতে আসিতে

আমেদাবাদ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সতীর জীবন রক্ষা

সতী মোটরের যেদিকে বসিয়াছিল হঠাৎ সেইদিকে আর একটি মোটরের সঙ্গে ধাক্কা লাগার জোর শব্দ হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য যে ড্রাইভার গাড়ী না থামাইয়া সোজা চালাইয়া আসিল। গাড়ী এত জোরে আসিতেছিল যে আমরাও বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। নিরাপদেই আসিয়া সকলে আমেদাবাদ পৌছিলাম।

মা আসিয়া বিছানার উপর বসিয়াছেন। হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন — "এই যত ধাক্কা টাক্কা সবই সতীর জন্য।" মার মুখে এই কথা শুনিয়া আমরা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে কি ব্যাপার। একটু পরে সতী বলিয়া উঠিল — "ওঃ, আমি বুঝেছি —।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি বুঝেছিস্ ?" সতী জবাব দিল — "এখন না। পরে বলব।"

অনেক লোক মার দর্শনের জন্য ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে চলিয়া যাইবার পরে মা সতীকে একান্তে ডাকিয়া কথা বলিলেন। পরে আমাদের বলিলেন যে সকলকে এক এক দল করিয়া দ্বারকা পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ করিয়া সতীর জন্য মার একটি বিশেষ খেয়াল আসিতেছিল। মেয়েরা অনেকেই গিয়াছে। তাহাদের সঙ্গেই পূর্ব্বে সতীরও যাওয়ার কথা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না। মা বলিতেছিলেন — "শরীরটার খেয়াল হচ্ছিল যে যাওয়া হল না ভালই হল। কারণ কি রকম একটা গোলমালের খেয়াল হচ্ছিল। তাই প্রথমেই বলা হয়েছিল সতী ওরা সব মেয়েরা যায়ত দিদিরও সঙ্গে যেতে হবে।"

একটু থামিয়া মা বলিলেন — "তবে একবার বলা হয়েছিল যে পরমানন্দ বা পটল যদি যায় তবে দিদির না গেলেও হবে। এবারও দিদিকেই বলা হয়েছিল। কিন্তু তার পর পটল বলল যে সেই যাবে সুতরাং দিদির আর দরকার কি? তখন খেয়াল হল একবার ত এটা বলা হয়েছিল। আচ্ছা। বুবা ও বেলুন ত সঙ্গে মোরভি গিয়েছিল। কিন্তু ভিরামগাম থেকে মোটরে রওনা হবার সময় বুবাকে না নিয়ে সতীকে সঙ্গে নিয়ে আসবার কথা বলা হল।"

মা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন — "অনেকে হয়ত মনে করতে পারে যে, দেখ, মা সতীকে ভালবেসে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিন্তু কিসের জন্য যে কি করা হয়। তার পর দেখ সতী যে দিকে বলেছিল সেইদিকেই একটা গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগল। শুনা গেল গাড়ীর একটা অংশ নাকি ধাক্কা লেগে একেবারে উড়ে গিয়েছে। কি ভীষণ ব্যাপার।"

এই বলিয়াই মা বলিতেছেন — "তারপর সতী কি দেখেছে তোমরা ওর মুখেই শোন।"

সতীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে একটি কথা সে বলিবেনা ভাবিয়াছিল। কিন্তু মার মুখে ঐ কথা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে আজ মোটরে উঠিবার সময় সে দেখিতেছে যেন একটা মৃতদেহ ৪।৫ জন লোক বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে। একবার দেখিল। আবার কিছু নাই। আবারও দেখিল। তখন মনে একটু ভয় হইল। মনে হইল যে মা সঙ্গে আছেন তাই কিছুই হইবে না।

মা এই সব কথা শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠিলেন — "দেখ, কি রকম যোগাযোগটা।" আমরা অবাক হইয়া এইসব কথা শুনিতেছিলাম। বুঝিলাম সতীর একটি ভয়ঙ্কর ফাঁড়া মা কাটাইয়া দিয়াছেন।

২২শে পৌষ, সোমবার।

ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে কান্তিভাই পরিবার সহ মার নিকট রাত্রে বসিয়া আছেন। কান্তিভাই হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন যে স্থানীয় এক কালীমন্দিরে ৺কালী মাতার যে বিগ্রহ স্থাপিত আছে তাহার সহিত মার কিছু ভেদ আছে কিনা। প্রশ্নটি খুব পরিষ্কার — একেবারে সোজা।

মা একটু হাসিয়া জবাব দিলেন — **"সকলের মধ্যেই কালীমা আছেন ইহা বিশ্বাস করিও।"**

এই কথায় কান্তিভাইর তৃপ্তি হইল না। পুনরায় তিনি ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মা কিছুতেই পরিষ্কার উত্তর দেন না। পুনঃ পুনঃ একই প্রশ্ন করিলে অগত্যা মা বলিয়া উঠিলেন — **"দেখ, এই শরীরটা অনেক সময়ই নিজেকে গোপন রাখে ব্যবহারে কথায়। এই হইল আসল কথা। তাহা হয়ত দরকার। তাই হইয়া যাইতেছে।"** এই বলিয়াই অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন।

আজ সকালে মা তখনও উঠেন নাই। হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি আসিয়া দেখি মা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। সেই অবস্থাতেই বলিলেন — "একটা মজার কথা শোন্। দেখছি একটা পুকুর। তার মধ্যে মাছ আছে। কোনও কোনওটির পেটে ডিমও আছে। একটা লোক সেই গুলিকে মারছে। এর মধ্যে হল কি, জলস্তম্ভ ত এই শরীর কখনও দেখে নাই, ঐ পুকুরের মধ্য থেকে লম্বা হয়ে একটা জলস্তম্ভ উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সেই স্তম্ভটা উঠে পাড়ে আসল। এসে মাটির উপরই ঘুড়তে লাগল। ঘুড়তে ঘুড়তে নীচের দিকে দুইখানা পা হয়ে গেল আর তারপর একটা পুরুষ মূর্ত্তি দেখা দিল। গায়ে একখানা চাদর। তাও যেন জল দিয়েই তৈরী। শরীরটা প্রথমে জলময় ছিল; পরে স্বাভাবিক মানুষের মত হল। তারপর ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি আবার জলের দিকেই যেতে লাগল। এই শরীরটা পুকুরের পাড়েই দাড়িয়েছিল। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিটি তা বিশেষ লক্ষ্য না করেই চলে যাচ্ছে। তখন এই শরীর সামনে গিয়া বলল — 'দেখ, তোমার জন্যই আমার এইখানে এইভাবে প্রকাশ। তোমার জন্যই এখানে আসা।' এই বলতেই সে এই শরীরটার দিকে চেয়েই যেন কেমন হয়ে গেল। ভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। শিশুর মত এই শরীরটার কাছে এসে বসল।"

স্বপ্নদর্শনের কথা

মার কথার ভাবে বুঝিলাম একেবারে যেন শরণাগত ভাবটি। আরও মনে হইল তিনি যেন একজন যোগী পুরুষ — যাঁহার ধ্যানে ছিলেন তিনি যেন স্বয়ং মা-ই। যাহাই হউক মা আবার বলিতে সুরু করিলেন — "এই শরীরের পাশে তখন অম্বলী পাতা ছিল। তাই কিছুটা উঠিয়ে তাকে দিয়ে বলা হল— 'এই পাতা তুমি এই শরীরের স্মৃতি স্বরূপ কাছে রাখ। এই শরীরের সঙ্গে যে দেখা হল তার নিদর্শন স্বরূপ।' সে যত্ন করে তা নিল এবং যোগ ক্রিয়ায়

নিজের শরীরের মত করে নিল যেন কাছেই রাখা যায়। এই শরীর তখন তার মাথায় হাত দিল। তখন আর এই শরীরের যেন কোনও রকম সঙ্কোচের লেশ মাত্র নাই। তারপর সে ধীরে ধীরে জলের দিকে চলল। কিন্তু জলের কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলছে যে জলের দিকে যেতে পারছে না। এই শরীরটা যেন টেনে আনছে। তখন এই শরীর বলল — 'না চল আমি সঙ্গে করে তোমায় নিয়ে জলে রেখে আসি। তোমাকে জলে রেখে তবে আমি যাব।'

এই বলিয়া মা বলিতেছেন — "তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে জলে যাওয়া হল। সে গিয়েই যেন জলে ডুব দিল। তবে যে ঘাট দিয়ে উঠেছিল সেই ঘাট দিয়ে না অন্য ঘাট দিয়ে। পরমানন্দও দাড়িয়ে দাড়িয়ে এই সব দেখছে আর যেন অবাক ও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। অপর পারে ভোলানাথ আছে। তাও যেন বিগ্রহের মূর্ত্তি।"

মা আবার বলিতেছেন — "যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আছে না? এই রকম এক একটা তত্ত্ব নিয়ে এক একজন যোগী সেই রকম হয়ে থাকতে পারে। কি জন্য যে কোথায় যাওয়া হয় —" এই বলিতে বলিতেই একটু থামিয়া এখানকার একজন বিখ্যাত যোগী পুরুষের নাম করিলেন। কিন্তু মার কথায় আমি এসব বিষয় কাহারো নিকট কিছু প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

রাত্রিতে কান্তিভাইর নিকট কিছু কিছু কথা মা নিজেই উঠাইলেন। কিন্তু অনেক কিছুই বাদ দিয়া গেলেন। তবে মা বলিলেন — "যখন এই সব দেখে-ছিলাম তখনই দিদি এসেছিল। ঠিক ঠিক ঘটনাগুলি সব ওকে বলা হয়েছে।"

২৪শে পৌষ, মঙ্গলবার।

আজ আমরা রাত্রে বম্বে রওনা হইলাম। কথা হইয়াছে পরশু আবার দিল্লী ফিরিয়া যাওয়া হইবে।

মা সকালে এবং বিকালে ও রাত্রে প্রত্যহই প্যাণ্ডেলে কিছু সময় বসিতেছিলেন। বহু লোক একত্রিত হয়।

একদিন সৎসঙ্গে মাকে এক ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন — "পিতৃশ্রাদ্ধের দরকার আছে কি না? পিতার ত জন্ম হইয়া গিয়াছে বোধহয়।" মা উত্তর দিলেন — **"জন্ম হইয়া গেলেও শ্রদ্ধার দান :পৌছে। যেমন সেদিন কাঠালের গল্প করা হয়েছে। সন্তানের কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করা। জন্ম হইলেও একটা তৃপ্তি হয়। করা দরকার।"**

২৭শে পৌষ, শুক্রবার।

গত পরশু সকালে মা বম্বে পৌছিয়াছেন, সিয়ঁতে মুলজীভাইর বাড়ীর শিবমন্দিরে মার থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একটি প্যাণ্ডেলও করা হইয়াছে। দর্শনার্থীদের ভীর যেন লাগিয়াই আছে। সকলেই মার দর্শনের জন্য ব্যাকুল। মুলজীভাই প্রভৃতি যথা সাধ্য সুব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বম্বেতে আগমন

আমরা ২৬শে সন্ধ্যায় ফ্রন্টিয়ার মেলে দিল্লী রওনা হইলাম। বরোদা ষ্টেশনে রাত্রে অনেকেই মার দর্শনের জন্য আসিলেন। মা আবার কবে এই দিকে আসিবেন সেই প্রার্থনাই তাঁহারা বারবার করিতেছেন।

আজ সকাল প্রায় এগারটা। গাড়ী কোটা ষ্টেশন পার হইয়া আসিয়াছে।

মা আপন মনে বসিয়া বসিয়া গাহিতেছেন (বলা বাহুল্য নিজেরই রচনা) —

"গুরু গোবিন্দ ব্রহ্ম নাম
মা দুর্গা শিব রাম।
গুরু গোবিন্দ ব্রজ ধাম
মা দুর্গা শিব রাম।
গুরু গোবিন্দ ব্রহ্ম ধাম
মা দুর্গা শিব রাম।"

একটু পরে কুসুম মার গাড়ীতে আসিলে মা তাহাকে এইটা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। হাতে তালি দিয়া মহানন্দে আপন ভাবে গাহিতেছেন।

প্রায় সন্ধ্যার সময় দিল্লী পৌছিলাম। ষ্টেশনে অনেকেই ছিলেন। মাকে সোজা ডাক্তার বাবুর বাসাতে আনা হইল।

৭ই মাঘ, রবিবার।

দিল্লীতে কয়েকদিন

মা দিল্লীতেই আছেন। ইতিমধ্যে করোলবাগে নারায়ণ দাসজীর বাড়ীতে নাম যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল। মাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল।

আজ মাকে উড়িয়া বাবার ভক্তেরা যমুনার পারে কুশিয়া ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখানে সৎসঙ্গ চলিতেছে। স্বামী অসঙ্গানন্দজীও সেখানে আছেন। সাধুরা সকলে মিলিয়া মাকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে মা অসঙ্গানন্দজীকে দেখাইয়া বলিলেন — "ইহ তো ছোটি বাচ্চী হ্যায়। পিতাজীকে পাস্ শুননে কে লিয়ে আয়ী হ্যায়।" এই বলিয়া শিশুর মত হাসিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ অসঙ্গানন্দজী মার দিকে চাহিয়া বলিলেন — "মা, ইস্ তরহ ছোটি বাচ্চী ক্যায়সে হোনা সম্ভব হ্যায় ?"

মা হাসিয়া বলিলেন — "পিতাজী, তুমহী, তুমহী তো ছোটা বাচ্চা। ইস্ শরীরনে জব পিতাজী করকে কহা, পিতাজীকা হী ইস্ রূপসে প্রকাশ (এই বলিয়া নিজের শরীর দেখাইলেন)।"

একটু থামিয়া বলিলেন — "পিতাজী। ইস্ শরীর কো কিসিনে শুনায়া থা কি মদালসানে উনকে লড়কেসে ইহ কহী কি 'পুত্র, তুম মদালসাকা পুত্র হো। ঔর কিসিকা পুত্র নহী হোনা।" এই বলিয়া হাসিলেন। সকলে পুনরায় মাকে কিছু বলিতে বলায় মা বলিলেন — "ইস্ শরীর কী একহী বাৎ হ্যায়। হরি কথা হী কথা ঔর সব বৃথা ঔর ব্যথা।"

ডাক্তার জে, কে, সেন মহাশয়ের ছেলের বিশেষ বাড়াবাড়ি অসুখ। মা একদিন বাথরুমে মুখ ধুইতে ধুইতে আমাকে বলিতেছেন — "দেখ্, আমি দেখছি কি জানিস্ ? বাবা (ডাক্তার সেন) তখন বলছিল অসুখের কথা। দেখছি এই শরীর নিজের কান থেকে হাত দিয়ে অসংখ্য পোকা ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলছে। আর পোকাগুলি দলবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।" পোকাগুলির আকৃতির বিষয়ও বলিলেন। আবার বলিতেছেন — "একজন সব পোকাগুলি একটা হাড়িতে নিয়া জমা করে খিচুড়ি বানিয়ে খাবে বলে রান্না চাপিয়ে দিল।"

ডাঃ সেনের রোগ সম্বন্ধে সুক্ষ্ম দর্শন

কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন — "**কর্ম্ম করে যাও। কর্ম্মফল সব তাঁর চরণে অর্পণ করবার চেষ্টা কর। ভালমন্দ সব তাঁরই চরণে এই ভাবটা বিশেষ করে নেওয়া। তাঁকে ছেড়ে থেক না, কষ্ট পাবে। সবটার মধ্যেই তাঁকে রাখা। সব কাজের মধ্যেই তাঁর নাম রাখবে। দিনত চলেই যাচ্ছে।**"

এইরূপ নানা মূল্যবান কথা মা প্রায়ই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমি একেবারেই সময় পাই না বলিয়া যথাযথ ভাবে লিখিয়া রাখাও হয় না।

ডাক্তারবাবুকে মা তাঁহার ছেলের নিকট যাইতে বলিতেছেন। কিন্তু তিনি মাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইতেছেন না। তাই মা ছেলেদের বুঝাইয়া বলিলেন মাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য। দুইবারে প্রায় ১৯ দিন হইয়া গেল। অগত্যা মার ৯ই মাঘ দিল্লী হইতে কাশী যাওয়ার কথা হইল।

১২ই মাঘ, শুক্রবার।

বিন্ধ্যাচল ও কাশীতে কয়েকদিন

গত পরশু আমরা মার সঙ্গে বিন্ধ্যাচল আসিয়া পৌছিয়াছি। কাশী হইতে ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় সপরিবারে মার কাছে আসিয়াছিলেন। মাও সেই সঙ্গেই কাশী চলিয়া গেলেন।

২২শে মাঘ, সোমবার।

গত ১২ই মাঘ মা একদিনের জন্য কাশী আসিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলে আসেন। আবার ১৮ই কোনও কার্য্য উপলক্ষে কাশী গিয়া আজ বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া আসেন। গোপালদাদাই আবার মাকে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। মার সঙ্গে কাশী হইতে ছয়জন বিদেশীও আসিয়াছেন।

কাশী আশ্রমে গত কয়েকমাস যাবৎই দুইজন সাহেব আছেন। একজন স্কট্ল্যাণ্ডের কলিন্ টার্ণবুল্। ইনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে

গবেষণা করিতেছেন। মা নাম দিয়াছেন 'প্রেমানন্দ।' অপর একজন অ্যামেরিকান নাম জ্যাক আঙ্গার — অল্প বয়স্ক যুবক। ভারতে ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে রমণ মহর্ষীর আশ্রম হইতে কয়েকজন সাহেব ও মেম মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। ইহারা সকলেই মার সঙ্গ করিতে বিন্ধ্যাচল আসিয়াছেন। প্রত্যেকেই বেশ ধর্ম্মভাবাপন্ন মনে হইল।

কলিন টার্ণবুল ও জ্যাক আঙ্গার

২৫শে মাঘ, বৃহস্পতিবার।

বিন্ধ্যাচলে দুইটি বেশ বড় বড় তাজা গাছ ছিল। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি মরিয়া যায়। সেই গাছের বিষয়ে সাহেবরা আজ বীথুকে* নাকি প্রশ্ন করিয়াছিল। কিন্তু সে কোনও ভাল জবাব দিতে পারে নাই।

বিন্ধ্যাচলের বৃক্ষরূপী মহাত্মা প্রসঙ্গ

অনেক রাত্রিতে মা শুইলেন। মার ঘরে মাত্র আমি ও বীথু। বীথু সাহেবদের ঐ প্রশ্নের বিষয় মাকে বলায় মা হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন — "তুমি এই কথাটার উত্তর দিতে পারলে না? বললেই পারতে **কত ঋষি মুনি ত এই আকারে থাকেন। এই ছোট্ট মেয়েটাকে একটু ছায়া দেওয়া একটু ফল খাওয়ান বাকী ছিল। অনেক সময়েত একটু মাত্র কর্ম্ম বাকী থাকে। কর্ম্মটুকু শেষ হলেই হয়ে গেল।**"

---

* এলাহাবাদের পুরাতন ভক্ত শ্রীনীরজ নাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী বীথিকা।

আমি বীথুকে বলিলাম — "তুই বুঝলি না ? এই ঘটনায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে মার একটু সেবা করে বৃক্ষরূপী মহাত্মা মুক্ত হয়ে গেলেন।" এই কথার মা আর কোনও জবাব দিলেন না।

২৬শে মাঘ, শুক্রবার।

শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় পাটনাতে সরস্বতী পূজা করিবেন। আজ মাও তাই পাটনার ভক্তদের বিশেষ আহ্বানে পাটনা রওনা হইলেন।

পাটনায় সরস্বতী পূজায় মায়ের উপস্থিত

পাটনা ষ্টেশনে শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং এবং আরও অনেকে কীর্ত্তনাদি সহ মাকে নিতে আসিয়াছিলেন। স্থানীয় কংগ্রেস ময়দানে মার থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৭ই ফাল্গুন, সোমবার।

এখানে খুবই আনন্দ ও ধুমধামের সহিত শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন, সৎপ্রসঙ্গ ও পূজাদিতে এই কয়টি দিন বেশ কাটিয়া গেল। দিন দিনই ভীর বাড়িতেছে।

আজ প্রাতে মা কাশী রওনা হইলেন।

৯ই ফাল্গুন, বুধবার।

স্বপ্নে ছয়টি প্রেতাত্মা দর্শন

আজ মা আমাকে এক সময় ডাকিয়া বলিতেছেন — "দেখ্, দিদি, যেদিন এখানে আসা হল সেদিন দেখছিলাম ৬টি আত্মা এই শরীরটার কাছে এসেছে। তার মধ্যে একজন কিশনপুরের আশ্রমের রাস্তার ধারে একটা গাছে থাকে। আর পাঁচ জন একটা ময়দানের

মত জায়গায় একটা জলাশয়ের ধারে থাকে। বল্ দেখি এদের জন্য কি করা ?”

পরে মার কথার ভাবে আমাদের বিবেচনায় বুঝিলাম যে মার দর্শন পাইয়া হয়ত উহারা প্রেতযোনী হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

২০শে ফাল্গুন, রবিবার।

গতকাল মা এলাহাবাদে আসিয়াছেন। এলাহাবাদে ভক্তেরা নামযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে। সন্ধ্যায় অধিবাস হইবার পরই মেয়েরা নাম ধরিল —

এলাহাবাদে নামযজ্ঞ

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥”

সারা রাত মেয়েরা নাম করিল। মাও মধ্যে মধ্যে নামে গিয়া যোগ দিতেছেন। ভোর পাঁচটা হইতে ছেলেরা নাম ধরিল। খুব চমৎকার নাম চলিতেছে। অনেকেই বলিতেছিলেন যে এইরূপ সুন্দর নামকীর্ত্তন তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই। বাস্তবিকই দিল্লীর ছেলেরা যেন নামে পাগল। নিজেরা নামে মাতিয়া অন্য সকলকেও মাতাইয়া দেয়। নামে যে তাহারা সকলে কি এক অসীম আনন্দ পায় তাহা সহজেই অনুমেয়।

২২শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

গতকালই মা আবার কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন। আজ শিবরাত্রি। নানা স্থান হইতে অনেকেই আসিয়াছে। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরের সম্মুখে বেশ বড় একটি বারান্দা করা হইয়াছে। সেইখানেই পূজার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কন্যাপীঠের মেয়েরাও স্মৃতিমন্দিরে বসিয়া পূজা করিবে।

কাশী আশ্রমে শিবরাত্রি উৎসব

প্রথম প্রহরেই মেয়েরা পূজায় বসিয়া গেল। আর ছাতের উপর দুইস্থানে দুইটি শিব রাখিয়া পূজার আয়োজন হইয়াছে। একটিতে পুরুষেরা এবং অপরটিতে মেয়েরা পূজা করিবে। কন্যাপীঠের মেয়েদের পূজা, স্তোত্রপাঠ ও গানে সমস্ত আশ্রম যেন মুখরিত। মা সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় প্রহরে মাকে বিশ্বনাথজীর মন্দিরের পাণ্ডা মন্দিরে লইয়া গেলেন। সঙ্গে বহু লোক। সেখানেও ভয়ানক ভীর। পাণ্ডারা মার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। মন্দিরের পশ্চাতে যেখানে স্নানের জল আসিয়া জমা হয় সেখানে মাকে নিয়া আসিয়া দেখি যে আর নড়িবার উপায় নাই। কমল একটু উপরে মন্দিরের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন — "কমল শরীরটা কিন্তু পড়ে যাচ্ছে।" কিন্তু কমলের সাধ্য নাই যে কুণ্ডের উপরে রেলিং পার করিয়া মাকে উঠাইয়া নেয়। হঠাৎ মার কেমন একটা ভাব হইল যে ইন্দুরের মত মা সকলের ঘাড়ের উপর দিয়াই চলিয়া যাইতে পারেন। এই কথা ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মা হাত বাড়াইতেই কমল একটু হাত ধরিল। কিন্তু সেখানেও অসম্ভব ভীর। আর মাকে এতদূর হইতে তাহার পক্ষে উঠাইয়া নেওয়া সম্ভবই ছিল না। কিন্তু মা চট্ করিয়া কেমন ভাবে যেন ঐ ভীরের মধ্য দিয়াই রেলিংয়ের উপরে পা দিয়া অনায়াসে পার হইয়া গেলেন। আমি ও বুনি মার পিছনেই ছিলাম। আমরা মনে করিলাম মা হয়ত নীচেই পড়িয়া গেলেন। কিন্তু তাকাইয়াই দেখি মা উঠিয়া গিয়াছেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইলাম।

২৩শে ফাল্গুন, বুধবার।

আজও আশ্রমে শিবরাত্রির উৎসব চলিল। আশ্রমে স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে অনেকেই প্রসাদ পাইলেন।

২৫শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

হরিবাবার আহ্বানে মা হোলি উপলক্ষে আজ সকালে দেরাদুন এক্সপ্রেসে ভিরাউটি চলিলেন। রাস্তায় ফয়জাবাদ ও লখনৌ ষ্টেশনে মার দর্শনের জন্য খুব ভীর হইল। রাত্রি ১২টায় আমরা বেরেলী পৌছিলাম। গাড়ী বদল করিয়া আমরা ট্রেনেই গিয়া শুইয়া রহিলাম। ভক্তেরাও সমস্ত রাত্রি ষ্টেশনেই বসিয়া রহিল।

হরিবাবার আহ্বানে ভিরাউটি গমন

২৬শে ফাল্গুন, শনিবার।

আজ ভোর ৬টায় গাড়ী ছাড়িল। বেলা প্রায় সাড়ে ৯টায় ধনারী ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল। সেখানে শ্রীহরিবাবার ব্যবস্থায় গরুর গাড়ী ও লোকজন সব তৈয়ার ছিল। ভিরাউটি গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতেই প্রথমে একদল গ্রামবাসী কীর্ত্তন করিতে করিতে মার সঙ্গে আসিয়া মিলিল। আর একটু দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম হরিবাবা স্বয়ং কীর্ত্তনের দল সঙ্গে লইয়া মার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মাও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মা চলিলেন। হরিবাবা মাকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া মাকে লইয়া কীর্ত্তন ঘরে বসাইল। শুনিলাম কতদিন যাবৎ হরিবাবার বিশেষ আগ্রহে গ্রামবাসী সকলেই মায়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ মা আসিয়াছেন। তাহাদের কতই না আনন্দ।

৩০শে ফাল্গুন, বুধবার।

ভিরাউটিতে নিত্য নিয়মিত ভাবে সৎসঙ্গ চলিতেছে। তবে মার বিশ্রামের দিকেও হরিবাবার বিশেষ দৃষ্টি আছে।

একদিনের কথা। সৎসঙ্গে হরিবাবা ও মা এবং আরও অনেকে বসিয়া আছেন। হরিবাবার ভক্ত মনোহর মার নিকট হাতজোড় করিয়া বলিতেছে যে মা যেন কৃপা করিয়া তাহার মনটা ঠিক করিয়া দেন। এই সময়টুকু হরিবাবা মার কথার জন্যই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু মা বিশেষ কিছুই বলেন না। হরিবাবা তাই মাকে একটু অনুযোগের স্বরে বলিলেন যে মা ত অন্য জায়গায় কত লোকের প্রশ্নে কত কথা বলেন কিন্তু এখানে আসিয়া একেবারে চুপচাপ থাকেন।

মা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন — "বাচ্চা নানা স্থানে কত কি বলে। কিন্তু পিতামাতার কাছে এসে চুপচাপ থাকে।"

আজ বিকালে মার কুটিয়াতে মার নিকট সুন্দরলাল পণ্ডিতজী এবং আরও অনেকে বসিয়া আছেন। মনোহর আসা মাত্রই মা হাসিয়া বলিলেন — "তুমি রোজ রোজ বল যে — মা কিছু বল, মা কিছু বল — এখন বলছি শোন। তুমি কেবলই বল — আমার দ্বারা কিছুই হবে না আমি কিছুই করতে পারি না। বেশত তোমার কিছুই করতে হবে না।"

মার কথা শুনিয়া মনোহর একটু বিচার করিয়া বলিতেছে তাহা অসম্ভব। তখন মা বলিলেন — "বেশ তবে যা বলি তাই কর।"

মনোহর একটু চুপ থাকিয়া বলিল তাহাও পারিবে না। তখন মা বলিলেন — "তবে যে কিছু দিবে না, কিছু পাওয়ার আশা নাই, তাঁহার শরণ নেও। তাঁহারই সেবা কর। আর যদি তাও না পার তবে এমন জায়গায়

মনটা লাগাও যাতে সুখ দুঃখের পারে যেতে পার। হরিপদে শরণ নেও।" এই সব কথার মধ্যে দিয়া মা দুইটি কথাই বলিলেন — এক ত শ্রীহরির শরণ নেও; দ্বিতীয় হরিবাবার অর্থাৎ গুরুদেবের পদে মন দেও।

সন্ধ্যাবেলাও সৎসঙ্গে আবার মাকে প্রশ্ন করিয়া কথা বলাইবার চেষ্টা করিতেছে। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন — **"এই শরীরটারত এক কথা — কাহারো সঙ্গে কথা বলি না, কাহারো কাছে যাই না, কাহারো খাই না।"**

সুন্দরলালজীও হাসিয়া বলিলেন — "মার ত এক ছাড়া দুই নাই। কাজেই এই ভাবেই আছেন।"

৪ঠা চৈত্র, রবিবার।

সীতারাম বাবা একজন আনন্দময় বৃদ্ধ মহাত্মা। প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি বিশেষ অসুস্থ। মার কুটিয়ার নিকটেই তাঁহার জন্য একটী কুটিয়া করা হইয়াছে। ক্যানসার রোগে তিনি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

(সীতারাম বাবা)

আজ বিকালে মা গিয়া সীতারাম বাবার কুটিয়ার পাশে এক গাছ তলায় বসিয়াছেন। শুনিতেছেন সীতারাম বাবা কুটিয়ার ভিতর যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। ইনি রামের উপাসক। মা অমনি রাম নাম আরম্ভ করিলেন—

"জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম।"

সীতারাম বাবা মাকে বাহিরে নাম করিতে শুনিয়া বাহিরে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। মা নামই করিয়া যাইতেছেন। বেলা শেষে হরিবাবাও আসিয়া সেখানে বসিলেন এবং মার সঙ্গে নাম করিতে লাগিলেন। কিছু পরে

মা সীতারাম বাবাকে বলিতেছেন — "কেবল নাম। তিনি বিপদ দিয়া বিপদ দূর করেন। এই শেষ কষ্ট মনে করা। আর ত কষ্ট হইবে না। শুধু সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকেই ডাকিয়া কাঁদিতে হয়।"

সীতারাম বাবাও অল্প হাসিয়া বলিতেছেন — "মা, ব্যারামের জন্য দুঃখ নাই। রোগের যন্ত্রণা অসহ্য। কিন্তু তাঁহার নাম যেন না ভুলিয়া যাই।"

দিল্লী হইতে হরিবাবার ভক্ত উকিল শ্রীবিপিন মিশ্র আসিয়াছেন। হরিবাবা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করেন। মার ঘরে তিনি বসিয়া আছেন। সাকার নিরাকারের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন — "সাকার মানে কি না স্বয়ং স্ব-ক্রিয়ারূপে যে আকারান্বিত সেই আকার। আকার মানে আ-কার। স্বয়ংই কার্য্যরূপে আকারেত আছে। আর নিরাকার মানে কার নাই অর্থাৎ কার্য্য নাই যেখানে। অতএব তার আকার নাই। আবার নীর মানে জল। যেখানে রাখ সেই আকারই ধারণ করে। নিজের কোনও আকার নাই। আবার বরফ কি? বরফে কি আছে? সেই জলই আছে। কাজেই আকার নিরাকার প্রভেদ কোথায় খুঁজিয়া নেও।"

আবার কি কথার উত্তরে বলিলেন — "সৎসঙ্গ কি? না, স্ব মানে সেই ভগবান, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আত্মস্বরূপ, যা বল। স্ব-এর সঙ্গ, স্ব-অঙ্গ অর্থাৎ স্ব-ই একমাত্র স্বয়ং কিনা। স্ব-অঙ্গ মানে সর্ব্ব অঙ্গই যে ভগবানের নিত্য প্রকাশিত। যে সঙ্গ করা হওয়ার জন্য। সেই জন্যই বলা স-অঙ্গ কর মানে সৎসঙ্গ কর। স্ব-অঙ্গ হওয়ার জন্য।"

ব্যাকুলতার কথায় মা বলিতেছেন — "ব্যাকুলতা এমন হওয়া চাই যেন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, বাহির হইতেই হইবে। আর থাকা যায় না।" বিপিনবাবু প্রশ্ন করিলেন — "মা আপনাকে কি করিয়া আনন্দ

দিতে পারা যায় ?” মা অমনি হাসিয়া বলিলেন — “তুমি নিজে আনন্দ পাইয়াছ ?” আবার বলিলেন — “আপনি কি কখনও নিরানন্দে আছেন ? আপনি মানে তিনি।”

কথা হইয়াছে মা আগামী ১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার আগ্রা রওনা হইবেন। আওয়াগড়ের রাজপরিবার এবং ভাদাওয়ারের রাজমাতা মাকে বহুদিন যাবৎ আগ্রায় নিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু যাওয়া আর হয় নাই। এবার কথা হইয়াছে।

১৬ই চৈত্র, শুক্রবার।

গতকাল সকালে ভিরাউটি হইতে রওনা হইয়া মাকে নিয়া আমরা দুপুর বেলা আগ্রা পৌছিয়াছি। আমরা আসিয়া ভাদাওয়ারের রাজবাড়ীতে উঠিলাম। তাঁবুতে মার থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আগ্রায় আগমন

আজ বিকালে স্থানীয় খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ সুশীল সরকারের বাড়ীতে মাকে নিয়া গেল। সেখানে কীর্ত্তনাদি হইল। অনেক বিশিষ্ট লোকও উপস্থিত ছিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন যে ভগবৎ নামে মন কি করিয়া লাগান যায়। মা বলিলেন — “এই যে মন লাগে না বুঝিতেছ এও ত কৃপা। মন না লাগিলেও ঔষধ খাইবার মত খাও। ফলও তাহাতে ভালই হয়। সারিয়াও যায়। কিন্তু সংসারী বিষয়ে যেমন কখনও সারে কখনও সারে না, এই বিষয়ে তাহা নয়। ভগবানের নামে ফল হইবেই। তাই বলা হয় একত হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া যাও। ডাক্তারের

ঔষধ খাও, নিয়মিত পথ্য খাও; রোগ আরোগ্য হইবে। অথবা ডাক্তারের ঔষধ আনিয়া বাসায় বসিয়া খাও; সঙ্গে সঙ্গে পথ্যাদিও নিয়মিত কর। অর্থাৎ হয় সব ছাড়িয়া তাঁহার নাম নিয়া পড়িয়া থাক; অথবা সংসারে থাকিয়াই গুরুর উপদেশ মত নাম নেও, নিয়মিত ভাবে থাক। তাহাতেও রোগ আরোগ্য হইবার আশা। ইঞ্জেক্সন লইতে কি আর ভাল লাগে? কিন্তু উপকার ত হয়। ছোটকালে পড়িতে কি ভাল লাগে? কিন্তু পিতামাতা ও মাষ্টারের সামনে নিয়মিত পড়িয়া সে ত বিদ্বান হইয়া যায়। এটা যেমন অর্থকরী বিদ্যা। আবার ঐদিকে ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিতে পারিলে পরম ধনের আশা। পরম ধন কি? না, ভগবান স্বয়ং। ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে আর দুঃখ নাই। তাঁর জন্য যে বিরহ তাহাও সুখই। তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলে ত তবে তাঁহার জন্য বিরহ হইবে। বিরহ মানে কি? না, বি-রহ; অর্থাৎ বিশেষ ভাবে থাক। মানে ভগবান যাঁহার মধ্যে বিশেষ ভাবে রহেন তাঁহারই বিরহ হইতে পারে।"

এই বলিয়া মা হাসিতেছেন — "তোমরাই পিতামাতা, তোমরাইত এই মেয়েটাকে লেখাপড়া কিছুই শিখাও নাই। তাই ত উল্টা পাল্টা যাহা আসে তাহাই বলিয়া যায়। পিতামাতার নিকট বলিতেত কোনও বাধাই নাই। আর দেখ এই শরীরটার ত কোনও পুটুলি থাকে না, যেমন এই কথার জবাব দিতে হইবে। সে সব কিছুই নাই। তোমরা যেমন বাজাও তেমনই শোন। এখানে কোনও গোলমালই নাই। আবার বলা হয় কখনও কখনও সময় কি, না, স্ব-ময় অর্থাৎ তিনি-ময়। সেদিন দিল্লীতে বিরলাজী এই শরীরটাকে

গান্ধীজীর যেখানে দেহত্যাগ হয় সেখানে নিয়া গিয়াছিল। সব দেখাইল, এইদিক দিয়া এখানে এই ভাবে আসিতেছিলেন। আরও একবার এইখানে মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু পারে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু বলিল। তখন বলা হইল, দেখ বাবা, এই যাহারা গান্ধীজীকে মারিবার চেষ্টা করিতেছিল মারিতে পারিয়া তাহাদের অবশ্যই খুব আনন্দ হইল। আবার যাহারা মিত্র তাহাদের এই ঘটনায় কত দুঃখ হইল। একই ঘটনায় শত্রুর আনন্দ, মিত্রের দুঃখ। তবেই দেখ সুখ দুঃখটা সবই মনের।"

একজন প্রশ্ন করিলেন যে ভগবানই ত সব করিতেছেন তবে আমাদের আর করিবার কি আছে।

মা বলিয়া উঠিলেন — "এই যে জিজ্ঞাসা ইহার মূলেত সংশয়। যদি তোমার স্থির বিশ্বাস থাকিত যে ভগবানই সব করিতেছেন তবে আর জিজ্ঞাসা আসিত না। জিজ্ঞাসা যখন আসিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে স্থির বিশ্বাস নাই। সেইজন্য কাজ করা দরকার।"

আজ রাত্রিতেই আমরা আওয়াগড়ের রাজবাড়ীতে গেলাম। আওয়াগড়ের রাজার ভাই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপাল সিং সস্ত্রীক মার বিশেষ পরিচিত। তাঁহারাই আগ্রহ করিয়া মাকে লইয়া গেলেন।

১৮ই চৈত্র, রবিবার।

এখানেও মার দর্শনের জন্য খুব ভীর হইতেছে। মার জন্য ব্যবস্থাও বেশ ভালই করিয়াছেন। আগামী কাল আমাদের বৃন্দাবন রওনা হইবার কথা হইয়াছে। স্থানীয় সকলেই আপত্তি করিতেছেন। দিন দিনই লোকের ভীর

বাড়িতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে প্রোগ্রাম স্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া মার থাকা হইল না।

১৯শে চৈত্র, সোমবার।

আজ সকালে মোটরে মা বৃন্দাবন রওনা হইলেন। ভাদাওয়ারের রাজমাতা আমাদের সঙ্গেই আসিলেন। বেলা প্রায় ১২টায় আমরা বৃন্দাবনে অখণ্ডানন্দজীর আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম। মার জন্য পৃথক সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বৃন্দাবনে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর আশ্রমে

২৩শে চৈত্র, শুক্রবার।

হঠাৎ শুনিলাম আজ রাত্রি তিনটায় হরিবাবা দিল্লী রওনা হইবেন। সেখান হইতে হোসিয়ারপুর যাইবার কথা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন—"তবে আর আমরাই বা এখানে থাকি কেন? বাবার আগ্রহেই ত এখানে আসা।"

মার কথা শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া লইলাম। দিল্লী হইতে নারায়ণ দাসজী গাড়ী করিয়া মার দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। সেই গাড়ীটিত আছেই। ভাদাওয়ারের রাজমাতাও মার জন্য তাঁহার গাড়ী দিলেন। কথা হইল মাও হরিবাবার সঙ্গে একত্রে দিল্লী রওনা হইয়া যাইবেন। অন্য সকলে মথুরায় গিয়া ট্রেন ধরিবে।

২৪শে চৈত্র, শনিবার।

দিল্লী হইয়া দেরাদুন গমন

আমরা ভোর বেলাই ডাঃ জে, কে, সেনের বাড়ীতে গিয়া পৌছিলাম। এইরূপ অপত্যাশিত ভাবে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ। সারাটি দিন থাকিয়া রাত্রের গাড়ীতে আমরা দেরাদুন রওনা হইলাম।

২৬শে চৈত্র, সোমবার।

আনন্দকাশীতে মা

গতকাল আমরা কিশনপুর আসিয়াছি। যোগীভাই (সোলনের রাজা সাহেব) সন্ধ্যাবেলা আসিয়াছেন। আজ খাওয়া দাওয়ার পর বেলা দুইটা নাগাদ মাকে লইয়া আমরা বশিষ্ঠ গুহা রওনা হইলাম। যোগীভাইর মোটরত আছেই, তাহা ছাড়া টিহরীর রাজমাতাও দুইখানা গাড়ী পাঠাইয়াছেন।

প্রায় আড়াই ঘণ্টায় আমরা হৃষিকেশ পৌছিয়া আরও ১৪ মাইল উপরে বশিষ্ঠ গুহায় আসিয়া পৌছিলাম। আমাদের সঙ্গে এবার লোকজন খুবই কম। পরমানন্দ স্বামী, শৈলেশ ব্রহ্মচারী, তিনটি মেয়ে ও আমি।

স্থানটি অতি চমৎকার ও একান্ত। একেবারে গঙ্গার উপরে। চতুর্দ্দিকের অপূর্ব্ব শোভা আমাদের মুগ্ধ করিয়া দিল। রাজমাতা গঙ্গার পাড়ে একান্ত বাসের ইচ্ছায় একটি বাড়ী বানাইয়াছেন। চারিদিকে ফুলের বাগানও করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি মার জন্য একটি ফুলের কুটিয়া বানান হইয়াছে। মাকে আনিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে এই ২।৩ মাস যাবৎ চিঠি দিতেছিলেন। আজ মাকে পাইয়া তাঁহার কি আনন্দ। এখানে মার প্রায় ১৫ দিন থাকার কথা।

২৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

মা এখানে বেশ ভালই আছেন। আমরা যেদিন আসিয়াছি সেইদিনই রাজমাতা একটি স্থান দেখাইলেন যেখানে ভগ্ন অবস্থায় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটি শিবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। রাজমাতা বলিলেন যে ঐখানেই প্রথমে বাড়ী করিবার জন্য জায়গা খোঁড়া হইতেছিল কিন্তু ঐসব মূর্ত্তি বাহির হওয়াতে ঐ স্থানটি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মার কথায় ঐ স্থানটি আবার খোঁড়া হইয়াছে। ইহার ফলে দুইটি গৌরী পীঠ পাওয়া গিয়াছে। আরও খুঁড়িতে আরম্ভ করিলে চারিদিকে মন্দিরের ভগ্নাবশেষও দেখিতে পাওয়া গেল। দুই রকমের দুইটি বৃক্ষ একই সঙ্গে এই স্থানটির উপর ছায়া দিতেছিল। মার কথামত ঐস্থানে একটি ছোট মন্দির করিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপনার কথা হইয়াছে। পরমানন্দ স্বামীজীই কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি ও অন্যান্য পাথর গঙ্গায় বিসর্জ্জন না দিয়া ঐখানেই রাখা স্থির হইল। যুগল বৃক্ষ দুইটিকে কাটা হইবে কিনা কথা হইল। মা ত স্পষ্ট করিয়া সব সময় বলেন না। পরদিনই এখানকার মালী আসিয়া বলিল যে সে স্বপ্নে দেখিয়াছে যে কেহ বলিতেছে যে গাছ দুইটি যেন কাটা না হয়। কিন্তু যোগীভাই, রাজমাতা ও পরমানন্দ স্বামীজী সকলেই বলিলেন যে পাহাড়ীদের এইরূপ স্বপ্নের কোনও মূল্য নাই। আমার কিন্তু যেন মনে হইল মালীর কথাটিতে মার অনুমোদনই ছিল। কিন্তু মা একথা নিজেও কাহাকেও বলিলেন না বা আমাকেও কিছু বলিতে দিলেন না।

৩০শে চৈত্র, শুক্রবার।

গতকাল হইতেই গাছকাটা সুরু হইয়াছে। মা বলিয়াছেন যে দুইটি

গাছেরই দুই টুকরা কাঠ যেন পরমানন্দ স্বামী নিজে গিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া আসে। আজকে মা আবার বলিলেন — "পরমানন্দ আজই যেন দিয়া আসে।" রাজমাতা সম্মুখেই ছিলেন। তিনি বলিলেন যে আবারত ভাসাইয়া কিনারেই ফেলিয়া যাইবে। মা শুনিয়া বলিলেন — "যাই হোক, তবু ভাসিয়েত দাও।" তাহাই হইল। পরমানন্দ স্বামী গিয়া ভাসাইয়া দিয়া আসিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে একটি টুকরাও পারের দিকে আসিল না।

বৃক্ষরূপী আত্মার মুক্তিলাভ

বিকালে মা আমাকে বলিতেছেন — "ওদের (বৃক্ষদের) বললাম যাক তোমাদের ত গঙ্গাতেই প্রবাহ করা হল। মুক্তির আর বাকী কি রইল? আর কতদিন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করবে?"

আমি বলিয়া উঠিলাম — "তবে ত গাছদুটি বিশেষ কিছু ছিল।"

মা বলিলেন — "বা। এতদিন শিবকে ছায়া দিল। বিশেষ নয়?" মার স্বভাবের সুন্দর দিক হইতেছে এইটি যে কোনটাতেই তাঁহার বিশেষ বলিবার বা করিবার কিছুই যেন নাই। যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। সবই ঠিক। এই হইল মার ভাবধারা। ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া মার কিছুই নাই।

১লা বৈশাখ, রবিবার। ১৩৫৮ সন।

আজ ৺বাসন্তী দেবীর নবমী পূজা। মন্দিরে আজই দুইটি শিব স্থাপনা হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী শৈলেশের হাত দিয়া স্থাপনা করা হইল। মাও একটু স্পর্শ করিলেন। আমি ও শৈলেশ দুইজনেই পূজা করিলাম। কোথায় কি জন্য কি হইয়া যাইতেছে তাহা একমাত্র মাই বলিতে পারেন।

৪ঠা বৈশাখ, বুধবার।

আজ মাকে নিকটবর্ত্তী বশিষ্ঠ গুহায় নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে পুরুষোত্তমানন্দ স্বামী বলিয়া একজন সন্ন্যাসী থাকেন। বিরাট গুহা। শুনিলাম পূর্ব্বে এই গুহাটি প্রায় তুই মাইল ব্যাপী ছিল। ঐ স্বামীজী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গুহাটিও বেশ দরজা ইত্যাদি দিয়া বাসোপযোগী করিয়া নিয়াছেন। গুহাতে একটি শিবও স্থাপিত আছে দেখিলাম। তপস্যার উপযুক্ত স্থানই বটে। স্বামীজীকে বেশ মনে হইল। মা আসিবেন শুনিয়া আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন। ফল এবং তুধ ইত্যাদিও সকলের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে।

স্বামীজী মাকে একটু গান করিতে বলিলে মা একটু সময় "হে ভগবান, হে ভগবান" করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পথ ভাল না। তাই টিহরীর মহারাজা মাকে উঠিতে অনুরোধ করিতেই স্বামীজী একটু হাসিয়া বলিলেন — "মা এখনই চলিয়া যাইবেন?" মা ও হাসিয়া জবাব দিলেন — **"আমি ত আসিও না, যাইবও না। কাজেই যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নাই।"** বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে মাকে সঙ্গে লইয়া অনেকটা দূর আসিলেন। সঙ্গীয় লোকদের কাছে তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম — "মা যেন আমাকে পাগল করিয়া দিয়া গেলেন।"

১০ই বৈশাখ, মঙ্গলবার।

কাশী হইতে ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় স্ত্রী ও কন্যা সহ ২।৩

দিনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। গতকাল তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। আজই আমাদের রওনা হইবার কথা।

মা এখানে একদিন স্বপ্নে দেখিতেছেন যে একটি খুব সুন্দর পুরুষ আসিয়া মার কাছে দাঁড়াইয়াছে। এমন কি একেবারে যেন মার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইতে চায়। মা তাহার মতলব বুঝিয়া একটু বাঁকা ভাবে টান হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিতেই লোকটি মাথা নামাইয়া পায়ের দিকে চাহিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেল। মাকে সে প্রণাম করিল। মা তাহার পিঠে একটু হাত দিতেই সে যেন এক দিব্য ভাবে ভাবিত হইয়া গেল।

স্বপ্নে জনৈক ব্যক্তির ভাব পরিবর্ত্তন

ইহার মধ্যে আরও একটি ঘটনা আছে। মা সকালে শুইয়া শুইয়া যখন এইরূপ দেখিতেছিলেন তখন ঠিক সেই সময়েতে আমি স্নান করিতে গিয়াছি। আমার হঠাৎ কেন জানি মনে হইল আচ্ছা চণ্ডীতে অসুরদের দেবীর প্রতি ঐরূপ কাম ভাব কেন হইল? নাও ত হইতে পারিত। দেবী ভগবতী, তাঁহার দর্শনেও কেন এই ভাব জাগিল। আবার তখনই মনে হইয়াছে অসুর বিনাশত। অসুর ভাবত থাকিবেই।

পরে দেখা গেল একই সময়ে দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে। মা হাসিয়া বলিলেন — "তোর ভাবেতেই মূর্ত্তিটা দেখা আর কি?"

আর একদিনের ঘটনা। মা কুটিয়ার মধ্যে চৌকীতে যেখানটায় বসেন তার ঠিক পিছনেই একটি হাসনাহানার বড় গাছ আছে। সেই দিকেই কিছু দূরে গঙ্গা প্রবাহিতা। মা একদিন ঐখানে বসিয়া দেখিতেছেন যে বর্ত্তমান টিহরীর মহারাজার শিশুপুত্রটি ঐ হাসনা-হানা গাছের দিকে চাহিয়া কিছু একটা বলিয়া চমকাইয়া উঠিল। পরিচিত লোক দেখিয়া যেন চমকাইয়া উঠিয়া ঐরূপ বলিতেছে।

টিহরীর মৃত মহারাজাকে দর্শন

মাও ফিরিয়া দেখিলেন পাগড়ী মাথায় দেওয়া মৃত মহারাজা দাঁড়াইয়া আছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। রাজমাতাকেও মা ঐকথা বলিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে স্বর্গীয় মহারাজার ভগ্নি কন্যা মহারাণী গিরিজা দেবী এখানে আসিলেন। তাঁহার নাকি পরলোকগত আত্মাদের খুব দর্শন হয়। ইনি এখানে আসিয়াই একদিন সন্ধ্যায় ঐ গাছের নিকট দিয়া যাইতেছেন। তাঁহার মনে হইল তাঁহার কাপড় ধরিয়া কেহ আকর্ষণ করিতেছেন। রাত্রে তিনি আবার স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার মৃত মামা (বৃদ্ধ মহারাজা) ঐ গাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি উত্তর দিলেন যে মা যখন হইতে আসিয়াছেন তখন হইতেই তিনি ঐখানে আছেন।

আর একদিন মার ঘরে কীর্ত্তন হইতেছে। সন্ধ্যার পরে আরও অনেকে বসিয়া আছেন। তিনি হঠাৎ দেখিলেন যে তাঁহার মৃত মামা সেই গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। গিরিজা দেবী রাজমাতাকে তাড়াতাড়ি বলিলেন মার পিছনের জানলার পরদাটি একটু সরাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু জানলা দিয়া ঠাণ্ডা আসে বলিয়া রাজমাতা তাহা সরাইতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন।

সেইদিনই রাত্রে গিরিজা দেবী স্বপ্নে দেখিতেছেন যে বৃদ্ধ মহারাজা মুখটি গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন— "তোমরা কাপড়টা সরাইয়া দিলে না। আমি দেখিতে পাইলাম না।' এইরূপ অনেক বিস্ময়কর ঘটনার কথা প্রকাশ পাইল।

এই স্থানের একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে গঙ্গা উত্তর বাহিনী। তাই রাজমাতা ও যোগীভাই এই স্থানটির নাম দিলেন "আনন্দকাশী"। যে শিব স্থাপন করা হইল তাঁহার নাম রাখা হইল "আনন্দেশ্বর"।

রাজমাতার নিকট হইতে শুনিলাম যে এই রাজ পরিবার হইতে মহারাণী, পুত্রবধূ বা কন্যারা তিল হইতে তেল বাহির করিয়া বদ্রীনাথজীর মন্দিরের জন্য প্রতি বৎসর পাঠাইয়া থাকেন। বাদ্যভাণ্ড সহকারে একটি রূপার কলসী প্রতি বৎসর রাজবাড়ীতে আনা হয়। একটি বিশেষ স্থানে ঐ কলসীটি রাখিয়া পূজা ও ভোগ দেওয়া হয়। সধবা মেয়েরা না খাইয়া তেল বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তাহা দিয়া কলসীটি ভরিয়া দেওয়া হয়। যদি একবারের তেলে কলসীটি না ভরে তবে অমঙ্গল বলিয়া মনে করেন। পরে ঐ পূর্ণ কলসীটি আবার বাদ্যভাণ্ড সহকারে বদ্রীনাথে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ তেল মাখিয়াই প্রত্যহ বদ্রীনাথের স্নান হয়।

রাজমাতা বিশেষ আগ্রহ সহকারে মার জন্য এক শিশি তেল ঐভাবে বানাইয়া দিলেন। উহা হইতে মাকে একটু রান্নাও করিয়া দিতে বলিলেন। বাকী তেলে একটু কেশর ও কর্পূর মিশাইয়া জাল দিয়া দিলেন। উহা দিয়া কাশীতে আশ্রমের শিবলিঙ্গদের ও নারায়ণ শিলাকে স্নান করাইবার জন্য মা পাঠাইয়া দিলেন।

আজ আমাদের যাওয়ার দিন। রাজমাতা আসিয়া সকাল বেলা মার নিকটে বসিয়াছেন। যাওয়ার কথায় তিনি খুব কাঁদিতে লাগিলেন। ইনি যেমন বুদ্ধিমতি তেমনই সহন শক্তি সম্পন্না। মার প্রতি ইহার আকর্ষণও খুব। বিধবা হওয়ার পরে শোকে কি রকম হইয়া গিয়াছিলেন। এখন যেন অনেকটা শান্তি পাইয়াছেন। কিন্তু আজ যেন মার জন্য খুবই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। মার নিকট রাজমাতা, বর্ত্তমান মহারাণী, ভাগ্নী সাবিত্রী ও গিরিজা দেবী, সাবিত্রীর মেয়ে বীণাকুমারী আরও অনেকে বসিয়া আছেন। সকলেই প্রায় কাঁদিতেছেন। যোগীভাইও এই দৃশ্য দেখিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সকলের ব্যথার এই তীব্র প্রকাশে আমাদেরও অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল।

রাজমাতা কথায় কথায় বলিতেছিলেন যে মার আসিবার প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে এখানে আসিয়া দেখেন চারদিকে ভয়ানক জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। লোকজন এখানে সুবিধা মত পাওয়া যায় না। অগত্যা রাজমাতা স্বয়ং ভাগীকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গল পরিষ্কারে লাগিয়া যান। অদ্ভুত তাঁহাদের মার জন্য ভক্তি ও প্রেম।

খাওয়া দাওয়ার পরে বিকালে মাকে লইয়া যোগীভাই মোটরে রওনা হইলেন। হরিদ্বারে যোগীভাইর ধর্ম্মশালায় আসিলাম। মন্দিরের চারদিকে অনেক কাজ চলিতেছে দেখিলাম। মার জন্যও পৃথক একটি বাড়ীর ব্যবস্থা হইতেছে।

১১ই বৈশাখ, বুধবার।

হরিদ্বার, দেরাদুন হইয়া হোসিয়ারপুরের পথে

হরিদ্বার হইতে আজ বিকালে মা মোটরে কিশনপুর আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। আগামী কাল বিকালেই আমাদের হোসিয়ারপুর যাইবার কথা। সেখান হইতে মার কাছে পুনঃপুনঃ চিঠি আসিতেছিল। সকলে মার প্রতীক্ষা করিতেছে।

১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার।

আজ খুব ভোরে জলন্ধর ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিতেই সাধু সিংজীর ছেলেরা সকলে মিলিয়া মাকে সাবিত্রী দেবী আশ্রমে লইয়া গেলেন। হরিবাবা হোসিয়ারপুর হইতে দুইখানা মোটর পাঠাইয়া দিয়াছেন দেখিলাম। মা আশ্রমে একটু বিশ্রাম করিয়া আবার মোটরে হোসিয়ারপুর রওনা হইয়া গেলেন।

হোসিয়ারপুরে হরিবাবার গুরুদেবের আশ্রমে পৌছিয়া দেখিলাম ব্যাণ্ডপার্টি ও কীর্ত্তন সহ হরিবাবা মার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। গুরুদেবের সমাধি স্থানের সম্মুখে সামিয়ানা লাগান হইয়াছে। আশ্রমের আশেপাশেও অনেক বাড়ী সাজাইয়াছে। গাড়ী যেদিক দিয়া আসিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে দেখিলাম। মার থাকিবার জন্য নূতন একটি বাড়ী খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে। সকলের সুবিধার জন্যও যথাসাধ্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন দেখিলাম।

আজ কি কথা প্রসঙ্গে টিহরীর রাজমাতার বিষয় উঠিয়াছিল। একদিন তিনি মাকে বলিতেছিলেন যে ধ্যানে বসিলেই তাঁহার মনে হয় যে তাঁহার স্বামী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিয়াছেন। এমন কি এক একদিন যেন স্পর্শও পান। মা শুনিয়া বলিলেন — "দেখ পতিভাব রাখিয়া ধ্যান নষ্ট করিয়া ঐদিকে মন দিলে মোহই বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে কষ্ট ছাড়া আর কিছু নাই। ঐ অবস্থায় কেবলই মনে করিবে — হে প্রিয়, হে ভগবান তুমি এই রূপেই আমার কাছে আসিয়াছ। কারণ তোমার এই রূপ যে আমার কাছে প্রিয় ছিল তাই তুমি আমাকে তোমারই দিকে টানিবার জন্য এই রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছ। এইভাবে তাঁহারই ধ্যানে আরও মনটা লাগাইতে চেষ্টা করিবে। **মোহটাকে মহান ভাবের মধ্যে নিয়া যাওয়া। তাঁহার দিকই দিক। অন্য কোনও দিকেই আর শান্তি নাই।"**

১৮ই বৈশাখ, বুধবার।

মা হোসিয়ারপুরেই আছেন। এবার মার শুভ জন্মোৎসব পাঞ্জাবেই হইবার কথা। কথা হইয়াছে প্রথম কয়েকদিন এখানে থাকিয়া পাঁচদিন জলন্ধরে, তিনদিন দোরাহা এবং সাতদিন আম্বালাতেই উৎসব চলিবে। তিথি পূজা

আম্বালাতেই হইবে। হরিবাবা ও অবধূতজীই উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা এবার করিতেছেন।

মাকে এখানে মোটরে এক এক দিন এক এক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। একদিন এখানকার শ্মশানেও মাকে লইয়া যাওয়া হইল। এইরূপ সুন্দর সাজান স্থান পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। স্বামী অখণ্ডানন্দজী, রামদাস বাবাজী প্রভৃতি আরও অনেকেই আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিলেন যে এরূপ কখনও দেখেন নাই। বিরাট জমি লইয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই স্থানটি নানা ভাবে সাজাইয়াছেন। দাহ করিবার স্থানেও দেওয়ালে টানান বড় বড় ছবি। কোথাও ছবিতে দেখা যাইতেছে রাজা হরিশ্চন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন, কোথাও বাল্মিকী মুনি রামায়ণ লিখিতেছেন, কোথাও আরও নানা পৌরাণিক সব দৃশ্য। শবদেহ রাখিবার, সঙ্গীদের থাকিবার, শিশুদের মৃতদেহ পুতিবার, শবদেহ স্নান করাইবার, সৎকার করিবার, সকলের স্নান করিবার পৃথক পৃথক সব ব্যবস্থা। প্রকাণ্ড ফুলের বাগান ভিতরে। যেন কোনও বড় লোকের সাজান বাড়ী।

হোসিয়ারপুরের শ্মশান দর্শনে

১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

আজ মার শুভ জন্মোৎসব আরম্ভ হইল। ভোর রাত্রিতে হরিবাবা প্রভৃতি সকলে আসিয়া কীর্ত্তন ও স্তুতিপাঠ ইত্যাদি করিলেন।

পাঞ্জাবের নানা স্থানে শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব

সৎসঙ্গও এখানে বেশ চলিতেছে। স্থানীয় লোকেরা খুবই সৎসঙ্গ প্রেমী ও সাধুভক্ত দেখিলাম। সাধুদের থাকিবার ও খাইবার এখানে কোনও অসুবিধা নাই দেখিলাম। বহু সাধু মহাত্মা এখানে বাস করেন। মার জন্যও ভক্তেরা আসিয়া জোর করিয়া আটা, ঘি, তরকারী সব দিয়া যাইতেছে। দুধত প্রত্যেকেই প্রায় হাতে করিয়া কিছু না কিছু লইয়া আসিতেছে। এরূপ অপর্য্যাপ্ত দুধ সাধারণতঃ কোথাও দেখা যায় না। সৎসঙ্গেও এমন ভীর হয় যে বলা যায় না। কিন্তু এত লোকের ভিতরেও গোলমাল খুবই কম। সৎসঙ্গের প্রভাব খুব আছে দেখিলাম।

একদিন সৎসঙ্গে মাকে একজন প্রশ্ন করিলেন যে সবই যদি তাঁহার ইচ্ছায় হয় তবে রোগও তাঁহার ইচ্ছাতেই হইতেছে। যদি তাহাই হয় তবে ত রোগ দূর করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত না।

মা অমনি বলিলেন — **"এই যে ঔষধ দিবার জন্য তোমার চেষ্টা ইহাও ত তাঁহারই ইচ্ছায় হইতেছে। আবার এক তিনিই যে সব। তুমিই রোগ রূপে, ঔষধরূপে, চিকিৎসারূপে, সবরূপেই যে তুমি।"**

২৫শে বৈশাখ, বুধবার।

আজ খুব ভোরে আমরা জলন্ধরে আসিয়া পৌছিলাম। সাবিত্রী দেবী আশ্রমে সাধু সিং ও তাঁহার ছেলেরা সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সঙ্গীয় সকলের জন্য পাশের অনেক বাড়ীতে ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে সৎসঙ্গের স্থান ঠিক করা হইয়াছে। বহু ভক্ত এখানে আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। হোসিয়ারপুর হইতেও অনেকেই আসিলেন।

জলন্ধরে সাত দিন উৎসব

এসব দিকেও দেখা যাইতেছে লোকের ভীর প্রায় কলিকাতারই অনুরূপ। স্রোতের মত লোক মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। মাকে পাঁচ মিনিটের জন্যও কেহ ছাড়িতে চায় না। মার সঙ্গে ২।১ মিনিট কথা বলিবার জন্য কত লোক দাঁড়াইয়া আছে। তবে সকলেই প্রায় সাধন ভজনের কথা লইয়াই মার নিকট আসিতেছে। এখানকার লোকদের মধ্যেও বেশ ধর্ম্মভাব দেখা যায়।

৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার।

অবধূতজীর ব্যবস্থা অনুযায়ী আজ ভোরে মাকে লইয়া আমরা দোরাহা পৌছিলাম। দোরাহা এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। স্থানটি বেশ একান্ত। আমাদের সঙ্গে হরিবাবা, কৃষ্ণানন্দজী প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই আসিয়াছেন। খান্নার মহারাজ ত্রিবেণী-পুরীজীও আসিয়াছেন। অবধূতজী অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি যেমন ত্যাগী তেমনই মহাকর্ম্মী। এইরূপটি সাধারণতঃ দেখা যায় না।

দোরাহাতে তিনদিন

৩রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

দোরাহাতে তিনদিন থাকিয়া আমরা আজ ভোরে আম্বালা রওনা হইলাম। আম্বালাও এখান হইতে প্রায় ৫২ মাইল। মোটরে দুই ঘণ্টার পথ। আম্বালাতেও অবধূতজীরই ব্যবস্থা। স্থানীয় সনাতন ধর্ম্ম সভায় মার থাকিবার ও সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গেটের কাছে মোটর আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। কীর্ত্তনও চলিতেছে। অসংখ্য মালার বোঝায় মার যেন মুখ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া গেল। লোকের ভীর বোধহয় এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নানাস্থান হইতে ভক্তেরা মার উৎসব উপলক্ষে আসিয়া একত্রিত

হইয়াছেন। সুদূর কলিকাতা, বিহার হইতেও কেহ কেহ আসিয়াছেন দেখিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

আজ মার শুভ জন্মতিথি। সনাতন ধর্ম্মসভায় রাধাকৃষ্ণের ও শিবের মন্দির আছে। জন্মতিথি উপলক্ষে আজ মন্দিরে বিশেষ ভোগ দেওয়া হইল।

আম্বালাতে তিথিপূজা

১০৮ জন কুমারী ও বালগোপালদের ভোজন ও রুমাল বিতরণ হইল। মা গিয়া তাহাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া গেলেন। নিজেরা খাইতে খাইতে তাহারা সেই হাতেই মাকেও খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। মা খুব হাসিতেছেন। মার এই লীলা দেখিয়া সকলেই অবাক হইল।

এখানে কুষ্ঠ রোগীদের একটি থাকিবার স্থান আছে। উৎসব উপলক্ষে একদিন তাহাদেরও খাওয়ান হইল। অবধূতজী মাকেও সেখানে নিয়া গেলেন।

কুষ্ঠরোগীদের স্পর্শ দান

মার আদেশে আমি তাহাদেরও আরতি করিয়া প্রণাম করিলাম। মা বলিলেন —"সব রূপেইত তিনি।" তাহার পর মা তাহাদের মধ্যে দুইজনকে স্পর্শ করিয়া বিদায় লইলেন। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত রোগীদের মা স্পর্শ করিলেন দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। কিন্তু মার প্রতিটি কাজের পিছনে কি রহস্য লুকান আছে তাহা কে বলিবে?

আজ সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের পর শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে সৎসঙ্গে বসিয়া অনেকেই মার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন। খান্না মহারাজ বেশ গম্ভীর ভাবে বলিলেন শুনিলাম — "আমিত মাকে অবতার বলি না। সাক্ষাৎ দুর্গা বলিয়া মনে করি। অবতার বলিলে ঠিক ঠিক বলা হয়না।"

অবধূতজী বলিলেন যে শক্তি ছাড়া জগতে শিব নাই। জীবের শিবত্ব প্রাপ্ত করিতে হইলে শক্তির আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন যে তিনি বহু ঘটনায় মার ঐশ্বর্য্যের ও দিব্য শক্তির প্রমাণ পাইয়াছেন। সর্ব্বজীবে তদ্‌বুদ্ধি ব্যতীত মার পক্ষে ঐরূপ ভাবে কুষ্ঠ রোগীদের স্পর্শ করা কি কখনও সম্ভব? সাধারণতঃ ঐরূপ রোগীদের স্পর্শ করাত দূরের কথা লোকে তাহাদের নিকটও যাইতে ভয় করে।

এবার শেষরাত্রিতে কৃষ্ণা চতুর্থী থাকিবে না বলিয়া রাত্রি দেড়টাতেই পূজা আরম্ভ করা হইল। বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহাত্মারা সকলেই আসিয়া বসিলেন। মার আসন ও উৎসব প্রাঙ্গন সাজাইবার জন্য কত ফুলের ব্যবস্থা হইয়াছে। দিল্লী হইতে পর্য্যন্ত ফুল আসিয়াছে। নানারকম ফল ও মিষ্টি দিয়া মার ভোগ দেওয়া হইল। কুসুম ব্রহ্মচারী মার পূজা করিল। শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় ঠিক সময়ে গিয়া মাকে উঠাইয়া নিয়া আসিলেন উৎসব মণ্ডপে। পূজা সমাপ্ত হইতে প্রায় ভোর হইয়া গেল। হরিবাবার কীর্ত্তন ঐখানেই হইল।

এবারকার উৎসব আশাতীত ভাবে সম্পন্ন হইল। এত সুন্দর ভাবে সহস্র সহস্র লোকের সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে তাহা সত্যই আশ্চর্য্য। পাঞ্জাবের ইহা গৌরবের বিষয়। সবদিকেই অবধূতজীর অদ্ভূত কর্ম্মনিপুণতা, অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি ও অভিজ্ঞতা। একজন সন্ন্যাসী যে কি ভাবে এত বিরাট আয়োজন করিতে পারেন তাহা এবার প্রত্যক্ষ ভাবে সকলে প্রমাণ পাইলেন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ খাওয়া দাওয়ার পর বিকালে আমাদের অমৃতসর রওনা হইবার

কথা। সৎসঙ্গ শেষ হওয়া মাত্রই এমন একটা অস্বাভাবিক ভীর হইল যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। খান্না মহারাজ ও অবধূতজী সোলনের রাজা সাহেবের সহিত সোলন যাইতেছেন। মা খান্না মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন। কিন্তু নিয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কথা ছিল মা আরও একটু পরে রওনা হইবেন কিন্তু অসম্ভব ভীরের জন্য তখনই মাকে মোটরে একটু সরাইয়া নিয়া যাওয়া হইল। ইত্যবসরে হরিবাবাও প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। আমরাও তখনই অমৃতসর রওনা হইলাম।

অমৃতসর গমন

প্রায় দুই ঘণ্টায় আমরা অমৃতসর পৌছিলাম। পাঞ্জাবী ভক্ত পান্নালাল খান্না মার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। এসব দিকে একটি বেশ সুন্দর জিনিষ দেখা যাইতেছে যে যেখানেই হউক সৎসঙ্গের নাম শুনিলেই জনসাধারণে মিলিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

আজ ভোরে আমরা গুরদাসপুর রওনা হইলাম। সেখান হইতেও মাকে লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন আসিতেছিল। গুরদাসপুর অমৃতসর হইতে পাঠানকোটের পথে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে। মার জন্য এখানেও বেশ সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে দেখিলাম;

মণ্ডি রাজ্যে গমন

মার মণ্ডি যাওয়ার কথা হইয়াছে। মণ্ডির রাজাসাহেব স্বয়ং সাতখানা গাড়ী নিয়া এখানে আসিয়াছেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

আজ পাঁচটায় রাজা সাহেব মাকে সঙ্গে লইয়া রওনা হইলেন। দুপুরে কাংড়া হইয়া বৈজনাথ গিয়া রাত্রিটা থাকার কথা হইল। হরিবাবার সঙ্গীয় লোকেরা কাংড়া হইতে জ্বালামুখী দেখিবার জন্য রওনা হইয়া গেল। আমরা মাকে লইয়া সোজা বৈজনাথ চলিয়া আসিলাম। মা এখানে পূর্ব্বে আরও কয়েকবার আসিয়াছেন। তারামন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ও তারানন্দ স্বামীজী মাকে সেই মন্দিরে আনাইয়া ছিলেন। এবার আসিয়া দেখি স্কুল পাঠশালা ইত্যাদি অনেক কিছু হইয়াছে। কাশ্মীরের মহারাণীর ভ্রাতা এখানে মার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজ বাড়ীতে মাকে নিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় মণ্ডির রাজাসাহেব মাকে লইয়া গেলেন। রাণী সাহেব সকলের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

সকালে ভয়ানক বৃষ্টি হওয়াতে রওনা হইতে একটু দেরী হইয়া গেল। প্রায় তিনটার সময় রওনা হইলাম। রাজা সাহেব নিজেই মোটর চালাইতেছেন। পথে নানা স্থানে মার জন্য সাজান হইয়াছে দেখিলাম। মধ্যে মধ্যে মোটর থামাইয়া রাজা সাহেব সকলের দর্শনের সুযোগ করিয়া দিতেছেন। পথে যোগেন্দ্র নগরে একটু সময়ের জন্য থাকা হইল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি বিপুল আনন্দে সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া মার দর্শন করাইতেছেন। মা তাঁহাকে কয়েকবার বলিলেন অন্যকে গাড়ী চালাইতে দিবার জন্য — এতটা পথ তাও পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ী চালান। কিন্তু রাজা সাহেব কিছুতেই অন্যকে দিতে রাজী হইলেন না।

সন্ধ্যার সময় মোটর মণ্ডির নিকটে আসা মাত্র দেখিলাম শোভাযাত্রা ও কীর্ত্তন সহ বহু লোক মাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। মালা হাতে বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে। ফুলে ফুলে মাকে যেন একেবারে ঢাকিয়া দিতে লাগিল। শুনিলাম কয়েক ঘণ্টা যাবৎ ইহারা সকলে মার প্রতীক্ষায় আছে। শোভাযাত্রার সহিত ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইয়া রাত্রি নয়টার পরে আমরা রাজমহলে পৌছিলাম, রাণী সাহেব মাকে ও হরিবাবাকে মালা দিয়া প্রণাম করিলেন। শুনিলাম সৎসঙ্গের জন্য কত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

আমরা মার সঙ্গে ৪৫।৪৬ জন আসিয়াছি। মাকে পাইয়া রাণী সাহেব ও অন্যান্যদের যে কি আনন্দ তাহা যেন ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মার প্রতি ইহাদের একটা তীব্র আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। মা পূর্ব্বে একবার এখানে আসিয়া রাজা সাহেবেরই এক মন্দিরের ধর্ম্মশালায় থাকিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে সুকেত যাওয়া আসার পথেও এইস্থান হইয়াই গিয়াছেন। এই সব কথা শুনিয়া রাজা সাহেব ও রাণী সাহেব বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে তখন কেন মার চরণে তাঁহারা আসেন নাই।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

অবধূতজীও সোলন হইতে আসিয়াছেন। সৎসঙ্গ খুব সুন্দর চলিতেছে। রাজা সাহেবের হুকুম যতদিন মা আছেন ততদিন রাণী সাহেবার জন্যও পর্দ্দার প্রয়োজন নাই এবং রাজমহলের ভিতরেও জনসাধারণের অবারিত দ্বার। এখানে বেশ আনন্দেই দিন কাটিতেছে।

আজ সকলে মিলিয়া মার সঙ্গে রেওয়ালসর গিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসা

হইল। কথা আছে ওখানে নাকি পুকুরের জলে বৃক্ষ ভাসে। আর তাহা ছাড়া ঐ জলাশয়ের চারদিকে যত গাছ আছে সকলই নাকি বৃক্ষরূপী দেবতা। লোমশ মুনি নাকি ঐ স্থানেই তপস্যা করিয়াছিলেন। মন্দিরে বুদ্ধ ভগবান ও লোমশ মুনির মূর্ত্তি আছে দেখিলাম। বেশ চমৎকার স্থানটি। পুকুরে দেখিলাম তিনটি মাটির স্তূপ সহ ছোট ছোট কয়েকটি গাছ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত দিনটি আমরা গুরুদ্বারের সম্মুখে পাহাড়ের উপরে কাটাইলাম। হরিবাবার সৎসঙ্গ এখানেই হইল। ব্যবস্থা বলা বাহুল্য রাজা সাহেবেরই।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে আমরা কুলু রওনা হইলাম। এখান হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূর শুনিলাম। আমরা দেড় ঘণ্টার ভিতরেই গিয়া পৌছিলাম।

কুলু উপত্যকা ও মলানীতে শ্রীশ্রীমা

প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। কুলুর রাজ বাড়ীর বাহিরে বাগানে মার জন্য তাঁবু লাগান হইয়াছে। পাহাড়ের নীচে কুলুর রাণী সাহেব রাজকুমার সহ আসিয়া মাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। দেবতাকে যেভাবে চৌকির উপর বসাইয়া বাহির করা হয় সেইরকম মাকেও নানারকম সজ্জিত চৌকির উপর বসাইয়া উপরে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। মার অভ্যর্থনার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে দেখিলাম।

মণ্ডির রাজাসাহেব দিল্লী হইতে দুইজন ফটোগ্রাফার আনাইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। নানাভাবে তাঁহারা ফটো তুলিতেছেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আজ অতি প্রত্যুষে সকলে মিলিয়া মার সঙ্গে মলানি যাওয়া হইল। মণ্ডি হইতে মলানি ২৩ মাইল দূরে। অবধূতজী এই স্থানটি মাকে দেখাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বীত ছিলেন। মা দুইবার পূর্ব্বে কুলু উপত্যকায় ঘুরিয়া গিয়াছেন। আর এদিকে আসার দরকার নাই এইরূপ কথা হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মাদের অনুরোধেই মা এবার আসিলেন।

এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অবর্ণনীয়। সবুজ ঘাস ও লতাপাতা বৃক্ষে সাজান পর্ব্বতমালা — পাদদেশে খরস্রোতা ব্যাস নদীর অপূর্ব্ব শোভা। এক-কথায় প্রকৃতি রাণী যেন সাজিয়া গুছিয়া বসিয়া আছেন। চোখ আর ফিরান যায় না। এই অতি মনোরম দৃশ্যে আমরা সকলেই মুগ্ধ।

একটি গাছের কোটর অনেকটা ঘরের মত হইয়া আছে। জানলা দরজার মতও হইয়া গিয়াছে। অবধূতজী মাকে তথায় নিয়া ভিতরে বসিতে বলিলেন। মা ত মহানন্দে তাহার ভিতরে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। শিশুর মত আনন্দে বলিলেন — "চমৎকার ঘর।" ফটোও তোলা হইল। মণ্ডির রাজা সাহেবের ইচ্ছা যে এই কোটরের গায়ে মার নাম খোদিত করিয়া যান। কিন্তু খোঁজ করিয়াও একটি ছুরি পাওয়া গেল না। রাজা সাহেব নিরাশ হইয়া ফিরিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন তাঁহার ঠিক পায়ের কাছেই একটি ছুরি পড়িয়া আছে। এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইল। অবধূতজী বলিয়া উঠিলেন — "মার চমৎকারিত্ব কিছু দেখা চাইত।" রাজা সাহেব মহানন্দে সেই ছুরি দিয়া বৃক্ষের গায়ে মার নাম লিখিয়া রাখিলেন। ছুরিটিও সযত্নে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

মলানির ডাক বাংলোতে রাজা সাহেব আমাদের থাকিবার ও খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে না থামিয়া আমরা সোজা বশিষ্ঠকুণ্ডে চলিলাম। ডাক বাংলো হইতে প্রায় ৪ মাইল

দূর। গাড়ী খানিকটা পথ যায়। তাহার পর প্রায় দেড় মাইল চড়াই। আমরা মাকে লইয়া হাটিয়াই চলিলাম। মার জন্য অবশ্য চৌকিতে বসাইয়া উপরে লইবার ব্যবস্থা ছিল। হরিবাবা আমাদের পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিয়াছিলেন। আমরা উপরে উঠিতেছি। দেখিলাম তিনি নামিতেছেন। ডাক বাংলোয় চলিয়া গেলেন।

বশিষ্ঠকুণ্ড গরম জলের একটি বৃহৎ কুণ্ড। সকলেই প্রায় সেখানে স্নান করিল। তাহার পর আমরা ডাক বাংলোয় ফিরিয়া চলিলাম। এবার মা অনেকটা পথ হাটিয়াই চলিলেন। চারিদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন সুন্দর তেমনই মার সঙ্গে এই পথে হাটিয়া চলার আনন্দ। ডাক বাংলোয় আসিয়া দেখি এখানে সব রকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিটি কাজ যেন একেবারে নিখুঁত। এইরূপ দুর্গম স্থানে এত লোকের এইরূপ সুচারু ব্যবস্থা যে কি ভাবে করিয়া যাইতেছেন তাহা আশ্চর্য্যের বস্তু সন্দেহ নাই। রাজা সাহেব ও রাণী সাহেব সকলের সঙ্গে যাইতেছেন, খাইতেছেন, বসিতেছেন। বিন্দুমাত্রও যেন অভিমানের লেশ নাই। সাধুদের সেবায় যাহাতে কোনও প্রকার ত্রুটি না হয় সেজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা বিশেষ সজাগ। সমস্ত ব্যবস্থা নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া করাইতেছেন।

বিকালে সৎসঙ্গাদি হওয়ার পরে আবার সকলে মিলিয়া কুলু রওনা হইলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আসিয়া পৌছিলাম।

মলানির পথে ঘন বৃক্ষের শোভা দেখিতে দেখিতে মা বলিতেছিলেন — "ঋষি মুনিরা সব দাঁড়িয়ে আছে।" অবধূতজীর এই কথা মনে লাগিল। তিনি সৎসঙ্গের সময়ে মাকে অনুরোধ করিলেন — "মা, একটু হরিনাম করিয়া এই ঋষি মুনিদের শুনাইয়া দেও। এখানকার আকাশে বাতাসে বৃক্ষ লতায় হরি নামের ভাব লাগিয়া থাকিবে।"

মা অবধূতজীর কথায় বেশ উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিলেন। আকাশ বাতাস সত্যই যেন মুখরিত হইতে লাগিল। এখানকার গাছগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে প্রতিটি গাছই সবুজ পাতায় ঢাকা। মা হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছিলেন — "নিজের শরীর হইতেই আবরণ বাহির করিয়া সেই আবরণেই নিজে ঢাকিয়া আছে।"

স্বপ্নে দীর্ঘকায় সাধুকে দর্শন

তাঁবুতে মা রাত্রে শুইয়া আছেন। আমিও সেই তাঁবুতেই শুইয়া আছি মা চোখ বুজিয়া বুজিয়া বলিতেছেন — "দেখছি একটা লোক, প্রকাণ্ড লম্বা, মাথা যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। সাধু, চলে যাচ্ছে।"

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

সকালে কুলু হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় আমরা মণ্ডি আসিয়া পৌছিলাম।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

যোগেন্দ্রনগর পরিদর্শন

আজ রাজা সাহেব মাকে এবং সকলকে লইয়া যোগেন্দ্রনগর চলিলেন। রাজা সাহেবের নাম যোগেন্দ্র সেন। তাঁহার নামেই এই সহরের নাম। এখানকার Hydro-electric Station বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিরাট ব্যাপার। ঝরণা হইতে বিজলী তৈয়ার হয়। রাজা সাহেব স্বয়ং সেখানকার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে মাকে সব দেখাইলেন। রাস্তাঘাট খুবই অদ্ভুত। সোজা একেবারে পাহাড়ে উঠিয়া যাওয়া। রেললাইন আছে তাহার উপর দিয়া

ঠেলাগাড়ীর মত যান। একসঙ্গে ২২।২৩ জন যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে নামিয়া অন্য একটিতে উঠিতে হয়। মধ্যে ট্রলিতেও কিছুটা দূর যাইতে হয়। সব কিছু ইলেকট্রিকে চলে। গাড়ীর দুইদিকে ধরিবারও কিছু নাই। একেবারে সোজা উপরে উঠিতেছে নামিতেছে। প্রথমে সকলকে দিয়া দস্তখত করাইয়া নেয় যে কাহারো জীবনের জন্য কেহ দায়ী নয়। বাস্তবিক ইহা অতি সত্য কথা। অনেকেই খুব ভয় পাইয়া গেল। উপরে বিরাট পাহাড় — নীচে নদী প্রবাহিতা। তাহার পরে ট্রলিতে কিছুটা দূর যাইতে হইল। উপরে গিয়া দেখিলাম সেখানেও সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং একটি অফিসে বিশ্রাম ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা আমরা যোগেন্দ্রনগর পৌছিলাম।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

দুইরাত্রি যোগেন্দ্রনগরে থাকিয়া আজ আমরা সন্ধ্যাবেলা মণ্ডি আসিয়া পৌছিলাম। ফিরিবার পূর্ব্বে রাজাসাহেবের বাড়ীতে মাকে এবং অন্যান্য সকলকে নিয়া গেলেন। আমাদের সকলের আহারাদির ব্যবস্থাও সেইখানেই হইয়া ছিল। মণ্ডির পরে তাঁহার আরও একটি বাড়ীতে সকলকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানেও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। এই স্থানটিও বেশ সুন্দর।

৩রা আষাঢ়, সোমবার।

রাণী সাহেবের বিশেষ আগ্রহে দিল্লী হইতে প্রায় ২৩ জন স্ত্রী-পুরুষ

আসিয়াছেন। আজ এখানে নামযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। বিশেষ ভাবে

মণ্ডিতে নামযজ্ঞ — কীর্ত্তন মণ্ডপ সাজাইয়া গতকাল সন্ধ্যায় অধিবাস হইয়াছে। রাণী সাহেবও একেবারে আনন্দে গদগদ। মাও মাঝে মাঝেই গিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সন্ধ্যায় নগর কীর্ত্তন করিয়া আবার নাম সুরু হইল। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল। মাও বসিয়া আছেন। নিজ হইতেই "হরিবোল, হরিবোল" নাম সুরু করিলেন। মার শরীর দুলিতে লাগিল। কেমন একটু ভাবের মত হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া নাম করিলেন। সকলেই মুগ্ধ হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন।

রাত্রি প্রায় বারটায় মেয়েরা কীর্ত্তন সুরু করিল। বহু স্ত্রীলোক আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়া খুব জমাইয়া তুলিলেন। প্রায় একটার সময় মা শুইতে গেলেন। ভোর চারটা বাজিতে না বাজিতেই মা আবার কীর্ত্তন মণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। দেখিলাম রাণী সাহেবও সারারাত কীর্ত্তনেই বসিয়া ছিলেন।

৪ঠা আষাঢ়, মঙ্গলবার।

আজ সকাল হইতে আবার পুরুষেরা নাম সুরু করিয়াছেন। বারটার পরে আবার মেয়েরা ধরিল। ৩৪ ঘণ্টা নাম হইবার পরে নাম বন্ধ হইল।

সুকেত গমন — পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী কীর্ত্তনের পরই মা সুকেত রওনা হইলেন। সঙ্গে ৬।৭ খানা গাড়ী। সুকেতের রাজা সাহেবের মেয়ের বড়ই অসুখ। তাই তিনি নিজে আসিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে রাণী সাহেবা এবং রাজকুমার আসিয়া মার দর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং মাকে একবার যাইবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া গিয়াছেন। এখান হইতে মাত্র এক ঘণ্টার রাস্তা। সুকেত রাজ্যের সীমানার নিকটে রাজা

সাহেব স্বয়ং মালা হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মাকে মালা পড়াইয়া প্রণাম করিয়া আমাদের মোটরেই উঠিলেন। গাড়ী মণ্ডির রাজা সাহেবই চালাইতে ছিলেন। বলা বাহুল্য যে মণ্ডি আসা অবধি তিনি আজ পর্য্যন্ত একদিনও অন্য কাহারও হাতে গাড়ী চালাইবার ভার দেন নাই। মা তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছেন আর ড্রাইভার বা অন্য কেহ গাড়ী চালাইবে ইহা তিনি যেন ধারণাই করিতে পারেন না। সুকেতে মাত্র একঘণ্টা থাকিবার কথা। কিন্তু রাজা সাহেব কতরকম যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমে মাকে এবং মহাত্মাদের মন্দিরে নিয়া গেলেন। স্থানটি বেশ সাজান গুছান। বার বৎসর পূর্ব্বে মা এখানেই আসিয়াছিলেন। সঙ্গে প্রায় ৪০।৪৫ জন গিয়াছে। সকলের জন্য প্রচুর পরিমাণে চা, ফল ও মিষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দির হইতে মাকে রাজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সামিয়ানা টানাইয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিলাম। মা সেখানে পৌছিলে পণ্ডিত আসিয়া মার পূজা ও আরতি করিলেন। কীর্ত্তনাদি হইল। রাজা সাহেবের রুগ্না মেয়েটিকে অতি কষ্টে উঠাইয়া আনিয়া মাকে প্রণাম করান হইল।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমরা সেখান হইতে রওনা হইলাম। পথে শুকদেবের স্থানটি দেখিয়া মণ্ডি ফিরিয়া আসিলাম। আগামী কল্যই আমাদের মণ্ডি ছাড়িয়া যাইবার কথা। সকলেরই মুখ খুব বিষণ্ণ।

৫ই আষাঢ়, বুধবার।

আজ বেলা প্রায় তিনটার সময় আমরা রওনা হইলাম। মাকে বিদায় দিবার জন্য শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছে। রাজা সাহেব এবং রাণী সাহেব

মার সঙ্গেই চলিলেন। আজ রাত্রিটা বৈজনাথের নিকটে এক স্থানে কাশ্মীরের মহারাণীর বাড়ীতে থাকা হইল।

৭ই আষাঢ়, শুক্রবার।

গতকাল আমরা মোটরে অমৃতসর পর্য্যন্ত আসিয়া ট্রেনে আজ সকালে দেরাতুন আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে ২।১ দিন থাকিয়া ১০ই আমাদের কাশী পৌঁছিবার কথা।

১০ই আষাঢ়, সোমবার।

শ্রীশ্রীমার উপস্থিতিতে কাশী আশ্রমে ভাগবৎ সপ্তাহ

আজ বিকালে আমরা কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। আগামী ১৫ই হইতে আশ্রমে ভাগবৎ সপ্তাহ হইবার কথা। কাশীতে পৌঁছিয়া দেখি বৃন্দাবন হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী আসিয়া গিয়াছেন। আমাদের সঙ্গেও মণ্ডির রাণী সাহেব ও যোগীভাই (সোলনের রাজা সাহেব) আসিয়াছেন। মণ্ডির রাজা সাহেব আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার পর্য্যন্ত ছিলেন। সেখান হইতে একটু কাজে সিমলা গিয়াছেন। শীঘ্রই এখানে আসিবার কথা।

১৩ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।

রাত্রিতে মা কন্যাপীঠের ছাদের উপর শুইয়া আছেন। নিকটে আমরা

অনেকেই আছি। মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন — "দেখ, দিদি, কাল দেখছিলাম এই শরীরটার এইখান দিয়া (দক্ষিণের কাঁধের কাছটা দেখাইলেন) কৃষ্ণমূর্ত্তি বের হয়ে আবার এই শরীরেই মিলিয়ে গেল।"

মায়ের দেহ হইতে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশ

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম — "বংশীধারী?" মা বলিলাম — "না, যেমন রাধা গোবিন্দ থাকে। রাধা না; শুধু কৃষ্ণ।" সাধারণতঃ এত পরিষ্কার ভাবে এই সব কথা মা বর্ণনা করেন না।

২৪শে আষাঢ়, সোমবার।

ভাগবৎ সপ্তাহ আশ্রমে বেশ ভাল মত হইয়া গিয়াছে। দিল্লীর ভক্ত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মেহেরা তাঁহার মৃত পুত্রের কল্যাণে এই সপ্তাহ করাইলেন।

আজ মা সকালে বিছানার উপর বসিয়া বসিয়াই বলিতেছেন — "দেখ, দেখলাম কি জানিস, একটা বেশ সুন্দর প্রকাণ্ড জলাশয়। আর সেই জলাশয়ের মধ্যে খুব বড় একটা পদ্মফুল। কি রকম জানিস্? পদ্মফুলটা যেন ঐ জল দিয়াই তৈরী। এই শরীরটাও ওখানেই।"

নানা সূক্ষ্ম দর্শনের কথা

আবার বেশ শিশুসুলভ মুখে হাসিয়া বলিতেছেন — "এক জায়গায় গিয়ে একটু দুধ চুরী করে খেয়ে আসলাম। সে উঠে সব নাড়াচাড়া দিয়ে দেখে আনন্দই পাবে।" এই বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য এই সমস্ত ঘটনাই সূক্ষ্ম জগতের।

৩২শে আষাঢ়, মঙ্গলবার।

ইতিমধ্যে মা ছাপরা গিয়াছিলেন। কাশ্মিরী ভক্ত কৃষ্ণা শিবপুরীর আহ্বানেই মা গিয়াছিলেন। সেখানে বেশ আনন্দে কয়েকটি দিন কাটাইয়া আজ আবার মার সঙ্গে আমরা কাশীধামে ফিরিয়া আসিলাম।

ছাপরাতে শ্রীশ্রীমা

১লা শ্রাবণ, বুধবার।

আজ আশ্রমে খুব ধুমধামের সহিত গুরু পূর্ণিমা উৎসব হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত একত্রিত হইয়াছেন।

১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

আজ মাকে লইয়া আমরা আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে ভাগলপুর রওনা হইলাম। ভাগলপুরে ৺শচীদাদার ভাইঝি থাকেন। তিনি ওখানকার সকলের পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ মার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া চিঠি দিতেছিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটায় ভাগলপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে মাকে দুর্গা বাড়ীতে নিয়া গেল। সেখানেই মার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মাকে পাইয়া সকলেরই মহানন্দ।

ভাগলপুর গমন

১৪ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

তিনদিন যাবৎ মা ভাগলপুরেই আছেন। কিন্তু আজই চলিয়া যাইবার

কথা। অনেকেই এখানে মার দর্শনের জন্য বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। এতদিন পরে তাঁহাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হইল।

মাকে ইতিমধ্যে এখান হইতে ১৬ মাইল দূরে গৈবীনাথ শিব দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখি যে গঙ্গার ঠিক মাঝখানে দ্বীপের মত একটি স্থান। সেখানে শিব মন্দির। আমরা নৌকা করিয়া সেখানে পৌছিলাম। বেশ সুন্দর স্থান। তবে আসিবার সময় স্রোতের টানে নৌকা বাঁচানই খুব কষ্টকর ব্যাপার হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া নৌকা পাড়ে লইয়া আসা হইল। পরে শুনিলাম এই সময়েতে প্রায়ই ঐ স্থানটিতে নৌকা ডুবি হয়।

গৈবীনাথ পরিদর্শন

স্থানীয় Water Works-এর অফিসেও মাকে তিনদিনই লইয়া গেল। মারোয়ারীদের সৎসঙ্গেও মাকে একদিন নিয়া গিয়াছিল।

হাজারীবাগ হইতে অজিত রায় আজ দুইদিন যাবৎ এখানে বসিয়া আছেন মাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য। অজিত বাবুর ছোট ভাই মনোজমাধববাবু অনেক দিন হইতেই মাকে নিবার খুব চেষ্টা করিতেছিলেন।

আজ বেলা তিনটার গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় এগারটায় আমরা গয়া আসিয়া পৌছিলাম। সেখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি প্রায় আড়াইটায় কোডারমা ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে মনোজবাবু মোটর লইয়া মার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখান হইতে হাজারীবাগ প্রায় ৪০ মাইল। হাজারীবাগ পৌছিতে প্রায় ভোর হইয়া গেল। একটি নূতন বাড়ীতে মার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিলাম। অন্যান্য সকলের জন্য আরও ২।৩টি বাড়ী রাখা আছে।

হাজারীবাগে চারদিন

১৮ই শ্রাবণ, শনিবার।

মনোজবাবু মার জন্য বেশ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিবারটিই খুব চমৎকার। বেশ ধর্ম্মভাব আছে।

প্রত্যহ মার দর্শনের জন্য বহু লোক আসিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বেই স্বপ্নে মাকে দর্শন করিয়াছেন। এখন স্থূল ভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সকলে আশা করিয়াছিল যে মা হয়ত এখানে কয়েকটি দিন থাকিবেন। কিন্তু বিন্ধ্যাচল হইতে বেলু (আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী) অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া কাশী আসিয়াছে। এই সংবাদ টেলিগ্রামে আসায় মার আজই রওনা হওয়া স্থির হইল। সকালের গাড়ীতেই মা রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় কাশী আসিয়া পৌছিলেন।

কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন

২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

আজ দুপুরে শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সঙ্গীয় লোকদের সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আসিয়া কীর্ত্তনাদি করিলেন এবং আশ্রমেই আহারাদি করিলেন। বৈদ্যনাথ আশ্রমে প্রাণগোপালবাবু* মার দর্শনের জন্য খুবই আগ্রহান্বিত। তিনি কয়েক মাস যাবৎ খুব অসুস্থ। মারও কতদিন যাবতই সেখানে যাওয়ার খেয়াল চলিতেছে। কিন্তু যাওয়া আর হয় নাই।

---

* অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত। শ্রীশ্রীমায়েরও একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

আজ আমরা মোহনানন্দজীদের পরিবেশন করিতেছি এমন সময় মা বলিয়া উঠিলেন — "দিদি, আমি চললাম দেওঘর।" ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। মা বলিয়া উঠিলেন — "বাবা, তোমার মোটরে আমাকে ষ্টেশনে পৌছিয়ে দিও।" মার চারটার ট্রেনে যাওয়ার কথা হইল। আমিত তখনই না খাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। একটু পরে শুনিলাম যে সন্ধ্যায় ৬টার গাড়ীতে গেলে আগে পৌছান যাইবে। তাই সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া স্থির হইল। মার সঙ্গে পরমানন্দ স্বামী, বুনি ও আমি গেলাম।

আকস্মিক ভাবে বৈদ্যনাথধাম গমন

২৪শে শ্রাবণ, শুক্রবার।

খুব ভোরে আমরা মার সঙ্গে বৈদ্যনাথধাম আসিয়া পৌছিলাম। মাকে নিয়া গোবিন্দ* সোজা প্রাণগোপালবাবুর নিকট গেল। মা অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়াছেন দেখিয়া তিনি মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন — "এই সময়েতে মা না আসলে আর কে আসবে?"

কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া মা নির্ব্বাণ মঠে চলিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শিষ্য স্বামী শাশ্বতানন্দ সেখানে থাকেন। মা গিয়া নিজেই দরজার শিকল নাড়িতে লাগিলেন। তিনি দরজা খুলিয়া সম্মুখে মাকে দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া গেলেন।

---

* ৺প্রাণগোপালবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ডক্টর গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় — কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। ইনি বাল্যকাল হইতেই মায়ের সন্নিকটে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

বেলা প্রায় দশটায় মা আবার শ্রীবালানন্দজীর করণিবাদ আশ্রমে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। মোটর তখনও আসিয়া পৌছে নাই। একটি ঘোড়ার গাড়ী করিয়াই চলিলেন। আশ্রমে গিয়া প্রাণগোপালবাবুর কাছে প্রায় ঘণ্টা খানেক বসিলেন।

মার আজই দুপুরে কলিকাতা রওনা হইবার কথা। বিদায় লইবার সময় প্রাণগোপালবাবুর হাতে মাথাটি ছোঁয়াইয়া — "বাবাগো, আসি" বলিলেন। কে একজন মাকে একটু মাথায় হাত দিতে অনুরোধ করিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন — "এখন সকলের মধ্যে এই বেশ। ভোরে কেউ দেখে নাই তখন বাবার গায়ে মাথায় সব জায়গায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি।"

শুনিলাম এই অসুস্থতার মধ্যেও নিত্য নিয়মিত ভাবে স্নান পূজা সংকথা চলিতেছে। যথাসময়ে মা ষ্টেশনে রওনা হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যা বেলা কলিকাতা পৌছিয়া মা প্রথমে কানু বসু, নরেন চৌধুরী, রায় বাহাদুর সুরেন ব্যানার্জ্জী ও চারু ঘোষের বাসা হইয়া আশ্রমে গেলেন। সকলেই মাকে এইভাবে পাইয়া খুব অবাক। দেখিতে দেখিতে মার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ভীর আর কমে না।

কলিকাতায় একরাত্রি

. . .

২৫শে শ্রাবণ, শনিবার।

আজ সারাটি দিন কলিকাতায় থাকিয়া মা সন্ধ্যায় পাঞ্জাব মেলে কাশী রওনা হইলেন।

. . .

১লা ভাদ্র, শনিবার।

দেওঘর হইতে গোবিন্দের চিঠি আসিয়াছে। প্রাণগোপালবাবুর অসুস্থতা

জনিত কষ্ট এখন কিছুটা কমিয়াছে। তিনি মা আসিবার পরই কাহাকে নাকি বলিয়াছেন যে ভীষ্মের শরশয্যায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন তেমনি মাও হঠাৎ গিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া আসিয়াছেন। কুসুম আজ দেওঘর হইতে আসিয়াছে। তাহার নিকট প্রাণগোপালবাবুর বিস্তারিত সংবাদ পাইলাম।

স্বপ্নে প্রাণগোপাল বাবুকে দর্শন ও কথাবার্তা

মা আজ আমাকে দিয়া গৌবিন্দের নিকট একটি চিঠি লেখাইলেন। মা স্বপ্নে কিছু দেখিয়াছিলেন। তাহাই আজ পত্রের মারফতে লিখিয়া জানান হইল — "একটি জলাশয়। তার পাড়ে একটি বড় গাছ। আরও ছোট বড় গাছ আছে। এই শরীরটা সেখানে। শরীরের কাছে একজন বুড়াবাবা, প্রাণগোপালবাবা আর কাতুমা। ইহাদের পিছনে পিছনে গৌর। গৌরের স্বাস্থ্য ও রংটা আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এই শরীরটা কিছু দূরে মাটির উপরে গিয়ে বসে পড়ল। বুড়াবাবা প্রাণগোপালবাবাকে বললেন — 'দেখ, দেখ, মাটিতে বসেছেন।' একজনে একখানি আসন এনে কাছে রাখল। নিজেরাও এই শরীরটার কাছেই বসে পড়ল। বুড়াবাবা ও প্রাণগোপাল বাবার সঙ্গে আধ্যাত্মিক কত সুন্দর সুন্দর কথা খানিক সময় হল। সেই স্থানটির পবিত্রতা পূর্ণ প্রভাবই কেমন যেন অন্য রকম। আধ্যাত্মিক আলোচনা হতে হতেই প্রাণগোপালবাবা ঐখানেই গায়ে একখানা চাদর টেনে শুয়ে পড়লেন। বেশ একটু নিজের ভাবে। এই ছোট্ট মেয়েটাও বাবার কাছে। ঐ সময় প্রাণগোপালবাবা চাদরের ভিতর থেকে নিজের হাত দুখানি বের করে চুপে চুপে অতি আদরের সঙ্গে শ্রদ্ধা গদগদ ভাবে এই শরীরের ডান হাতখানি নিজের বুকের দিকে টেনে নিয়ে, শক্তি গ্রহণই বল আর স্পর্শই বল। এই স্পর্শ বা শক্তি গ্রহণের কথাটা বাবার নিকট থেকেই প্রকাশ। এ শরীরের

কথা না। এ শরীর হঠাৎ বাবার চাদর খানা সরিয়ে দিল। চাদর অর্থাৎ কি ? সঙ্কোচ ভাব, আবরণ। চাদর খানা সরাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ — সঙ্কোচশূন্য গম্ভীর স্থির তন্ময় ভাব। বাবাকে বলা হল — 'বাবা, এই জাতীয়টা এই প্রথম'। বাবাও এই কথা শুনে সম্মতির ভাবে ঘাড়টা নেড়ে আনন্দে এই ছোট্ট মেয়েটাকে কাছে নিয়ে বসল। শান্ত স্থির ভাবটা তার থেকেও গভীর। বেশ খানিকক্ষণ বসার পরে যাওয়ার ভাব প্রকাশ করে এই শরীরটার দিকে চাইল আর উঠে দাঁড়াল। এই শরীরও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এই শরীরের সঙ্গে দুইজন ব্রহ্মচারী। সকলে একসঙ্গে রওনা হল। এই শরীরও সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত। এই শরীর ফিরবার সময় প্রাণগোপালবাবা বলল — "আমরা চলি। তুমি দেখো। সব সময়েইত দেখতে হবে।" বুড়া বাবাও অস্পষ্ট স্বরে ধীরে বললেন — 'হাঁ, দেখতেই হবে।' এই সময় কাতুমা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে এই ছোট মেয়েটার হাতে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে আদরের সঙ্গে বলল — 'মা, আমার দিকে খেয়ালটা তোমার রাখতেই হবে। সব সময় কাছে থেকো।' প্রাণগোপালবাবা ও কাতুমার চেহারা বেশ উজ্জ্বল সুস্থ; জরা ও রুগ্নের দিকটা নয়।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন — "এই সব বাবার নিজস্ব ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে খেলা আর কি! বাবার কথা বাবাই জানে। সেদিন এমনি যোগাযোগটা হয়ে গেল। ভোরে গিয়ে বাবার কাছে পৌছান হল। তখনই সকলের অগোচরে এই ছোট্ট মেয়েটা বাবার মাথায় গায়ে বুকে পিঠে নিঃসঙ্কোচে হাত বুলিয়ে দিল। আসবার সময় সেটা আবার সকলের কাছে প্রকাশ করে আসা হল। সবটাই কিন্তু আপনা আপনি হয়ে গেল।"

ইতিমধ্যে একদিন একটি ছেলে পুনঃ পুনঃ মার কথার অবাধ্য হইয়াছে।

পরে সে নিজের ভুল ও অন্যায় বুঝিতে পারিয়া মার নিকট ক্ষমা চাহিল। মা বলিলেন — "এই শরীরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোন কথাই নেই। এই শরীরের কাছে কাহারো কোনও অপরাধ হয়ইনা। তবে তুমি যে কাজ করেছ তার ফলত ভোগ করবেই। এই শরীরের কিন্তু সেজন্য রাগের নামই নেই।"

"এই শরীরের কাছে কোনও অপরাধ হয় না।"

শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর মহাশয় গত বৎসর দুর্গাপূজার একমাস পূর্ব্বে মাকে তিন দিনের জন্য নিয়া গিয়াছিলেন। এবারও সেইসময় মাকে নিবার জন্য বিশেষ ভাবে চিঠি লিখিয়াছেন। তাই কথা হইয়াছে মা আগামী ১৮ই এখান হইতে এটোয়া গিয়া সেখানে ২।১ দিন থাকিয়া এলাহাবাদ যাইবেন।

১৩ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।

আজ মার কিরকম একটু ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তাই এটোয়া যাওয়া বন্ধ করা হইল। সেখানে সংবাদ পাঠান হইল। কিন্তু মা আজই ডাঃ নাথের মোটরে বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলেন।

১৯শে ভাদ্র, বুধবার।

গতকাল রাত্রে জিতেনদা মোটর নিয়া আসিয়াছেন মাকে নিয়া যাইবার জন্য। আজ ভোরে মা সেই গাড়ীতে এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেলেন। সেখানে তিন দিন থাকার কথা।

বিন্ধ্যাচল হইতে এলাহাবাদ গমন

২২শে ভাদ্র, শনিবার।

মা এলাহাবাদে আছেন। ইতিমধ্যে মাকে একদিন খগেনদাদার বাসায়

ও একদিন মিসেস্ সিন্‌হার বাড়ীতে নিয়া গেল। যেদিন খগেনদাদার বাসায় যাওয়া হইল সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি। মা ঘরে যাইবেন না। বাহিরেই বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বৃষ্টিতে মাও প্রায় স্নান করিয়া উঠিলেন। অনেকেই মাকে তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন — "তোমারাইত আধঘণ্টা রাখবার কথা বলে এনেছ। এখন তার আগে কেন যাওয়া হবে?" এই বলিয়া মহানন্দে মা নাম আরম্ভ করিলেন। মায়ের লীলা অনন্ত।

আজই ভোরে মা মোটরে আবার কাশী ফিরিয়া আসিলেন। আজ হইতে এখানে আশ্রমে ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হইবে। শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিশেষ ইচ্ছাতেই এই ভাগবৎ জয়ন্তীর প্রারম্ভ। বাটুদা পাঠ করিবেন। ধারক কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী, জাপক চিত্ত ও যজ্ঞভূষণদা, শ্রোতা কুমার বাবু, কুসুম, পানু, রঘুনাথ পাণ্ডেজী, ভুবনদা, স্বামী শঙ্করানন্দজী ও কান্তিভাই।

কাশী আশ্রমে ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসব

২৯শে ভাদ্র, শনিবার।

আজ ভাগবৎ জয়ন্তী খুব মঙ্গলমত সম্পন্ন হইল। মার উপস্থিতিতে প্রতিটি উৎসবই কত সুন্দর হইয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একমাত্র পৌত্র খুব অসুস্থ হইয়াছিল। অমূল্য দাদা ও স্বামী শঙ্করানন্দজী ছেলেটির আরোগ্য কামনায় মাকে অনুরোধ জানাইলেন। ছেলেটি শেষ পর্য্যন্ত সুস্থ হইয়া গেল। সেই কথা একদিন কি কথা প্রসঙ্গে উঠিলে মার মুখ দিয়া বাহির হইল — "একদিন দেখছি এই শরীরটা গিয়ে ছেলেটির সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিল।"

মাতৃ কৃপায় কবিরাজ মহাশয়ের পৌত্রের রোগমুক্তি

৩১শে ভাদ্র, সোমবার।

আজ সকালে মা মোটরে বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ও গেলেন।

৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার।

ডাঃ জে, কে, সেন মহাশয় আকস্মিক ভাবে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। মাকে দেখিবার জন্য অনেক সময়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তদের মধ্যেও অনেকেরই ইচ্ছা মা একবার ডাক্তার বাবুকে দর্শন দিয়া যান।

ডাঃ সেনকে দেখিতে দিল্লী গমন

গতকাল দুপুরে বিন্ধ্যাচল হইতে রওনা হইয়া আজ ভোর ৮টায় মা দিল্লী পৌছিয়া ডাক্তার সেনকে দেখিয়া সাড়ে দশটায় আবার এটোয়া রওনা হইয়া গেলেন। এটোয়া বাসীরা বহুদিন যাবৎ মার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বাজপেয়ীদের বাসাতেই মার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

৭ই আশ্বিন, সোমবার।

এটোয়াতে তিনদিন

আজ মার কাশী ফিরিয়া যাওয়ার কথা। এখানে একদিন দিল্লীর ছেলেরা আসিয়া নামযজ্ঞও করিল। এটোয়া বাসীরা সমবেত ভক্তদের জন্য খুবই ভাল ব্যবস্থা করিয়াছে। সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইলেন।

১৩ই আশ্বিন, রবিবার।

এলাহাবাদের ভক্তেরা প্রায় একবৎসর যাবৎ সপ্তাহে একদিন এক এক বাসায় সৎসঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেশ ভালভাবেই চালাইতেছে। তাঁহাদের ইচ্ছা সৎসঙ্গ যেদিন প্রথম আরম্ভ হয় সেই তারিখে মাকে তাঁহারা এলাহাবাদ নিবেন। তাঁহাদের একান্ত আগ্রহে মা আজ সন্ধ্যায় ডাঃ গোপাল দাশগুপ্তের মোটরে এলাহাবাদ গেলেন। নীরজ দাদার বাসায় মার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সারারাত কীর্ত্তনাদি হইল।

১৪ই আশ্বিন, সোমবার।

আজ তাড়াতাড়ি মার ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রায় ১১টার সময় মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন।

১৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

আজ মা বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমের পশ্চিম দিকের বাড়ীর খানিকটা অংশ আজ আশ্রমের জন্য খরিদ করা হইল।

কন্যাপীঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের গৃহপ্রবেশ

মহাষ্টমীর দিন গৃহ প্রবেশ হইবে। টিহরীর রাজমাতাই ঐজন্য অর্থ দিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গগত স্বামী মহারাজা স্যার নরেন্দ্র শাহর নামে ঐ বাড়ীটি উৎসর্গ করা হইল। পরলোকগত মহারাজার নামে একটি স্মৃতি ফলক লাগান হইবে।

১৯শে আশ্বিন, শনিবার।

আজ ৶দুর্গাষষ্ঠী। এবার কলিকাতার ৶প্রাণকুমার বাবুর ছেলেরা

তাহাদের কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিয়া ফেলায় তাহাদের প্রতিবারের পূজা কাশী আশ্রমে করিতেছে। নানাস্থান হইতে বহু ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। সোলন হইতে রাজা সাহেব এবং টিহরী হইতে রাজমাতাও আসিয়াছেন।

কাশী আশ্রমে দুর্গাপূজা

২৩শে আশ্বিন, বুধবার।

আশ্রমে পূজা বেশ মঙ্গল মত হইয়া গেল। বিসর্জ্জনের পরই ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয় মাকে সঙ্কট মোচনের নিকট একটি স্থানে লইয়া গেলেন। এইস্থানে আনন্দময়ী করুণার পক্ষ হইতে একটি ছাগলশালার পরিকল্পনা হইয়াছে। গরীব রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানের উদ্দেশ্যে কাশী আশ্রমের একটি ঘরে ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। কিন্তু শিশুরা খাঁটি দুধ পায় না। তাহাদের খাঁটি দুধ বিনামূল্যে দিবার জন্য ডাক্তার দাশগুপ্ত এখানেও আনন্দময়ী করুণার একটি কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। টিহরীর রাজমাতা এই উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আরও কেহ কেহ কিছু দিয়াছেন। আজ বিজয়া দশমীর দিন মার হাত দিয়া প্রথমে শিশুদের দুধ দিবেন এই উদ্দেশ্যেই মাকে নিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তার দাশগুপ্তের বিশেষ চেষ্টা ও শুভ ইচ্ছাতেই এই সব কাজ আরম্ভ হইল।

"শিশুকল্যাণ" প্রতিষ্ঠা

২৮শে আশ্বিন, সোমবার।

গতকাল আশ্রমে মার উপস্থিতিতে লক্ষ্মীপূজাও হইয়া গেল। আজ

খাওয়া দাওয়ার পরে মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইয়া গেলেন। আমাদের সঙ্গে অনেকেই আসিলেন। তবে বিন্ধ্যাচলের বিশেষত্ব এই যে লোক বেশী হইলেও পাহাড়ের নির্জ্জনতাটুকু সকলেই উপভোগ করিতে পারেন।

১১ই কার্ত্তিক, সোমবার।

মা গত পরশু বিন্ধ্যাচল হইতে কাশী আসিয়াছেন। আজ আশ্রমে ৺কালীপূজা। এবার সব কয়টি পূজাই মার উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইতেছে সেজন্য আশ্রমবাসী এবং অন্যান্য সকলেই বিশেষ আনন্দিত।

২১শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

আশ্রমে খুব ধূমধামের সহিত কালীপূজা, অন্নকূট, ভাইফোঁটা ও গতকাল জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া গেল। আজ এলাহাবাদ হইতে শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌছিলেন। আগামী কাল হইতে আশ্রমে গীতা জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ।

গীতাজয়ন্তী উৎসব

২৬শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

আজ গীতাজয়ন্তী উৎসব সমাপ্ত হইল। উপস্থিত সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত গোপাল দাদার প্রাণের পূজা ও সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সময়োপযোগী গান বাস্তবিকই সকলের চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়াই পারে না।

মার শরীরটা বেশী ভাল যাইতেছে না। কথা ছিল যে মা হয়ত বিন্ধ্যাচলে যাইবেন। কিন্তু মার শরীরের জন্য ডাক্তার দাশগুপ্তের বিশেষ আগ্রহে মা এখানেই উপস্থিত থাকিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু আজ হাসিতে হাসিতে মাকে একটি ঘটনা শুনাইতেছিলেন। তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসার মার কি অসুখ তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দিয়াছিলেন — "দেখুন, প্রথম দিন দেখে ভাবলাম লিভার খারাপ। দ্বিতীয় দিন মনে হল আমারই ভুল, পিত্তের দোষ। তৃতীয় দিন স্থির করিলাম আমার উভয় ধারণাই ঠিক না, মার প্রকৃত দোষ গ্যাষ্ট্রিকের। আজ চতুর্থ দিন কি দেখিব বলা যায় না।"

এই কথা শুনিয়া সেই প্রফেসার ভদ্রলোক খুবই আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ দাশ গুপ্তের মত একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের এইরূপ ভুল হইতে পারে না। কিন্তু মায়ের শরীরের রোগলীলার সংবাদ ত তাঁহার জানা ছিল না। কাশীর মহারাজাও মার হজমের গোলমাল কেন হয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন মা এমন কি সব খান। কিন্তু ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন — "না খাইয়া হজমের গোলমাল হওয়া বা এক এক দিন এক এক নূতন নূতন রোগের লীলা প্রকাশ করাই যে মার খেলা।"

১১ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

মার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভালই মনে হইতেছে। বিন্ধ্যাচল যাওয়ার দিন এখনও ঠিক হয় নাই।

১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

আজ অতি প্রত্যুষে মেয়েদের কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বিন্ধ্যাচলে যাইবেন। আমেদাবাদ হইতে কান্তিভাই মুন্‌সা এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে গতকল্যই নাকি মা বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার মোটরে মাকে যেন বিন্ধ্যাচলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। আজই তাঁহার আমেদাবাদে ফিরিবার কথা ছিল। মায়ের বিন্ধ্যাচলে যাওয়ার সংবাদ অনেকেই জানিতে পারিল না। মা মোটরে গিয়া বসিলেন। ভুবনদাদা এবং আমি সঙ্গে চলিলাম। মাকে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়া দিয়াই আমরা আবার চলিয়া আসিলাম। কারণ আশ্রমের কাজে আমাকে লক্ষ্ণৌ যাইতে হইবে। বিকাল বেলার গাড়ীতে কুসুম, বুনী এবং বিজয়ানন্দ (ফরাসী সাহেব) প্রভৃতি কয়েকজন বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেল।

দুই চারিদিন পরেই আমি বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে গোপীনাথবাবুর এক চিঠি মায়ের কাছে আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি মার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া মায়ের দর্শন পান নাই, কারণ মা পূর্ব্বের দিনই বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গিয়াছেন। মা চলিয়া যাইবেন শুনিলে তিনি পূর্ব্বেই দেখা করিতে আসিতেন। মা যেন সন্তানের উপর দৃষ্টি রাখেন। সন্তানের উপর মায়ের করুণা যেন থাকে ইত্যাদি। আমিই ঐ চিঠির জবাব লিখিয়া দিলাম। মা এই কথাগুলি বলিয়া দিলেন — **"কাশী হইতে ঐ সময়ে যে আসা হইবে সেই খেয়ালটা পূর্ব্বদিন রাত্রি ১০।১১টার সময় পাকা ভাবে আসিয়াছিল। এই ছোট্ট মেয়েটা ত বাবার কাছেই।"** আরও লিখাইলেন —

"অখণ্ড অজস্র করুণাধারা, ঐ ধারাতেই স্নান করা।"

২২শে অগ্রহায়ণ, শনিবার।

আজ একটি মহিলা এলাহাবাদের সংকীর্ত্তন ভবনের দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য মাকে মোটরে এলাহাবাদে লইয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় তথায় পেঁ ৗছিলাম। দেখিলাম কীর্ত্তন হলটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। রবিবার দিন উহার দ্বার উদ্ঘাটন করা হইবে।

২৩শে অগ্রহায়ণ, রবিবার।

শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে মা আজ অল্প সময়ের জন্য তাঁহার আশ্রমে গেলেন। সেখান হইতে আবার প্রভুদত্তজীর আগ্রহে অল্প সময়ের জন্য ঝুসীতেও গেলেন। পরে এলাহাবাদ সঙ্কীর্ত্তন ভবনে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় মাধুরী দিদির মোটরে কাশী চলিয়া আসিলেন। কাশীতে পেঁ ৗছিতে রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল।

২৫শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

গতকাল সন্ধ্যাবেলা বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়া আজ মা রাজগির রওনা হইয়া গেলেন। আমরা মির্জ্জাপুর গিয়া মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া এলাহাবাদ চলিয়া গেলাম। মা যে কোথায় গেলেন তাহা অনেকেই জানিতে পারিল না।

৭ই পৌষ, রবিবার।

মা রাজগির গিয়া প্রথমে কুণ্ডের ধারে একটা ঘরে ছিলেন। পরে

ঐখানে আরও একটা স্থানে ছিলেন। পরে রামেশ্বরী মহাবীর ধর্ম্মশালায় চলিয়া আসিয়াছেন। ঐ ধর্ম্মশালার কর্ত্রীই নাকি নিজে গিয়া মাকে ঐ ধর্ম্মশালায় লইয়া আসিয়াছেন। এই সকল খবর আমি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম।

রাজগিরে শ্রীশ্রীমা

আমি মার কাছে আসিয়া পৌছিলাম। আমার সঙ্গে আসিয়াছে কমল, আমেদাবাদের কান্তিভাই মুন্সা, জিতেন দাদা এবং মার্কিন যুবক জ্যাক আঙ্গার।

রাজগির পেঁছিয়া দেখি যে ধর্ম্মশালার কর্ত্রীর মার প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং প্রীতির ভাব। শুনিলাম মা যখন কুণ্ডের ধারে প্রথম গিয়া উঠিলেন তখন ইনি দর্শন করিতে গিয়া মার কাছেই থাকিয়া যান। মায়ের নাম অনেক দিন হইতে শুনিলেও মাতৃদর্শন ইঁহার এই প্রথম। ঐ দর্শনের পর হইতেই তিনি মার কাছে রহিয়া গেলেন। তাঁহাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে দেখিয়া মা তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্মশালায় যাইতে বলিলেন। কিন্তু মাকে সঙ্গে না নিয়া তিনি ফিরিবেন না ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। কাজেই মাকেও ধর্ম্মশালায় চলিয়া আসিতে হইল।

ধর্ম্মশালায় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে। ধর্ম্মশালার যিনি কর্ত্রী তিনি মহারাষ্ট্র দেশীয়া। ইনি খুব ধর্ম্মপরায়ণা এবং বেদান্তবাদী। নিজের বাড়ীতে না থাকিয়া ইনি স্বামী সহ ধর্ম্মশালার এককোণে বানপ্রস্থ জীবন যাপন করিতেছেন। ইনি খুব সাধু সেবা করেন। ধর্ম্মশালাতে মায়ের নিকট অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। ইঁহাদের সকলেরই আহারের বন্দোবস্ত ইনিই করিতেছেন। ইঁহাকে নিষেধ করিলেও ইনি শুনেন না। ইঁহার শুদ্ধ ভাবের কথা মা আমাদিগকে বলিলেন।

মা আমাদিগকে কুণ্ডে স্নান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। এখানকার

কুণ্ডের জল বাত এবং পেটের পক্ষে খুব উপকারী। মা খুব ভাল আছেন বলিলেন। কুসুম, পরমানন্দজী মার সেবা করিতেছেন। মুক্তি বাবার ইচ্ছাতেই এখানে আসা হইয়াছে। ফরাসী ডাক্তার বিজয়ানন্দও এখানেই আছেন ; কারণ তিনি মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

৮ই পৌষ, সোমবার।

আজ সন্ধ্যায় রামেশ্বরী দেবী, যিনি ধর্ম্মশালার কর্ত্রী, আসিয়া বলিলেন — "মা, আজ দুপুরে ঘুমাইতে পারি নাই, প্রাণটা যেন কেমন করিয়াছে আর কেবলই মনে হইয়াছে যে মা হয়ত শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন। আমি সকলকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই কিছু বলিতে পারিল না।"

মা হাসিয়া বলিলেন — "আমারও দুপুর বেলা খেয়াল হইতেছিল যে অনেক লোক আসিয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মশালার প্রায় সমস্ত জায়গায়ই ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এখন এখান হইতে চলিয়া গেলে হইত।" ইহা শুনিয়া রামেশ্বরী দেবী বলিলেন — "মা, আমি আরও জায়গা করিয়া দিতেছি। ক্ষেতের চাউল গম ত তোমার কৃপায় আছেই। এখনই কেন চলিয়া যাইবার কথা বলিতেছ?" এই সব কথা বলিয়া তিনি সাধুদের কাছে অদ্বৈতবাদের যে সব কথা শুনিয়াছেন এবং পুস্তকে যাহা পড়িয়াছেন তাহা কিছু কিছু আবৃত্তি করিলেন এবং একটু ভজনও গাহিলেন। ইহা শুনিয়া মা আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, — "আমার মায়ের ভিতর অনেক কিছু আছে দেখিতেছি। আজ ১২।১৩ দিন যাবৎ এখানে আছি মা ত আমাকে কিছুই শুনায় নাই। আজ দিদিকে দেখিয়া বোধ হয় এ সব বাহির হইল।"

৯ই পৌষ, মঙ্গলবার।

আজ বিকালে এক ভদ্রলোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জপ করিয়া জপ সমর্পণ করার উদ্দেশ্য কি? মা বলিলেন, — "দেখ, ছেলে মেয়েরা যদি কোন ভাল জিনিষ পায় এবং তাহা যদি নিজের কাছে রাখে তবে উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, কারণ তাহারা হয়ত জিনিষটার প্রকৃত মূল্য জানে না। কিন্তু তাহারা যদি উহা তাহাদের মায়ের নিকট দেয় তাহা হইলে মা উহার মূল্য বুঝিয়া উহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দেন। উহা আর তখন ছেলে মেয়ের হাতে দেন না। পরে তাহারা বড় হইলে এবং ঐ জিনিষের মূল্য বুঝিবার সামর্থ্য হইলে মা তাহাদের জিনিষ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তখন অবশ্য তাহারা উহা নানা ভাবে লাগাইয়া লাভবান হইতে পারে। সেইরূপ জপ করিলেই তাহার একটা শুভ ফল আছে। কেহ জপ করিয়াই জপের ফল যদি ভগবান্‌কে সমর্পণ করে তবে আর উহা নষ্ট হয় না। ভগবান্ সময় মত আবার উহার ফল তাহাকে ফিরাইয়া দেন। অর্থাৎ সে যখন দেখিতে পারে যে তাহার কামনা বাসনা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে তখন সে বুঝিতে পারে যে ভগবান্ তাহাকে জপের ফল দিতেছেন। ইহাই হইল জপ সমর্পণ।"

জপ সমর্পণের অর্থ

আবার বলিতেছেন — "তার পর দেখ, জপ সমর্পণ করিয়া ভগবানের চরণে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম কি? না, তাঁহার চরণে মাথা লুটাইয়া দিতে হয়। ইহা করিলে কি হয়? না, সেবকের মাথা এবং ভগবানের চরণ এক হইয়া যায়।"

১৪ই পৌষ, রবিবার।

বিকাল বেলা মাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয় তখন কেহ কেহ মাকে

তাঁহার আশ্রমে বা বাড়ীর বাগানে নিয়া যান। কখনও কখনও এই সময় ভাল ভাল কথাবার্ত্তাও হয়। একদিন কথায় কথায় মা বলিতেছেন — "তোমরা দুশ্চিন্তা বল না? দুশ্চিন্তা কেন হয় জান? ভগবানকে দূরে রাখিলেই দুশ্চিন্তা হয়। দুর্ব্বুদ্ধির অর্থও তাই। ভগবানকে দূরে রাখার নাম দুর্ব্বুদ্ধি অথবা তিনি দূরে এই যে বুদ্ধি ইহাই দুর্ব্বুদ্ধি। হাতে কাজ করিয়া মনে মনে তাঁহার নাম করিতে হয়। হাতের কাজ হইল মুদ্রা, ঐ মুদ্রায়ই তাঁহার নাম করা। রোগীর সেবা যা' কিছু সবই তাঁহার সেবা, তাঁহারই কর্ম্ম এই ভাবটা মনে রাখা। মানা মানি নিয়াই সুখ দুঃখ কি না। মানা মানির পারে যদি যাইতে হয় তবে তাঁহাকে মান। কিন্তু তাহা না করিয়া আরও কত কিছু মানিয়া রাখা হয়। অজ্ঞানের পরদা যেমন আছে আবার জ্ঞানের দরজাও আছে। চেষ্টা করিলে যায়। যাহার বন্ধন সেই জীব। বন্ধন থাকিলে ত দুঃখ হইবেই।"

দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর করিবার উপায়

ধর্ম্মশালার কর্ত্রী রামেশ্বরী দেবীর মায়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ দেখিয়া এক দিন আমি তাঁহাকে বলিলাম — "বহিনজী, তুমি মায়ের সঙ্গে বেশী মেশামিশি করিও না। তুমি ত মায়ের স্বভাব জান না। ইহার স্বভাব হইল সকলকে কাঁদান। তোমরা যে মায়ের জন্য এত করিতেছ কিন্তু দেখিবে যে মা তোমাদের সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবেন।" রামেশ্বরী দেবী বেদান্তবাদী। তিনি বলিলেন — "না, দিদি, আমার চোখের জল পড়িবে না। আমার যখন বোন মরিল তখন আমি কাঁদি নাই। লোকদিগকে ভুলাইবার জন্য কিছুক্ষণ চোখে কাপড় দিয়া ছিলাম। একবার এই ধর্ম্মশালায় একজন আসিল। সে আমাকে 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিত। তাহার সঙ্গেও খুব মেশামেশি হইয়াছিল।

সে যখন চলিয়া যায় তখনও আমার চোখে জল আসে নাই। এ সব আসা যাওয়া, জন্ম মৃত্যু ত আছেই। এর জন্য কাঁদিবার কি আছে?" তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। ভাবিলাম সময়ে দেখা যাইবে।

ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, রমা দিদি, প্রভা দিদি প্রভৃতি কয়েকজনকে মা পুরী পাঠাইয়া দিলেন। মুক্তিবাবাও সেই সঙ্গে গেলেন। ইহাদিগকে যাইতে দেখিয়াই রামেশ্বরী দেবীর মনটা খারাপ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন — "এগুলি মার চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বাভাস।" তিনি মাকে বলিতে লাগিলেন — "মা, তুমি যাইও না।"

এক মারোয়ারী পরিবার এবং এক মৈথিলী পণ্ডিতের স্ত্রীও এখানে সর্ব্বদা মায়ের কাছে আসিতেছেন। তাঁহারাও মাকে আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

দুপুর বেলা রামেশ্বরী দেবী মায়ের ঘরে বসিয়া বলিতেছিলেন — "কত চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই চোখের জল বন্ধ করিতে পারিতেছি না। মা চলিয়া যাইবেন মনে হইলেই চোখে জল আসিতেছে।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইয়া বলিলাম — "এ কি বলিতেছ বহিনজী। সেদিন না বলিলে যে এ সব ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এর জন্য আবার চোখের জল দেখা কেন?"

১৫ই পৌষ, সোমবার।

মা পুরী রওনা হইলেন। আমরা ভোর বেলা মোটরে বক্তিয়ারপুর আসিয়া ট্রেন ধরিয়া রাত্রিতে হাওড়া পৌছিয়া পুরীর গাড়ী ধরিলাম। কলিকাতার ভক্তেরা মায়ের আগমন সংবাদ পাইল না।

পুরী যাবার পথে ট্রেনে মা আমাকে বলিতেছেন — "দেখ দিদি, দেখছি গোপীবাবা যেন কাছে শুয়ে আছে। বলছে — বড় ক্ষুধা পেয়েছে। তাকে খেতে দেওয়া হল। তখন বাবা যেমন প্রসাদ মিশিয়ে খায় তেমনই প্রসাদ মিশিয়ে খেতে গিয়ে প্রসাদ খুঁজতে লাগল। কিন্তু না পেয়ে এই শরীরটাকে লক্ষ্য করে জোরের সঙ্গে বলল — এ সব তোমারই কাজ।"

স্বপ্নে কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন

১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার।

সকালে পুরী পৌছিয়াই শুনিতে পাইলাম যে মুক্তিবাবা প্রভৃতি যাঁহারা আমাদের মাত্র একদিন পূর্ব্বে পুরী পৌছিয়াছিলেন, তাঁহারা জগন্নাথ দেবের দর্শনে গেলে পাণ্ডাদের সঙ্গে একটু গোলমাল হয়। পাণ্ডারা মুক্তিবাবাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় যাহার ফলে মুক্তিবাবার দক্ষিণ উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি এখন হাসপাতালে আছেন। এই কথা শুনিয়া মা তখনই হাসপাতালে চলিয়া গেলেন।

এখানকার হাসপাতালে চিকিৎসা ঠিক মত হইবে না মনে করিয়া আবার আজই মুক্তিবাবাকে সঙ্গে করিয়া মা নিজে কলিকাতা রওনা হইলেন। সঙ্গে ভূপেন এবং ফরাসী ডাক্তার বিজয়ানন্দও গেলেন।

২১শে পৌষ, রবিবার।

আজ মা পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। সেদিন ষ্টেশনে ডাঃ সুধীন মজুমদার, সোপোরী সাহেব এবং ডিরেক্টার অব হেল্‌থ ডাঃ দাশগুপ্ত প্রভৃতি

উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাই আগ্রহ করিয়া মুক্তিবাবাকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এখন হইতে মুক্তিবাবার কথা ভিন্ন মার আর কোন কথাই নাই। কি ভাবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ভাল ভাবে হয় তাহার ব্যবস্থাই করিতে লাগিলেন। যাহাকে দিয়া যতটুকু হয় সেই সব ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। মা বলিলেন — **"ইঁহারা সাধু। ইঁহাদের ত আর নিজস্ব ঘর বাড়ী নাই। ইঁহাদের সেবার জন্য ঘরে ঘরে সকলে আছে।"** মা নিজে কখনও একবেলা কখনও তুইবেলা হাসপাতালে গিয়া মুক্তিবাবাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। কুসুমকে মুক্তিবাবার সেবার জন্য রাখা হইল। তাহাছাড়া কাহাকেও প্রতিদিন কাহাকেও বা সপ্তাহে একদিন করিয়া হাসপাতালে গিয়া মুক্তিবাবাকে দেখিয়া আসিতে মা বলিয়াছেন।

মুক্তিবাবার সেবার ব্যবস্থা

তুপুরে ও সন্ধ্যায় অনেকেই এখানে মার সহিত দেখা করিতে আসেন। মা তাঁহাদের সহিত নানাকথা বলেন। একদিন কথায় কথায় বলিতেছেন — **"তিনি আছেন। তিনি না থাকলে আমি কই? তিনি আমাকে ছুঁয়ে আছেন। এই ভাবটা নিতে নিতে দেখবে তিনিই। আমি যদি থাকি, — সেবক সেবিকা। তাই আমি ত দূরে রইলাম না। তাই আর তুর্ব্বুদ্ধি হল না। এই ভাবটা আসবার জন্যই নিরন্তর জপ। যতটা ইষ্টতে মন রাখবে ততটা নিষ্ঠা বাড়বে। বহু দিকে মন না দিয়ে একাগ্র হওয়া। ভয় ভাবনা কেন? তিনি আমার কাছে নাই — এই ভাবটার জন্যই ত। তিনি ধরে আছেন। ভয় কি? অভয়কে ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায়?"**

নিজের শরীরের বিষয়ে অন্য একদিন বলিতেছেন — "ব্যাপারটা কি? যখন শরীরটা একটু খারাপ বলে তোদের দৃষ্টিতে দেখিস তখনই তোদের সঙ্গে মেলামেশাটা বেশী করে দেখিস। আবার যখন শরীরটা তোদের দৃষ্টিতে সুস্থ বলিস তখন ঐ দিকে টারন্ তোরা দেখিস। তোদের যে আলাদা ভাব আছে তাই ঐদিক এইদিক বলিস। এ শরীরের ত যা' হয়ে যায় তাই। ওদিক আর এদিক নাই। 'নাই' ও নাই; যা' বল তাই। তোরা মানে তেরা মেরা কি না। 'তেরা' — 'মেরাই'ত তোদের ব্যারাম।"

প্রায় রোজই মুক্তিবাবার খবর সহ ৩।৪ খানা চিঠি আসিতেছে। মুক্তিবাবার হাড় সেট্ করিতেছে। তাই ভয়ানক কষ্ট। তিনি মাকে দেখিতেও ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি নাকি বলেন যে মা যে ক'দিন ছিলেন তখন ব্যথা ছিল না বলিলেই হয়। মা পুরী যাওয়ার পর হইতেই ব্যথা বাড়িয়াছে।

১লা মাঘ, মঙ্গলবার।

আজ মা আবার কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন। ত্রিগুণা দাদা পুরী আসিয়া মাকে শ্রীরামপুর যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। সকালে মা হাওড়া পৌছিলেই তিনি মাকে ষ্টেশন হইতে শ্রীরামপুর লইয়া গেলেন। সোপোরী সাহেবের মোটরেই মা গেলেন। তিনিও সপরিবারে পুরী আসিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে গিয়া আহারাদি করিয়া বিকাল বেলা মা কলিকাতা ফিরিলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে চারটার সময় মা মুক্তিবাবাকে দেখিতে হাসপাতালে গেলেন। মাকে দেখিয়া তাঁহার কি আনন্দ। তাঁহার যেন কোন অসুখ নাই

— এই ভাব হইতে তিনি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন। মা অমনি বাধা দিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় ও কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন। তিনিও মার হাত দু'খানি ধরিয়া নিজের মাথায় একটু সময় চাপিয়া রাখিলেন।

৪ঠা মাঘ, শুক্রবার।

মুক্তি বাবাকে দেখিতে মা হাসপাতালে গেলেই সেখানে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মাকে ডাকিয়া রোগীদের ঘরে ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। কোনও নার্স হয়ত আসিয়া বলে — "আমার রোগীকে একটু দেখিয়া যান।" কেহ হয়ত আসিয়া বলিল — "ঐ ঘরে চলুন একটি রোগী আপনাকে দেখিতে চায়।" তাহাদের কথায় মাও ঘরে ঘরে গিয়া রোগীদিগকে দেখেন।

হাসপাতালের রোগীদের মাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা

তাহারাও মাকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করে। কেহ কেহ কাতর প্রাণে রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানায়। মাও স্নেহ ভরে কাহাকেও একটু স্পর্শ করেন, কাহারও মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। ইহাতে রোগীরা যেন কৃতার্থ হইয়া যায়। মা এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া রোগীদিগকে দেখেন ও বলেন — **"এও ত দেব মন্দির। রোগ রূপেও তিনিই ত। মন্দিরে মন্দিরে দেবতা দর্শন দিচ্ছেন।"**

মা মুক্তিবাবার নিকট বসিয়া আছেন এমন সময় একটি মেম সাহেব মায়ের কাছে আসিলেন। তিনি রুগ্না, চলিতে পারেন না। তাঁহাকে একটি ঠেলা গাড়ীতে করিয়া মার কাছে আনা হইয়াছিল। তিনি আসিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন — "আমি উপরের তলায় থাকি। সেখানে সকলে

আপনাকে দর্শন করিতে চায়। আপনি কৃপা করিয়া তাহাদিগকে একবার দর্শন দিবেন।”

পরদিন মা হাসপাতালে গেলে ডাক্তার দাশগুপ্ত মহাশয় মাকে উপরে লইয়া গেলেন। উপরে গিয়া দেখিলাম এক স্থানে রুগ্না স্ত্রীলোকদিগকে রাখা হইয়াছে। কোথাও বা কেবল রুগ্ন শিশুদিগকে রাখা হইয়াছে। একটি শিশুকে দেখিলাম তাহার বয়স হয়ত ৬ মাস হইবে। তাহার দুই খানি পা উপরে তুলিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, নীচের দিকে ঘাড় খানি কাত হইয়া আছে, ঐ অবস্থায়ই সে খেলনা লইয়া খেলিতেছে। শুনিতে পাইলাম যে প্রায় এক মাস যাবৎ সে এই অবস্থায় আছে। আরও পনর দিন নাকি থাকিতে হইবে। ছেলেটিকে দেখিয়া বড়ই দুঃখ বোধ হইল।

একদিন মা ডাক্তার, রোগী এবং নার্সদিগকে আপেল, কমলা ইত্যাদি ফল দিলেন। সিন্ধি ভক্ত পুনানী এই সমস্ত ফল কিনিয়া দিয়াছিলেন। হাসপাতালের মধ্যেও মায়ের উৎসব চলিল।

এই সময় ডাঃ রাধাকৃষ্ণনও হাসপাতালে ছিলেন। যে দিন তাঁহার অপারেশন হয় সেই দিন তাঁহাকে দেখিতে মায়ের খেয়াল হইল। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। এই অবস্থায় বাহিরের কাহাকেও কাছে যাইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু মায়ের খেয়াল তাই ডাঃ দাশগুপ্ত মাকে লইয়া চলিলেন। রাধাকৃষ্ণনের সেবায় নিযুক্ত যে দুইটি নার্স ছিল তাহাদের ইচ্ছা নয় যে মা ঘরে যান। অথচ তাহারা বাধাও দিতে পারিতেছে না।

স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের রোগ শয্যাপার্শ্বে গমন

একজন বলিল — “মা, শুধু এক মিনিটের জন্য ঘরে আসিতে পারেন।” মা অমনি বলিলেন — “আধা মিনিট।” অগত্যা তাহারা মাকে ঢুকিতে দিল। কিন্তু ডাক্তার দাশগুপ্ত বাহিরেই রহিলেন। মাকে ঘরে ঢুকাইয়াও তাহাদের

শান্তি নাই, পাছে মা কিছু করিয়া ফেলেন। এইজন্য তাহারা সতর্ক দৃষ্টিতে মাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং দুই জন রোগীর খাটের দুই দিকে গিয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিল যেন মা রোগীর কাছে যাইতে না পারেন। কিন্তু মা উহাদের হাতের নীচ দিয়াই রোগীর বিছানাটা একটু স্পর্শ করিয়া চলিয়া আসিলেন। কে জানে ইহার কি অর্থ?

রাধাকৃষ্ণনজীর জ্ঞান হওয়ার পর তাঁহাকে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। মা যে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন ইহা জানিয়া তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানাইতে অনেককেই তিনি বলিয়াছেন।

মা যে কি ভাবে কাহাকে কৃপা করেন তাহা বুঝা কঠিন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে মায়ের খুব বিশেষ পরিচয়ও নাই। অথচ মা নিজ হইতে গিয়া অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আসিলেন। এইরূপ অহৈতুকী কৃপার আরও কত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি।

একবার কাশীতে একটি গরীব স্ত্রীলোক আসিয়া মায়ের আশ্রয় নিল। তাহার নাম কমলা। কিন্তু মা তাহার নাম দিয়াছিলেন গোপালের মা, কারণ সে গোপালের সেবা পূজা করে। সে আশ্রমে থাকে বটে কিন্তু তাহাকে আশ্রমের কাজকর্ম্ম খুব বেশী করিতে দেখিতাম না। অথচ তাহার উপর মায়ের যথেষ্ট কৃপা দেখিতাম। একদিন মা আমাদের নিকট বলিতেছিলেন—"গোপালের মা লোকটা খুব ভাল। কাজকর্ম্মও বেশ পরিষ্কার করে করে।" ঐ সব প্রশংসা শুনিয়া আমি বলিলাম—"কি জানি মা, আমরা ত উহাকে বেশী কাজের দেখি না। তাহাছাড়া খামখেয়ালীও বেশ আছে।" মা অমনি বাধা দিয়া বলিলেন—"তা থাক্। এত বড় তোদের আশ্রমের কাজ ও করতে পারে না। এত বেশী কাজ করার

গোপালের মা

ওর অভ্যাস নেই। তবে যতটুকু করে পরিষ্কার ভাবে করে। আর এর বেশী কাজ যদি নাই পারে তবে না করবে। যা পারবে তাই করবে। বেচারা বড় গরীব। তার কেউ নাই। ভাল মানুষ কিন্তু।"

আর একদিন দেখিতেছি মার শরীর বেশ অসুস্থ। রাত্রিও তখন ১২টা এমন সময় মায়ের গোপালের মার কথা মনে পড়িল। আমরা মাকে বিশ্রাম দিতে ব্যস্ত আর মা ব্যস্ত হইলেন গোপালের মার জন্য। বলিলেন— "ডাক দেখি একটু গোপালের মাকে।" সে আসিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — "কি রে আশ্রমে থাকতে কেমন লাগছে?" সে একটু উদাস ভাবে উত্তর করিল যে তাহার ভালই লাগিতেছে। তবে তাহার চাকুরী করিতে ইচ্ছা করে এবং ইতিমধ্যে সে একটা চাকুরীর চেষ্টায়ও গিয়াছিল। ইহা শুনিয়া মা বলিলেন — "এতদিন ত চাকরী করলে কিছুই ত রাখতে পার নাই। চাকরীর কি দরকার? তোর যা দরকার বল দিদি তার ব্যবস্থা করে দেবে।" পরে আবার বলিতেছেন — "আর যদি তোর চাকরীই করতে ইচ্ছা করে তবে সেই ব্যবস্থাই করা যাবে। তবে ছাখ, কেন আর কষ্ট করে চাকরী করবি? তুই যতটুকু কাজ পারিস করিস। এইখানেই গঙ্গার তীরে পড়ে থাক। সাধন ভজন করবি আর যতটুকু পারিস সেবা করবি। আশ্রমের সকলেই তোকে দেখবে, তুইও তাদের দেখবি, কেমন?" মায়ের করুণার সীমা নাই।

আমরা মাকে বার বার বলিতেছি — "মা, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন শুইয়া পড়।" মা আমাদের কথা যেন শুনিতেই পাইতেছেন না। মা যেন গোপালের মার জন্যই অস্থির। আমরা ত মায়ের এই লীলা দেখিয়া অবাক্। গোপালের মা কিন্তু মায়ের এই ভাবটা ধরিতে পারিতেছে না। সে আপন

ভাবেই কথা বলিয়া যাইতেছে। কিন্তু করুণাময়ী মা করুণা বিতরণে কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না।

১২ই মাঘ, শনিবার।

গত ৫ই মাঘ আমরা পুরীতে পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা হইতে সরোজ (দত্ত) দাদা, শশধর দাদা, কোহিনুর দাদা, অনিল (গাঙ্গুলী) ভাই, বিনয় দাদা প্রভৃতি আসিয়াছেন। ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মা দুই বেলাই সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেছেন। বেশ আনন্দেই সকলের দিন কাটিতেছে। কান্তিভাই মুন্সার স্ত্রী ও মেয়ে ও আমাদের সঙ্গেই আছে।

১৩ই মাঘ, রবিবার।

সকালে হাওড়া পৌঁছিয়া ষ্টেশন হইতেই মা মুক্তিবাবাকে দেখিতে গেলেন। হাসপাতালে রোগীদের সহিত দেখা করিবার সময় হইল বিকাল ৪॥০টা। কিন্তু মায়ের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। তাই সকাল বেলাই মা মুক্তিবাবাকে দেখিয়া আশ্রমে গেলেন। কলিকাতায় তিন দিন থাকিয়া ১৫ই মাঘ মার কাশী রওনা হইবার কথা।

১৭ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

আজ কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা বেশ আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইল।

আশ্রমের লাইব্রেরীর আজ মার উপস্থিতিতে দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব হইল।

১৯শে মাঘ, শনিবার।

কাশীপুর সাধু সম্মেলনে

আজ প্রভুদত্তজীর আহ্বানে মা কানপুর চলিলেন। সেখানে এক সাধু সম্মেলন হইবে। সন্ধ্যাবেলা আমরা কানপুরে পৌছিলাম। ষ্টেশনে প্রভুদত্তজী, জিতেন দাদা, ডাঃ জগদীশ দাদা এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। জগদীশ দাদার বাসায়ই মায়ের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। মা সেইখানে গেলেন।

২০শে মাঘ, রবিবার।

সকাল বেলা প্রভুদত্তজী এবং চক্রপানীজী মাকে সঙ্গে করিয়া কাশীপুর রওনা হইলেন। তিনখানা মোটরে আমরা সকলে চলিলাম। দেখিলাম রাস্তা ভয়ানক খারাপ। ইহা যে এত খারাপ তাহা প্রভুদত্তজীও জানিতেন না। তিনি খুবই লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক অতিকষ্টে কতকটা মোটরে এবং কতকটা হাটিয়া আমরা উৎসবের স্থানে গিয়া পৌছিলাম। দেখা গেল ঐখানকার ব্যবস্থাও সুবিধাজনক নয়। এই জন্য প্রভুদত্তজী মাকে আর ঐখানে রাখিবার চেষ্টা না করিয়া একটু জলযোগ করাইয়াই আবার মোটরে মাকে কানপুর পাঠাইয়া দিলেন। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আবার জগদীশদাদার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহাদের কি আনন্দ!

২১শে মাঘ, সোমবার।

আজ দুপুরে আহারাদির পর আমরা লক্ষ্ণৌ রওনা হইলাম। সেখানে

শীতল প্রসাদ এক নূতন মন্দির করিয়াছে। মা সেই মন্দিরে কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার সন্ধ্যার ট্রেন ধরিয়া হরিদ্বারে যাইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ রওনা হইবার পূর্ব্বে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের কন্যা ও জামাতা মাকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া গেলেন। মা তাঁহাদের বাড়ীতে একটু সময় থাকিয়া তাঁহাদের মোটরেই লক্ষ্ণৌ রওনা হইলেন।

রাস্তায় অনেকেই মার দর্শনের জন্য জায়গায় জায়গায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইহারা কতটুকু সময়ই বা মায়ের দর্শন পায় অথচ এই দর্শনের জন্যই ইহারা কত ক্লেশ সহ্য করে। মায়ের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা যখন উনাও পৌছিলাম সেখানেও দর্শনপ্রার্থী এক দলের সহিত দেখা হইল।

উনাও ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে মা একটি গ্রাম দেখাইয়া আমাকে বলিলেন — "দিদি, দ্যাখ্ ঐ গ্রামটি কেমন সুন্দর, না?" আমি চাহিয়া দেখিলাম যে দূরে গাছপালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানকার ঘরবাড়ী-

বৃক্ষরূপী মহাপুরুষদ্বয়

গুলি সবই মাটির। মা আবার বলিতেছেন — "দ্যাখ্, ঐ গাছটা কি সুন্দর!" আমি বলিলাম — "চল না গাছটি দেখে আসি।" আমার কথা শুনিয়া মা যেন সঙ্কোচের সহিত বলিলেন — "গাড়ী যে অনেক দূর এসে পড়েছে।" আমি ব্যগ্র ভাবে বলিলাম — "তাতে কি হয়েছে? চল চল।" এই বলিয়া ড্রাইভারকে গাড়ী ফিরাইতে বলিলাম এবং গ্রামটি দেখাইয়া সেই দিকে গাড়ী চালাইতে বলিলাম।

মা ড্রাইভারকে বলিলেন — "দেখ, অপরের গাড়ী তুমি খারাপ রাস্তায় নিয়া খারাপ করিও না। তুমি বরং পাকা রাস্তায় গাড়ী রাখিও আমরা হাটিয়াই যাইব।" ড্রাইভারও বলিল — "অতদূর বোধ

হয় গাড়ী যাইবে না, কারণ অনেক দূর পর্য্যন্ত ক্ষেত দেখা যাইতেছে।" আমি বলিলাম — "বেশত যতদূর যায় ততদূরই চল না।" সেও বলিল — "হাঁ, যত দূর যায় আমি ততদূরই লইয়া যাইব। গাড়ীর জন্য ভাবনা কি? মার জন্যই ত গাড়ী আসিয়াছে।"

কতদূর অগ্রসর হইলে দেখা গেল যে ক্ষেতের মধ্য দিয়া কতকটা খোলা জায়গা আছে। গাড়ী গ্রাম পর্য্যন্তই যাইতে পারিবে। গ্রামে পৌঁছিলে মা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। নামিয়াই সোজা গ্রামের মধ্যে এক বাড়ীর দিকে যেন ছুটিয়া চলিলেন। আমি যতই মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে মা কোন গাছের কথা বলিয়াছিলেন মা তাহার উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন — "গাড়ীতে যে ফুলের মালা এবং ফলের ঝুড়ি আছে উহা নিয়া আয়।" উহা সব লইয়া আমি একরূপ দৌড়াইয়াই মার পিছনে পিছনে চলিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখি যে একটি বাড়ীর নিকটই একটা জলের ডোবা। উহার পারেই ছোট দুইটি বট ও নিম গাছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মা নিকটে গিয়া গাছ দুইটিকে খুব আদর করিতে লাগিলেন। উহাদের গায়ে মাথা মুখ লাগাইয়া বলিতেছেন — "আচ্ছা, তোমরা নিয়া এসেছ এই শরীরটাকে।" এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে মা এই গাছের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু গাছ দুইটি আকারে ছোট। পাতাও বেশী নাই, দেখিতেও সতেজ নয়। চলতি মোটর গাড়ী হইতে এত দূরে থাকিয়া এই দুইটি গাছ দেখা ত অসম্ভব। অথচ এই দুইটি গাছের জন্যই মা এখানে আসিয়াছেন।

আমাদিগকে এই ভাবে আসিতে দেখিয়া গ্রামের কয়েকজন লোক আসিয়া আমাদের কাছে জড় হইল। মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন — "এই গ্রামের নাম কি?" একজন উত্তর দিল — "ভবানীপুর।" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন — "এই গাছ কে লাগাইয়াছে?" উত্তর হইল — "দ্বারকা।"

বাড়ীর মালিক বাড়ীতে ছিল না সকলে তাহার স্ত্রীকে দেখাইয়া দিল। মা গাছ দুইটির কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন — **"এই গাছ দুটিকে তোমরা বিশেষ ভাবে যত্ন এবং পূজা করিও। তোমাদের ভাল হইবে।"** এই বলিয়া সঙ্গের মালাগুলিকে গাছ দুইটির উপর সাজাইয়া দিলেন। ফলগুলিও উপস্থিত সকলের মধ্যে বিলাইতে থাকিলেন। সকলকে দিয়া বাকী যে ফলগুলি রহিল তাহা ঝুড়িসহ ঐ বাড়ীর কর্ত্রীকে দিয়া দিলেন। ফলের ঝুড়ি দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — "তোমার মেয়ে আছে?" বেচারা কিছুই বুঝিতেছে না। গ্রাম্য স্ত্রীলোক, মাথায় এক হাত ঘোমটা। মায়ের কথা শুনিয়া সে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মা তাহাকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন — "তোমাকে মা করিয়া গেলাম। (নিজকে দেখাইয়া) এইটা তোমার মেয়ে।"

এইবার মা ঐখান হইতে ফিরিলেন। আসিতে আসিতে বলিলেন — **"নিম আর বট গাছ — হরি হর।"** আমরা বলিলাম "গাছ দুইটির বুঝি এই নাম করণ হইল? বেশ ত।" আমরা মোটরের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানেও কিছু লোক দাঁড়াইয়া ছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম — "তোমরা গাছের তলাটা লেপিয়া রাখিও।" ভূপেন আমাদের সঙ্গে ছিল। সে ঐ লোকগুলিকে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল — "তোমরা গাছ দুইটির যত্ন করিও।" তাহারা সম্মত হইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন — "তোমরা ভগবানের নাম কর ত? রোজ ত পারিবে না, মাঝে মাঝে ঐ দুইটি গাছের তলায় পূজা ও কীর্ত্তনাদি করিও।" তাহারা উহা করিতে সম্মত হইল।

কিছুদূর যাইয়া আমরা একটা বাজার দেখিলাম। শুনিলাম যে ঐ জায়গার নাম নবাবগঞ্জ এবং ঐ বাজারই হইল ভবানীপুরের বাজার। যাইতে যাইতে মা বলিতে লাগিলেন — **"ভাখ্, কি আশ্চর্য্য! ঐ গাছ দুটি**

যেন মানুষের মত এ শরীরটাকে টেনে ঐখানে নিয়া গেল। গাড়ী চলছিল কিন্তু দেখছিলাম যে ওরা এ শরীরটার বুকপিঠ আটকিয়ে পিছন দিকে টানছে। এরূপ কিন্তু আর কখনও হয় নাই।" আমরা জানিতে চেষ্টা করিলাম যে এই গাছ দুইটি কাহারা, কিন্তু মা সে কথার কোন জবাব দিলেন না। মায়ের অনন্ত লীলা!

বেলা দুইটায় আমরা লক্ষ্ণৌ পৌছিলাম। শীতল প্রসাদ এবং হরিরাম ভাই আমাদিগকে নূতন মন্দিরে লইয়া গেল। এদিকে মায়ের আগমন সংবাদ পাইয়া অন্যান্য ভক্তেরাও ঐখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐখানে কাটাইয়া — মা দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার রওনা হইলেন।

২২শে মাঘ, মঙ্গলবার।

ভোরে আমরা হরিদ্বারে পৌছিলাম। যোগীভাই এবং কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ষ্টেশনে ছিল। আমরা যোগীভাইয়ের ধর্ম্মশালায় আসিলাম। সেখানে একটি সুন্দর শিব মন্দির করা হইয়াছে। মায়ের এবং ভক্তদের থাকিবার জন্যও নূতন দালান কোঠা করা হইয়াছে। সৎসঙ্গের জন্য যে হলটি করা হইয়াছে তাহাও খুব সুন্দর। যোগীভাই যে শিব মন্দির তৈয়ার করিয়াছেন ঐখানে এবার শিব প্রতিষ্ঠিত হইবেন। বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তেরা সব আসিতেছেন।

হরিদ্বারে যোগী ভাইয়ের শিব প্রতিষ্ঠা

২৭শে মাঘ, রবিবার।

রাজা সাহেবের শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সাধু মহাত্মারা অনেকেই আসিয়াছেন। বিদ্যাপীঠ হইতে ছেলেরাও সকলে আসিয়াছে। তাহাদের

মধ্যে কয়েকজনের এবার উপনয়ন হইয়া গেল। সৎসঙ্গ বেশ চলিতেছে। ইহার মধ্যে মা শিবপুরাণ পাঠও আরম্ভ করাইয়াছেন।

আজই মা মোটরে কিষণপুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। দেরাদুনে তিন দিন থাকিয়া ১লা ফাল্গুন বিকালে আবার হরিদ্বার ফিরিয়া আসিবার কথা।

২রা ফাল্গুন, শুক্রবার।

আজ শেষ রাত্রিতে মা হঠাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন — "দেখ, দিদি, শোয়ার ত ভাবই নাই। দেখছি কি জানিস? মুক্তি বাবার কাছে এই শরীরটা। বাবা কষ্টে ব্যথায় বড় ব্যাকুল। এই শরীরটা বাবার ডান দিকে বাবার বুকের কাছে মাথাটা রেখে একটু হেলে শোয়ার মত আছে। বাবার ব্যথার জায়গাটাতে হাতটা দেওয়া। এর মধ্যে তুই গিয়ে ডাক দিতেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম — 'কেমন আছ, বাবা?' বাবা কিছুক্ষণ পরে ম্রিয়মাণ ভাবে বলল — 'খুব কষ্ট, শরীরটা ত্যাগ করে ফেলব।' এই কথাটা এমন ভাবে বলল যেন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একেবারে দৃঢ় ভাবে স্থির করেছে। তখন এই শরীরটা বলছে — 'বাবা, ইচ্ছা করে কিছুতেই শরীর ত্যাগ করতে পারবেনা। স্বাভাবিক ভাবে যখন যা হয়ে যায়। তখন বাবা বলল — 'মা, বল তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না?' এই শরীরটা বলল — 'না, না, নিশ্চয়ই না।' এইরকম কথা বাবা তিনবার বলিয়ে নিল। তারপর বলা হল — 'বাবা, ছাড়বার কথা আসে কেন? নিত্য সম্বন্ধ।' এই কথা শুনে বাবার চেহারাও যেন আনন্দে বদলিয়ে গেল। তখনও এই শরীর বাবার মাথার দিকে বসে। এই শরীরের আশে পাশে কীর্ত্তন চলছে।"

সূক্ষ্মে মুক্তিবাবার সঙ্গে কথাবার্তা

৩রা ফাল্গুন, শনিবার।

অবধূতজী প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মবিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেন। তিনি আজ মায়ের একটি কথা লইয়া আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে মা যে সর্ব্বদাই বলেন, 'যা হয়ে যায়', ইহা সাধারণ কথা নয়। ইহা একটি মহাবাক্য। মার প্রতিকার্য্যেও ঐ ভাব প্রকাশ পায়। যাহা হইয়া যায় — মানে কিছুতেই আনন্দ বা দুঃখ নাই। গীতায় আছে —

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

মায়ের কথার অর্থও হইল ইহাই। মা-ই গীতার মহাবাক্যের প্রত্যক্ষ আদর্শ। মায়ের প্রতি কথায় প্রতি কার্য্যে আমরা ইহা দেখিতেছি। সমস্ত সাধনভজনের লক্ষ্যও ইহাই। ইহাই আত্মস্থিতি। ইহার পর আর কোন কথাই হইতে পারে না।

এই জাতীয় অনেক কথাই তিনি বলিলেন।

৫ই ফাল্গুন, সোমবার।

আজ আমি পানু এবং শৈলেশকে নিয়া অবধূতজীর কাছে গিয়াছিলাম।

মায়ের স্পর্শে কুষ্ঠ রোগীর রোগমুক্তি

অবধূতজী একবার আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শে এক কুষ্ঠরোগী ভাল হইয়া গিয়াছে। কাগজেও ইহা বাহির হইয়াছিল। আমরা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন — "আমি থান্না গিয়া গঙ্গোত্রীমায়ের নিকট প্রথম এই খবর শুনিলাম। পরে বহু লোকের

নিকটই ইহা শুনিয়াছি। খান্নাতে এই ব্যাপার নিয়া সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল।"

আরও একটি বিশেষ ঘটনা। মাকে যখন আম্বালাতে লইয়া যাওয়া হয় তখন মায়ের অভ্যর্থনার জন্য কয়েকটি কলাগাছ লাগান হয়। গাছগুলি কাটিয়াই লাগান হইয়াছিল শিকড় সহ নয়। উৎসবের ৭।৮ দিনের মধ্যে গ্রীষ্মকালের দারুণ উত্তাপে গাছগুলি শুকাইয়া যায়। মায়ের তিথি পূজার দিন আবার এই গাছগুলির একটিকে তুলিয়া নিয়া পূজার স্থানে লাগান হয়। তখন ঐ গাছের কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ শিকড় শূন্য মরা গাছ হইতেই পরে দুইটি পাতা বাহির হয় এবং ঐ দুই পাতার মধ্যে ছোট ছোট ৭।৮টি কলাও হয়। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। এমন কাণ্ড আমি আর কখনও দেখি নাই। উৎসবের পরে যখন আমি আম্বালা যাই তখন ঐখানকার লোকেই আমাকে ইহা দেখাইয়াছে। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি — 'মহাত্মাদের কার্য্যকলাপ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহারা অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন।'

শুষ্ক বৃক্ষে পত্র ও ফলোদ্গম

অবধূতজীর এই কথা শুনিয়া আমরাও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

১০ই ফাল্গুন, শনিবার।

যোগীভাইয়ের শিব মন্দিরে খুব সুন্দর ভাবে শিব প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। এই শিব নর্ম্মদা হইতে আনান হইয়াছে। ইহার বর্ণ মধুপিঙ্গল। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিন এই শিবকে মহাসমারোহে গঙ্গায় নিয়া স্নান করান হইল। গঙ্গাগর্ভে শিব বসিয়াছেন। পণ্ডিতগণ মন্ত্রপাঠ করিয়া যোগীভাইকে দিয়া ঐ শিবের পূজা করাইতেছেন। ভক্তগণ পাড়ে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতেছে।

সদানন্দময়ী মা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব লক্ষ্য করিতেছেন। একে ত গঙ্গার অপরূপ দৃশ্য, তাহার মধ্যে ভক্তগণের কীর্ত্তন ধ্বনি, গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি পূজার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মন্ত্র ধ্বনির সহিত মিশিয়া সকলের প্রাণে কি যে এক সাত্ত্বিক ভাব সৃষ্টি করিতেছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আজ শিব প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে মা দুই হাতে শিবকে ধরিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নিজ মস্তক বুলাইয়া দিলেন। সকলেই ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

আজ শিব রাত্রি। যোগীভাই চার প্রহরে চার বার ঐ শিব পূজা করিলেন। মন্দিরের বারান্দার দুই দিকেই সকলে পূজায় বসিয়াছেন — এক দিকে স্ত্রীলোকেরা, অন্যদিকে বিদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারীরা। কীর্ত্তনও সারা রাত্রি চলিয়াছে। প্রথম প্রহরের পূজার সময় মা মন্দিরের দরজার কাছে বসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় প্রহরের পূজা আরম্ভ হইলেই মা বিশ্রাম করিতে গেলেন। আবার চতুর্থ প্রহরের পূজার সময় মা আবার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ মন্দিরে বসিয়া পূজা দেখিলেন। পূজা শেষ হইলে উঠিয়া মন্দিরের বারান্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। আবার ফুলের ডালা হইতে ফুল বেল পাতা লইয়া সকলের মাথায় ফুল বেলপাতা দিয়া বলিতেছেন — **"হর হর বম বম।"** মাকে এইভাবে আশীর্ব্বাদ করিতে দেখিয়া সকলেই ছুটিয়া মায়ের কাছে আসিতে লাগিল। মাও তাহাদের মাথায় ফুল বেলপাতা দিয়া বলিতেছেন — **"সবই ত শিব স্বরূপ।"** আজ সকাল বেলাও আমাদের নিকট যে মহাযজ্ঞের ভস্ম ছিল তাহা চাহিয়া নিয়া সকলের কপালে লাগাইয়া দিয়াছেন। এই ভাবে মায়ের হাতের আশীর্ব্বাদ পাইয়া সকলেই আনন্দে ভরপুর।

১২ই ফাল্গুন, সোমবার।

আজ সূর্য্যগ্রহণ। গ্রহণ বেলা তিনটার পর লাগিয়া বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিবে। এই সময় মা সকলকে নিয়া গঙ্গার ঘাটে বসিলেন। গ্রহণ লাগিবার পর যেই মাত্র মা জিজ্ঞাসা করিলেন — "খান্না বাবা কি আস্‌বেন?" অমনি দেখিতে পাইলাম যে ত্রিবেণী পুরীজী আসিয়া হাজির। আসিয়াই তিনি স্নান করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি জলে না নামিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়াই কমণ্ডলু দিয়া স্নান করিলেন। আমরা অনেকেই মাথায় গঙ্গা জল দিলাম। গ্রহণ ছাড়িয়া গেলে ত্রিবেণী পুরীজী গঙ্গায় গিয়া নামিলেন। এই সময় মাও গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিয়া স্নান করিলেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই স্নান করিল। মা জল হইতে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময় দেখা গেল ত্রিবেণী পুরীজী গঙ্গার ঘাট হইতে রওনা হইয়াছেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি মাকে দেখিতে পাইয়া জুতা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মায়ের কাছে আসিয়া মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। মা অমনি নিজের মাথাটিও বাবার মাথার কাছে রাখিয়া বলিলেন — "**বাবার এ সব লীলা।**" বাবা কিন্তু কোনও জবাব না দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়াই সোজা রওনা হইলেন। বেশ সুন্দর ভাব।

হরিদ্বারে সূর্য্যগ্রহণ

মহাত্মা ত্রিবেণী পুরীজীকে আমার বড়ই ভাল লাগে। একদিন ত্রিবেণী পুরীজীর কাছে গিয়া বলিলাম — "বাবা, বৃন্দাবন হইতে হরিবাবা মাকে লইয়া যাইতে লোক পাঠাইয়াছেন। কিন্তু মা বলিতেছেন যে তিনি এখন যাইবেন না, এখানকার উৎসবের পরে যাইবেন।" ইহা শুনিয়া বাবা দুইবার বলিলেন — "মা যাহা বলিবেন তাহাই হইবে।" আবার ধীরে ধীরে বলিতেছেন — "এ

মায়ের সম্বন্ধে ত্রিবেণী পুরীজীর অভিমত

শরীর এখানে বসিয়া আছে কিন্তু মন মাতাজীর কাছেই আছে।" এই কথাটিও দুইবার গম্ভীর ভাবে বলিয়া আপন মনেই যেন বলিতেছেন—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তি পূজামূলং গুরোর্পদং
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোর্কৃপা।"

ইনি সর্ব্বদাই যেন তন্ময় ভাবে থাকেন। আমি ইহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

একদিন কমল (ব্রহ্মচারী) ইহাকে মার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ইনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই —

"দেখ, সমস্ত নদী যেমন সাগরে গিয়া মিলিত হয় সেইরূপ বিশ্বের সমস্ত ভাব ধারা মায়ের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইতেছে। সাগরের মধ্যে সমস্ত নদী মিশিলেও তাহার যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই সেইরূপ মাও সর্ব্বাবস্থায়ই নির্ব্বিকার। সাগরের যেমন কুল কিনারা নাই মাকেও সেইরূপ কোন সীমার মধ্যে আনা যায় না।"

১৩ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

আমরা মার সঙ্গে দেরাদুন রওনা হইলাম। আনন্দপ্রিয়াজীও (টিহরীর রাজমাতা) সঙ্গে চলিলেন। তিনি মাকে দুইখানা মোটর গাড়ী দিয়াছেন। সেই নূতন গাড়ীতেই মা দেরাদুন রওনা হইলেন।

দেরাদুনের পুরাতন ভক্ত কাশীনারায়ণ তন্‌খা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী নিজেই আসিয়া আশ্রমে মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আজ মাত্র ১০। ১২ দিন হয় বিধবা হইয়াছে। কিন্তু মায়ের কৃপায় সে বেশ শান্ত ভাবেই এই শোক সহ্য করিতেছে।

১৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

দুই দিন দেরাদুনে থাকিয়া আজ মার সঙ্গে মোটরে বৃন্দাবন রওনা হইলাম। আমাদের সঙ্গীয় লোকেরা কতক ট্রেনে এবং কতক টিহরীর রাজমাতা প্রদত্ত ষ্টেশন ওয়াগনে রওনা হইলেন। দেরাদুন হইতে বৃন্দাবন যাইতে হইলে দিল্লী হইয়া যাইতে হয়। আমরা রাত্রিতে ডাঃ জে, কে, সেন মহাশয়ের বাসায় পৌছিলাম। কিন্তু যাহারা ষ্টেশন ওয়াগনে রওনা হইয়াছিল তাহারা তখনও আসিয়া পৌছে নাই। রাত্রিতে শুইতে গিয়া মা আমাকে বলিলেন — "গ্যাখ দিদি, ওরা এখনও এল না; কোন ভয় নাই ত?" উহা শুনিয়া আমি জোর দিয়া বলিলাম — "কোন ভয় নাই। কিছু হবে না। একটু আগে পরে পৌছবে এই আর কি।" আমার কথা শুনিয়া মা — "আচ্ছা" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ষ্টেশন ওয়াগনের যাত্রীরা রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় আমাদের এখানে আসিয়া পৌছিল। তাহাদের নিকট শুনিলাম যে দিল্লী হইতে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে তাহাদের গাড়ী সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়াছিল। গাড়ীতে ছিল কলিকাতার আপতাপ মিত্র, কমলাকান্ত, বুনী, বেলু, অমূল্যদাদার স্ত্রী ও মেয়ে, নগেন দাদার মেয়ে এবং চাকর প্রহ্লাদ। ইহাদের মধ্যে বেলু, বুনী এবং প্রহ্লাদই একটু বেশী আঘাত পাইয়াছে। কিন্তু মালে ভর্ত্তি গাড়ী যে ভাবে উল্টাইয়া গিয়াছিল তাহাতে সব কিছুই হইতে পারিত। সেই তুলনায় ইহাদের কিছুই হয় নাই। ইহাদিগকে এই ভাবে রক্ষা পাইতে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিল। মা তখনই উহাদিগকে দুধের সঙ্গে হলুদ চূর্ণ এবং ঘি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেন। আঘাতের পক্ষে ইহা খুব উপকারী।

দিল্লীর পথে মোটর দুর্ঘটনা

মা বলিলেন— "গাড়ীটা যখন প্রথম দেরাদুনে আসল তখনই দিদি

দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এই শরীরটার কাছে কি সব যেন বলছিল। তখনই বলা হয়েছিল — 'দুর্ঘটনার কথা কেন?' এখানে এসে দিদিকে কতবার বলেছি যে ওরা এসে পৌছলনা। কিন্তু দিদি বারবারই জোর দিয়ে বলল — 'কিছুনা, কিছুনা, কিছুই হবেনা।' সেই জোরের সঙ্গে তিনবার 'না' 'না' করাতেই সকলে এই ভাবে রক্ষা পেয়ে এসেছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম — "বেশ ভাল কথা। আমিই বিপদ কাটালাম; আমিই রক্ষা করলাম। মন্দ ব্যাপার না।"

মা বলিলেন — "দেখ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যা কিছু হয়ে যেতে পারত। বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা ত। গোবিন্দজী যেন হাতে ধরে রক্ষা করেছেন।"

এই সকল কথাবার্তায় রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মায়ের চৌকির ধারেই মা খুকী, বেলু, বুনী, বাসন্তী ও সুমতিকে শোয়াইয়া দিলেন। তারপর ইহাদের মাথায় একটু একটু হাত বুলাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন — "তোমরা রক্ষা পেয়ে এসেছ।"

১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

যে গাড়ীখানা উল্টাইয়া গিয়াছিল উহার সঙ্গে কমলাকান্ত ছিল। আর সকলে অন্য গাড়ী ধরিয়া এখানে আসিয়াছে। ভোর হইতে না হইতেই কমলাকান্তও সেই মোটর এবং জিনিষপত্র লইয়া দিল্লী আসিয়া পৌছিল। সকাল বেলার ট্রেনে মা নারায়ণ স্বামী এবং মিত্রদাদাকে লইয়া মোটরে বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন। আমরা সকলে রেলগাড়ীতে গেলাম।

১৭ই ফাল্গুন, শনিবার।

আমি কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে আজ কাশী চলিয়া আসিলাম। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌ হইয়া মায়ের কাছে যাইব স্থির হইয়াছে। আরও কথা হইয়াছে যে মা ১৯শে ফাল্গুন দিল্লী আসিবেন। ২০শে ও ২১শে তথায় থাকিয়া ২২শে আবার বৃন্দাবনে ফিরিবেন।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী নলিনীবালা বসু নাম্নী একজন ভদ্রমহিলা মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুরী গিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় মায়ের দর্শন না পাইয়া মাকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দেন। কবিতাটি আমার ভাল লাগিল বলিয়া এখানে উহা উদ্ধৃত করিলাম —

"তোমারে দেখিনি আজো ভুবনবন্দিতা,
আমার মানসদেবী অয়ি অনিন্দিতা।
শুধু তব পুণ্যনাম শুনেছে শ্রবণে,
দেখিবার ইচ্ছা তাই জাগে মনে মনে।
আজ এই পুণ্যধাম সিন্ধুতীরে বসি
হেরি যেন মূর্ত্তি তব উঠিছে ঝলসি
পারাবার বক্ষ হতে, তরঙ্গ চঞ্চল
প্রসারিত দিকে দিকে; শুভ্র ফেনরাশি
চিত্তে জাগে বুঝি তব স্নেহ মুগ্ধ হাসি
ক্ষরিছে আনন্দ ধারা। ছিনু প্রতীক্ষিয়া
অসীম আগ্রহভরে তোমার লাগিয়া।
ধীরে দিবা, পক্ষ, মাস গত হয়ে গেল
তব দরশনের পুণ্য লগ্ন নাহি এল।

অকরুণ ভাগ্য মোর তাই চলিলাম
রাখি পাদপদ্মে তব অসংখ্য প্রণাম।"

২৬শে ফাল্গুন, সোমবার।

আমি আজ মায়ের নিকট বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলাম।

বৃন্দাবনে দোলের উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রাসলীলা, গৌরাঙ্গ লীলা প্রভৃতি হইতেছে। বিভিন্ন স্থান হইতে লোক সমাগমও কম হয় নাই। মা, হরিবাবা, অখণ্ডানন্দজী, শরণানন্দজী প্রভৃতিকে শ্রৌতমুনির আশ্রমে নিয়া গেল। আমরা অনেকেই সঙ্গে গেলাম। সেখানেও উৎসব হইতেছিল। মা এবং হরিবাবা ঐখানে যাওয়াতে তাঁহারা খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

২৮শে ফাল্গুন, বুধবার।

খান্না বাবার অবস্থা খারাপ এই টেলিগ্রাম পাইয়া অবধূতজী খান্না চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি টেলিগ্রামে জানাইলেন যে ত্রিবেণীপুরী মহারাজ দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা সকলেই দুঃখিত হইলাম। এত বড় মহাত্মা সচরাচর দেখা যায় না। এবার হরিদ্বারে খান্না বাবার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার শিশুর মত ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই জন্য তাঁহার অভাবটা মনে খুব লাগিতেছে। একে একে সকল মহাত্মাই চলিয়া যাইতেছেন — দেবীগিরি মহারাজ চলিয়া গিয়াছেন, ত্রিবেণীপুরী মহারাজও গেলেন। বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়।

খান্না বাবার দেহত্যাগ

গত রাত্রিতে মা শুইয়া শুইয়া বলিলেন — "ছাখ দিদি, একজন বেশ একটা কথা বলছিল। কথাটা হল এই যে নিন্দাটা গোবরের মত। গোবর যদি এমনি পড়ে থাকে তবে তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই গোবরই যদি মাটির সঙ্গে মিশে সার হয় তবে তা গাছের গোড়ায় দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল এবং শস্য হয়। সেইরূপ নিন্দাটা যদি সাধক সহন করে নিতে পারে মানে গায়ে মেখে নিতে পারে তবে তাতে ফল ভালই হয়। জমি উর্ব্বরা হয় আর কি। তবেই ছাখ, নিন্দাটাও কত ভাল জিনিষ। নিন্দাটাও সেই একই ত।"

নিন্দা সহ্য করিতে পারিলে উপকারই হয়

মা বৃন্দাবনে কিছু দিন থাকিবেন জানিয়া নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এই জন্যই আমরা এখন বলিয়া থাকি যে মাকে কোথাও আনা হইল রাজরাজরার ব্যাপার। কারণ মা কোথাও গেলে লোকে কি ভাবে যে খবর পাইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হয় তাহা ধারণা করাও শক্ত।

দোলের দিন এখানে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। সন্ধ্যায় হরিবাবা এবং মা সৎসঙ্গে বসিয়া আছেন। দোল উৎসব উপলক্ষে সচরাচর ভক্তগণ মা এবং হরিবাবাকে মালা পরাইতে আসে। এই সময় লোকের ভিড় এবং ধাক্কা-ধাক্কিও খুব হয়। সেই জন্যই এবার হরিবাবা সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে একজন মাত্র মাকে একটি মালা পরাইতে পারিবে। হরিবাবাকেও কেহ মালা দিতে পারিবে না। তাঁহার সম্মুখে এক ছড়া মালা রাখিয়া দিলেই চলিবে। হরিবাবা জরির এক ছড়া মালা আনিয়া মাকে পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিলেন। আর এক ছড়া জরির মালা মনোহরের হাতে ছিল। মা তৎক্ষণাৎ ঐ মালার ছড়াটি নিয়া হরিবাবার গলায় পরাইয়া দিয়া একটু যেন

মাকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হইতে অভিন্নরূপে দর্শন

সঙ্কোচের সহিত বলিলেন — "বাবা, এখন আমাকে বকুনি দাও।" হরিবাবা একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। মনোহর হরিবাবার হাতে দুইছড়া মালা দিয়া বলিল — "ইহা মহাপ্রভুকে পরাইয়া দাও।" সৎসঙ্গের ঐখানেই মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দের মূর্ত্তি ছিল। হরিবাবা ঐ দুইছড়া মালা মায়ের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন — "এই আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।"

তারপর আরও দুই ছড়া মালা আনিয়া মনোহর মায়ের হাতে দিয়া বলিল, "মা, আপনি ইহা মহাপ্রভুকে পরাইয়া দিন। মা মালা দুইটি লইয়া মহাপ্রভুর বিগ্রহের কাছে গিয়া উহার একটি মহাপ্রভুর গলায় পরাইয়া দিলেন। পরে আবার ঐ মালাটি লইয়া নিজের গলায় পরিয়া নিজের গলার একটি মালা মহাপ্রভুর গলায় দিলেন। নিত্যানন্দের বিগ্রহের কাছে গিয়াও ঐরূপ করিলেন। পরে লম্বা হইয়া মাটিতে পড়িয়া এক গড়াগড়ি দিয়া উঠিলেন। পরে নিজের গলা হইতে ঐ মালা দুইটি খুলিয়া উহা হাতে করিয়া হরিবাবার কাছে গিয়া বলিলেন — "বাবা মহাপ্রভুর এবং নিত্যানন্দ প্রভুর প্রসাদী মালা আনিয়াছি তুমি ইহা নিবে না?" হরিবাবা সম্মত হইলে মা মালা দুইটি হরিবাবাকে পরাইয়া দিলেন। এই সময় মায়ের ভাবটাও যেন একটু অস্বাভাবিক ছিল। হরিবাবার ভক্ত ললিতা প্রসাদজী উপস্থিত ছিলেন। তিনি মায়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া পরে মনোহরকে বলিয়াছিলেন যে মায়ের ঐ অপরূপ মূর্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মাকে মহাপ্রভু হইতে অভিন্ন রূপেই দেখিয়াছিলেন। মাও আজ কথায় কথায় বলিয়া ফেলিলেন — "বাবা ঐ ভাবে এই শরীরটাকে মালা দেওয়ার পর এই শরীরের ভাবটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল।"

একদিন অবনীদাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আচ্ছা মা, লোকে যে

কীর্ত্তন করতে করতে জোরে ধ্বনি দেয় তার অর্থ কি?" মা বলিলেন —

কীর্ত্তনে উচ্চ ধ্বনি এবং সর্ব্বদা নাম করার অর্থ

"অর্থ আর কি, বাইরের ভাবগুলিকে সরিয়ে মনটা কীর্ত্তনের মুখে লওয়া আর কি।"

আবার একদিন বলিতেছেন — **"মিশ্রি মুখে রাখ। মিশ্রি মুখে রাখলে তার এমন গুণ যে মুখে জল আপনি বের হবেই, অর্থাৎ নাম নিতে নিতে নামে রুচি হবেই।"**

আবার বলিতেছেন — **"গুরু কৃপাই সব ইহা কিন্তু মনে রেখো।"**

মার শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছে। একজন গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া মাকে বলিতেছেন — "মা, তোমার শরীরটা খারাপ করিলে কেন?" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন — **"তুমি ত শুধু ঐ মেয়েদের** (অর্থাৎ নিজের মেয়েদের) **নিয়াই থাকবে, এই মেয়েটাকে ত দেখবে না, খোঁজ করবে না, তবে অসুখ হবে না ত কি?"**

এখানে সারাদিন হরিবাবার প্রোগ্রামেই কাটিয়া যায়। রাত্রিবেলা অনেক লোক আসিয়া মার কাছে বসেন। তখন নানা কথা হয়। এই-রূপ কথা বলিতে বলিতে অনেক রাত্রি হইয়া যায়। একদিন একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, — "মা আমার মনে সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু কি করিব তাহা ঠিক বুঝিতেছি না।" মা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন — "এই শরীরটার কাছে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলা হচ্ছে যে **সংসারে থেকেই শান্তভাবে ভজন করতে থাক। তবেই যাহা ছাড়বার তাহা ছেড়েই যাবে। আর যা কখনও ছাড়ে না, যায় না, তা' থেকেই যাবে।"**

১১ই চৈত্র, সোমবার।

আজ আমাদের বশিষ্ঠ গুহায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উড়িয়া বাবাজীর ভক্তদের অনুরোধে মা বৃন্দাবনে থাকিয়া গেলেন। আজ উড়িয়া বাবার তিরোধান তিথি। বৃন্দাবন আশ্রমের কাজও আজ হইতেই আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ করাইয়া ভিত্তি স্থাপন করা হইল। হরিবাবা, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, কৃষ্ণানন্দজী, মণ্ডির রাজা সাহেব এবং রাণী সাহেব, টিহরীর মহারাণী প্রভৃতির হাত দিয়া ভিত্তি স্থাপনের ইট দেওয়া হইল। যোগেন দাদাই এইসব ব্যবস্থা করিলেন।

বৃন্দাবন আশ্রমের কাজ আরম্ভ

১২ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

বেলা প্রায় ১২টার সময় আমরা মোটরে দিল্লী রওনা হইলাম। প্রায় ৩টায় আমরা দিল্লী আসিয়া পৌছিলাম। বেলা ৬টার সময় আমরা আবার গাজিয়াবাদ রওনা হইলাম। দেরাতুনের প্রকাশ নারায়ণের জামাতা হরপ্রসাদ মাকে ঐখানে যাইবার জন্য খুব অনুরোধ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় আমরা গাজিয়াবাদে পৌছিলাম। নারায়ণ দাসজী এবং ইঞ্জিনীয়ার খান্না নিজেদের মোটর নিয়া সস্ত্রীক মায়ের সঙ্গে আসিয়াছেন। এখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া রাত্রি ৯টার গাড়ী ধরিয়া আমরা হরিদ্বারে রওনা হইলাম।

আনন্দকাশী গমন

১৩ই চৈত্র, বুধবার।

আজ ভোর ৪॥টায় আমরা হরিদ্বারে পৌছিলাম। ষ্টেশনে যোগীভাই

আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি মাকে খড়্খড়িতে তাঁহার ধর্ম্মশালায় লইয়া গেলেন। তথায় আহারাদি করিয়া আমরা বেলা ১২টার সময় আনন্দকাশী রওনা হইলাম।

টিহরির রাজমাতা আনন্দপ্রিয়া আনন্দকাশীতে মায়ের জন্য বাসস্থান তৈয়ার করিয়া মাকে ঐখানে নিবার জন্য অনেক দিন হইতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। কেবল শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাই নহে আমাদের জন্যও খুব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা দেখিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন। মা যে ইঁহাদের কত প্রিয়জন তাহা ইঁহাদের সকল কাজেই ফুটিয়া উঠে। ইঁহাদের সাত্ত্বিক ভাবের ব্যবহার দেখিয়া কেহই প্রশংসা না করিয়া পারেন না।

আনন্দকাশী স্থানটি বড়ই মনোরম। হিমগিরির অঙ্গে এবং গঙ্গার তট-দেশে এই নির্জ্জন স্থানটি। নিকটেই একটি ঝরণা। ঝরণার জলের শব্দ অনন্ত নাদধ্বনির মত দিবারাত্রি চলিতেছে।

শ্রীঅবধূতজী মাত্র একদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। যাহাতে মায়ের জন্মোৎসব এবার খান্নাতে হয় তাহাই স্থির করিয়া গেলেন। ঐ সময় খান্নার বাবার জন্য ভাণ্ডারাও দেওয়া হইবে।

১৮ই চৈত্র, সোমবার।

আজ শ্রীবাসন্তী পূজার ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। সকালে মা বিছানায় থাকিয়াই বলিতেছেন — "দেখছিলাম দুর্গা পূজা হচ্ছে, প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মা বেড়াইয়া আসিয়া নিজের কুটীরখানির কাছে পায়চারি করিতেছেন। পরমানন্দ স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গে আছেন। একটু পরে

স্বামীজী আসিয়া আমাকে বলিলেন — "দিদি, মা নাকি স্বপ্নে দেখেছেন যে তিনি আপনার এবং আমার হাটু ও উরুতে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।" আমি তখনই মাকে গিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা হাসিয়া বলিলেন — "হ্যাঁ, তখন ত দুর্গাপূজা, প্রসাদ বিতরণ এইসব বলেছিলাম। সব কথা তখন বলা হয়নি। তখন দেখছিলাম যে তুই শুয়ে আছিস, তোর হাটুর উপরে ও নীচে এই ভাবে হাত বুলিয়ে ও টিপে টিপে দেওয়া হচ্ছে।" এই বলিয়া নিজের হাটুতেই ঐরূপ করিয়া দেখাইলেন। তারপর আবার বলিলেন — "পরমানন্দকেও দেখলাম শরীরটা ছোট। চ্যাক্‌ভ্যাকের মত শুয়ে আছে। তারও হাটু এবং হাটুর উপরে ও নীচে এইরূপ হাত বুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

স্বপ্নে মা কর্ত্তৃক দিদির ও পরমানন্দজীর সেবা

১৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

আজ বাসন্তী পূজার সপ্তমী। নবরাত্রির প্রথম দিনই আমরা এখানে আসিয়াছি। নূতন যে শিবমন্দির হইয়াছে মা কমলাকান্তকে দিয়া ঐখানে ঘট স্থাপন করাইয়াছেন। তাহাকে দিয়া ঐখানকার শিবলিঙ্গের পূজা এবং চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থাও করাইয়াছেন। পূজার কয়দিন ভোগের ব্যবস্থাও মা-ই করিয়াছেন।

আজ হঠাৎ মায়ের পেটটা বেশ খারাপ হইল। কতকটা অমাশয়ের মত। মা বলিলেন — "গ্যাখ্, দিদি, বৃন্দাবনেই এইরূপটা হয়েছিল। তখন খেয়াল হয়েছিল যে হরিবাবার উৎসবের জন্যই ঐখানে থাকা হল এই সময় অসুখ হলেত বাবার প্রোগ্রামে ঠিকমত যাওয়া হবে না। তাই অসুখকে বলা হল 'এখন থাক পরে হবে', তাই তখন ভাল হয়ে গেলে। এখন আবার হয়েছে।" মায়ের কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম।

মায়ের ইচ্ছানুসারে রোগ গ্রহণ ও ত্যাগ

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও আনন্দ কাশীতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যা বেলা আমরা যখন সকলে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলি তখন তিনিও আমাদের মধ্যে আসিয়া বসেন। আজও কীর্ত্তনাদির পর কথাবার্ত্তা হইতেছে। মা ইহার মধ্যেই ৮।৯ বার পায়খানায় গেলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহার ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন নাই। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য সকলে উঠিয়া গেলেন।

আমি মায়ের কাছে বসিয়া মায়ের শরীরে একটু হাত বুলাইয়া দিতেছি মা শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া বলিতেছেন — "দেখছি কি একজন বৃদ্ধা। চুলগুলি পাকা পাকা। শিবমন্দিরের কাছে গিয়ে ঘরের মধ্যে একটু উকি দিয়া দেখল পরে হাত জোড় করে প্রণাম করল। তারপর সে একটু যেন এগিয়ে এল।" আমার জিজ্ঞাসায় মা উত্তর দিলেন — "হয়ত রাজ পরিবারেরই কাউকে দেখছি।" তারপর মা আমাকে একটা কথা বলিয়া উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম — "আমি ত ইহার অর্থ জানি না। কাল আনন্দ প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করব।" মার কথায় বুঝিলাম যে ঐ কথাটি বৃদ্ধাই বলিয়াছিলেন। আর কিছু মা বলিলেন না।

স্বপ্নে টিহিরীর রাজমাতার শাশুড়ীকে দর্শন

২০শে চৈত্র, বুধবার।

আজ সকালে রাজমাতা মার দর্শনে আসিতেই আমি তাঁহাকে গত রাত্রির ঘটনা বলিয়া কাল মা যে কথাটি বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে উহা নেপালী ভাষা। অর্থ হইল — "এখন আমি যাই।"

পরে বৃদ্ধার চেহারা মা নিজে বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন — "ইনি বোধহয় আমার শাশুড়ী হইবেন।" মা হাসিয়া বলিলেন — "হাঁ তোমার শাশুড়ীই।" মা বৃদ্ধার পাকা চুল দেখিয়াছিলেন। রাজমাতা বলিলেন — "আমার শাশুড়ী যখন মারা যান তখন তাঁহার চুল পাকা ছিল না। তবে এত দিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার চুল পাকাই হইত।"

আজও সন্ধ্যায় সকলে বসা হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ও আছেন। রাজ পরিবারের কেহ কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে অনেক কথা হয়। আজ কথায় কথায় সকলকে প্রণাম করা উচিত কি না এই কথা উঠিলে মা বলিলেন — "যাহাকে প্রণাম করা হয় তাহার দোষগুণ যে প্রণাম করে তাহার মধ্যে সংক্রামিত হয়। আবার যে প্রণাম করে সে যদি শক্তিশালী এবং যাহাকে প্রণাম করা যায় সে যদি তেমন না হয় তবে সে ঐ প্রণাম গ্রহণ করিয়া সহ্য করিতে পারে না।"

প্রণামের ফল গুণের আদান প্রদান

রাজমাতা — "আচ্ছা মা, কাহারও উপর যদি বিশেষ প্রেম হয় তবে তাহা কি খারাপ ?"

মা — "দেখ, যে ভালবাসায় ভগবানের স্মৃতি জাগায় তাহা ভাল। তাহা ছাড়া যাহাকে প্রেম বল তাহা প্রেম নয়, মোহ। যাহা ভগবানকে ভুলাইয়া দেয় তাহা মোহ। এইজন্যই বলা হয় যে সংসারে যাহাদের নিয়া থাকিতে হইবে তাহাদের মধ্যেও ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা কর। মনে করিতে হয় যে তিনিই এইরূপে আমার কাছে আছেন। এইরূপ করিলে আর বন্ধনের কারণ হয় না।"

প্রেম ও মোহ

২৬শে চৈত্র, মঙ্গলবার।

মায়ের সহিত আনন্দকাশীতে আমরা বেশ আনন্দেই আছি। সঙ্গে প্রায় ২০।২২ জন। টিহরীর রাজপরিবারেরও অনেকে আসিয়াছেন। বিকালে মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াই। কখনও বা গঙ্গার ধারে গাছ তলায় বসিয়া থাকি।

২৮শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

আনন্দকাশীতে ১৫ দিন থাকিয়া আজ বেলা ১০॥০টার সময় আমরা মোটরে দেরাদুন রওনা হইলাম। আবার সন্ধ্যার গাড়ী ধরিয়া আমরা কাশী রওনা হইলাম।

১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫৯ সন।

মুক্তি মহারাজকে দেখিবার জন্য মা আজ কলিকাতা রওনা হইলেন। মার সঙ্গে আমরা সামান্য কয়েকজন।

২রা বৈশাখ, মঙ্গলবার।

কলিকাতায় পৌছিয়া মা এবার গঙ্গাচরণদাদা ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের বিশেষ আগ্রহে তাঁহাদের বাসায় উঠিলেন। বাগানে একটি নূতন ঘর করা হইয়াছে। মা সেখানেই থাকিবেন।

৫ই বৈশাখ, বুধবার।

কলিকাতায় তিন রাত্রি থাকিয়া মা আজ ভোরে পুরী আসিয়া

পৌছিয়াছেন। আশ্রম বাড়ীটি দোতলা করা হইয়াছে। মা এবার আসিয়া উপরেই রহিলেন।

১৭ই বৈশাখ, সোমবার।

পুরীতে তিনদিন, কলিকাতায় পুনরায় তিনদিন এবং কাশীতেও তিনদিন থাকিয়া আজ মায়ের সঙ্গে আমরা পাঞ্জাবের দিকে রওনা হইলাম।

১৮ই বৈশাখ, মঙ্গলবার।

আজ প্রাতে আমরা খান্নায় আসিয়া পেঁাছিলাম। এই স্থানটি লুধিয়ানা হইতে কিছু দূরে। এখানে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে মায়ের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম যে এই বিদ্যালয় নাকি ত্রিবেণী পুরীজীই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এবার এখানেই মায়ের জন্মোৎসব হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং এখানকার সমস্ত ব্যবস্থাই অবধূতজী করিতেছেন।

২০শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

শেষ রাত্র হইতে মায়ের জন্মোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গতকালই আবার বাবা ভোলানাথের তিরোধান উৎসব ছিল। ঐ উপলক্ষ্যে সাধুদের ভাণ্ডারা দেওয়া হইল।

সকাল হইতে অখণ্ড কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ইহা উৎসবের ১২ দিন চলিবে। অবধূতজী হরিদ্বার হইতে পণ্ডিত আনয়ন করিয়া শত চণ্ডী পাঠও আরম্ভ

করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও চলিতেছে। মোহন গিরি এবং স্বরূপানন্দ গিরি এই দুই জন মণ্ডলেশ্বরও এই উৎসবে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন।

২৩শে বৈশাখ, রবিবার।

মায়ের জন্মোৎসবের সঙ্গে ত্রিবেণী পুরীজীরও তিরোধান উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর অবধূতজীর ব্যবস্থা মত একটি মন্দির হইয়াছে এবং ঐ মন্দিরে পুরীজীর মূর্ত্তি এবং পাদুকা স্থাপন করা হইয়াছে। সমস্ত বন্দোবস্ত অবধূতজীই করিতেছেন। ইনি নিষ্কিঞ্চন সাধু, বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। অথচ নিখুঁত ভাবে সেবা কার্য্যেও ইনি পারদর্শী।

আজ সকাল বেলা পাঠের সময়ই মা আমাদের সকলকে নিয়া ত্রিবেণী পুরীজীর সমাধি মন্দিরে গেলেন। আমি পুষ্পমাল্য, ফল, চাদর ও গীতা বাবার সমাধিস্থানে স্থাপন করিয়া পূজা এবং আরতি করিলাম।

২৮শে বৈশাখ, শুক্রবার।

আজ অবধূতজী আমাদিগকে এবং মাকে গঙ্গাসর নামে একটি কূয়া দেখাইতে লইয়া গেলেন। এই কূয়াটি খনন করিতে গিয়া ত্রিবেণী পুরীজী নাকি ইহার মধ্যে অনেক কিছু পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে অনুমান করা হইয়াছে যে ঐ স্থানটি বোধ হয় কোন সাধুর সমাধি ক্ষেত্র। এই কূয়ার জলকে ত্রিবেণী পুরীজী গঙ্গা জলের মত পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। আমরা কূয়ার ধারে গেলাম। পরমানন্দজী জলও উঠাইলেন। মায়ের ইচ্ছানুসারে আমি হাতে করিয়া ঐ

গঙ্গাসর কূয়া পরিদর্শন

জল মাকে খাওয়াইয়া দিলাম। যোগীভাই সহ আমরাও ঐ জল পান করিলাম। জল চমৎকার লাগিল। মা কূয়ার ভিতরের দিকে মুখ করিয়া 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলিয়া ফিরিবার সময় কূয়াটিকে প্রদক্ষিণের মত করিয়া চলিলেন।

ইহার পর অবধূতজী মহারাজ মাকে গঙ্গোত্রী মাঈর বাড়ী লইয়া চলিলেন। এইখানেই ত্রিবেণী পুরীজী প্রায় ৪০ বৎসর কাটাইয়া গিয়াছেন। কূয়ার অনতিদূরেই ঐ বাড়ীটি। বাড়ীখানি ছোট। বাবা যে ঘরটিতে থাকিতেন উহা অতি ছোট। কতকটা গুহার মত। উহার পার্শ্বের কুঠরিতে গঙ্গোত্রী মাঈ থাকেন। বাড়ীর উঠানটিও খুব ছোট। উঠান পার হইয়া বাহিরে আসিলেই সাধারণ গৃহস্থদের ঘর বাড়ী। এ সকল বাড়ী ঘরও বেশ নোংড়া। চারিদিকেই ছেলে পেলেরা পায়খানা করিয়া রাখিয়াছে। এতবড় একজন মহাত্মা এইরূপ স্থানে কি করিয়া যে ৪০ বৎসর কাটাইলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধহয়। পশ্চাতে কি রহস্য আছে তাহা কে বলিবে? শুনিতে পাইলাম যে গঙ্গোত্রী মাঈর এক ছেলে ছিল। ছেলেটি যখন মারা যায় তখন গঙ্গোত্রী মাঈ শোকে অধীর হইয়া ত্রিবেণীপুরী বাবাকে বলেন — "বাবা, তুমি থাকিতে আমার এই ছেলের মৃত্যু হইল?" কথা শুনিয়া ত্রিবেণী পুরী নাকি বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজের জীবন দিয়া ঐ ছেলেকে বাঁচাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে গঙ্গোত্রী মাঈ বলিয়াছিলেন — "না, বাবা, তুমিই বাঁচিয়া থাক। আমার ছেলের জীবন আমি চাই না। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে কত লোকের উপকার হইবে।" সেই সময় হইতেই ত্রিবেণীপুরী বাবা গঙ্গোত্রী মাঈর নিকট থাকিয়া যান এবং গঙ্গোত্রী মাঈও প্রাণ ঢালিয়া প্রায় ৪০ বৎসর বাবার সেবা করিয়াছেন।

ত্রিবেণীপুরী মহারাজের বাসস্থানে মা

২৯শে বৈশাখ, সোমবার।

আজ শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজা। দুপুরে শত চণ্ডী শেষ হইল। নয়টি কুমারী এবং একটি বটুক ভৈরবকে পূজা করিয়া ভোজন করান হইল। এই সব পূজাদিতে বেলা প্রায় ২টা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যার পর হইতেই অবধূতজী মায়ের পূজার যোগার করিতে লাগিলেন। একখানা চৌকির উপর মায়ের বিছানা পাতিয়া উহা সহস্রাধিক ফুলের মালা দিয়া সাজাইলেন। পরে পূজার জায়গাটিও ফুল পাতা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজাইলেন। সমস্তই তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া করাইতেছেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আতসবাজি পোড়ান আরম্ভ হইল। শুনিলাম ইহাও অবধূতজীর ব্যবস্থা মতই। ইহার পরে মাকে পূজার স্থানে যাইবার জন্য অবধূতজী বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে অবধূতজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মাকে চৌকির উপর বসিতে বলা হইল। মা কাঠের পুতুলের মত বসিলেন। অবধূতজী নিজেই মায়ের পূজায় বসিয়া গেলেন। চারিদিকে পূজার যাবতীয় দ্রব্য এবং ৫৬ পদের মিষ্টি ভোগ স্তরে স্তরে সাজান আছে। হরিদ্বারের চারজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও বাটুদা বৈদিক ও তান্ত্রিক মত মিলাইয়া অবধূতজীকে দিয়া মায়ের পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। চারিদিকে অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ। পূজা প্রায় রাত্রি ৩৷৷টা পর্য্যন্ত চলিল। মা অবধূতজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইতিমধ্যে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। প্রস্তর মূর্ত্তির মত এই দীর্ঘ সময় মা একইভাবে পড়িয়া রহিলেন। পূজা শেষ হইলে অবধূতজী মাকে আরতি করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। তখন বিশু মায়ের তিথি পূজায় বসিল। মায়ের তিথি পূজা শেষ রাত্রিতেই হইয়া থাকে। বাটুদাদা স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা এবং অন্যান্য সকলে 'মা' নাম কীর্ত্তন

অবধূতজী কর্ত্তৃক মায়ের পূজা

করিতেছে। পূজা শেষ হইতে প্রায় ভোর হইয়া গেল। ছেলেরা উষা কীর্ত্তনে বাহির হইয়া ত্রিবেণীপুরীজীর সমাধি মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। মাকে পূজার স্থান হইতে উঠাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। মায়ের মুখের ভাব তখন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। দিব্য এক জ্যোতি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মা গিয়া পাথরের মত শুইয়া রহিলেন।

৩০শে বৈশাখ, মঙ্গলবার।

শেষ রাত্রে পূজার সময় একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল। তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি —

রমা দিদি এবং তাহার ছেলে বীর কিছুদিন যাবৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। ছেলেটি এম, এ পড়ে। সে অবধূতজীর নিকট গিয়া বলিয়াছে যে অবধূতজী যখন পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন তখন বীর দেখিতে পাইল যে চৌকির উপর মা যেমন নিস্পন্দ ভাবে শুইয়া ছিলেন তেমনই আছেন। কিন্তু মায়ের আর একটি মূর্ত্তি অবধূতজীর পরিত্যক্ত আসনের উপর দাঁড়াইয়া চৌকির উপর শায়িত মায়ের দিকে চাহিয়া আছে। ইহা চোখের ভ্রম কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সে বার বার চোখ রগড়াইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু প্রতি বারই সে এই এক দৃশ্যই দেখিতে লাগিল। মাকে এই দুই মূর্ত্তিতে একসময় দেখা সম্ভব কি না তাহা জানিবার জন্য সে অবধূতজীর কাছে গিয়া তাহার দর্শনের কথা বলিল। এই দর্শনের কথা আমরা অবধূতজীর নিকট হইতেই প্রথম শুনি পরে বীরের নিকটও ইহা শুনিয়াছি।

একই সময় দুই মূর্ত্তিতে মাকে দর্শন

অবধূতজী আজ যে ভাবে মায়ের পূজা করিলেন তাহাতে মায়ের প্রতি

যে তাঁহার অগাধ ভক্তি বিশ্বাস তাহারই পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁহার মত একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ বেদান্তবাদীর পক্ষে সর্ব্বসমক্ষে মাকে এই ভাবে পূজা করা বড় সহজ কথা নয়। কতটা ভক্তি এবং বিশ্বাসের জোর থাকিলে এরূপ করা যায় তাহা সকলেরই বিবেচনার যোগ্য। তিনি কি ভাবে মায়ের সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছেন এ কথা আমরা তাঁহার নিকটই শুনিয়াছি। তিনি প্রকাশ্য সভার মধ্যে বলিয়াছেন — "আমি যখন প্রথম মাকে দেখি তখন শুনিলাম যে পরমানন্দ স্বামী মার সঙ্গে বহু দিন যাবৎ আছেন। পরমানন্দ আমাদের সঙ্গে উত্তর কাশী ও গঙ্গোত্রীর দিকে অনেক দিন ছিলেন। বেশ বিরক্ত সাধু। তাঁহাকে ঐ ভাবে মায়ের সঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিতই হইয়াছিলাম। এই সময় মা সহস্রধারায় (দেরাদুনে) ছিলেন। অভয়ও সঙ্গে ছিল। আমি পরমানন্দ স্বামী এবং :অভয়কে একান্তে ডাকিয়া নিয়া মায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহা দ্বারা আমি মায়ের প্রতি প্রথমেই বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম না।

মায়ের প্রতি অবধূতজীর আকর্ষণের কারণ

"ইহার পর আর একবার আমি রায়পুর আশ্রমে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। এই সময় মাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আমি সুযোগ পাই। এই সময় রায়পুরে একজন সাধু কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া আসিল। সাধুটিকে সাধারণ সাধু বলিয়াই মনে হইল। সে আসিয়াই মায়ের দিকে পেছন ফিরিয়া বসিল। তারপর মার সম্বন্ধে নানারূপ অশ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি করিতে লাগিল। উহা শুনিয়া মায়ের উপস্থিত ভক্তেরা ত চটিয়া উঠিলেন। কিন্তু মার দিকে চাহিয়া দেখি তিনি নির্ব্বিকার। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইতেছে তাহা যেন তিনি কিছুই শুনিতেছেন না। অধিকন্তু উত্তেজিত ভক্তদিগকে হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন — "তোমরা ঐ সাধুকে কিছু বলিতে পারিবে না।

সর্ব্বরূপেত একমাত্র তিনিই আছেন। এও যে তাঁহারই এক রূপ।" মায়ের আনন্দঘন মূর্ত্তি দেখিয়া এবং ঐ কথা শুনিয়া আমার চোখ খুলিয়া গেল। ভাবিলাম ইহা ত সহজ ব্যাপার নয়। বড় বড় কথা ত অনেকেই বলিতে পারে। কিন্তু কাহারও যদি সামান্যও অভিমান থাকে তবে সে অপরের নিকট হইতে অপমানকর কথা বা ব্যবহার সহ্য করিতে পারে না। আর এখানে দেখিতেছি মা সাধু বেশধারী একজন সাধারণ লোকের অপমানজনক কথাও হাসিমুখে নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। অথচ এই মায়ের প্রভাবই আজ ভারতবর্ষব্যাপী। কেবল ভারতবর্ষ কেন? পাশ্চাত্য দেশের কত লোকেই না মাকে শ্রদ্ধা করে। মায়ের ঐ ভাব দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তখনই আমার মনে হইল এমন আর একটি ত কখনও দেখি নাই।"

আজই আমরা জলন্ধরে রওনা হইয়া আসিলাম। মাকে আনিবার জন্য রামভাই, লছমনভাই এবং শত্রুঘ্নভাই গিয়াছিল। তাহাদের পিতাও সঙ্গে ছিলেন। জলন্ধরে আসিয়া গোপালদাদা এবং যোগীভাই স্থানটির খুব প্রশংসা করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলিলেন যে স্থানের শুদ্ধ প্রভাব এবং সাত্ত্বিক ভাব যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়।

২রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

জলন্ধরে তিন রাত্রি থাকিয়া মাকে লইয়া আজ আমরা হোসিয়ারপুর রওনা হইলাম। ঐখানে যাইবার জন্য হরিবাবা পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতে ছিলেন। নিতে লোকও আসিয়াছিল। অবধূতজী পূর্ব্বেই আমাদের জন্য

সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানেও খুব আনন্দ হইল। এবার শুধু হোসিয়ারপুরেই নহে, খান্না, জলন্ধর সকল স্থানেই মা যেন সর্ব্বসাধারণের অতি আপনজন হইয়া গিয়াছেন। মাকে পাইবার জন্য, মার কাছে একটু যাইবার জন্য, মাকে একটু স্পর্শ করিবার জন্য সকলে যেন পাগল।

৩রা জৈ্যষ্ঠ, শনিবার।

আজ আবার আমরা জলন্ধরে ফিরিয়া আসিলাম এবং আজ রাত্রেই আমরা সোলন রওনা হইলাম।

৫ই জৈ্যষ্ঠ, সোমবার।

সোলন হইতে যোগীভাইর সঙ্গে আজ মা সিমলা আসিয়াছেন। অনেক-দিন হয় যোগীভাই এখানে একটি নূতন বাড়ী করিয়া রাখিয়াছেন। মাকে নিয়া গৃহপ্রবেশ করিবেন বলিয়াই এতদিন উহা ব্যবহার করা হয় নাই। আজই মাকে নিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। এ বাড়ীটা পাহাড়ের অতি উঁচু জায়গাতে। ইহার নীচেই যোগীভাইদের পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ী। সেই বাড়ীতেই মায়ের সঙ্গীয় সকলের থাকিবার জায়গা করিয়া দিলেন। স্থানটির সৌন্দর্য্যে এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইলাম।

৭ই জৈ্যষ্ঠ, বুধবার।

আজ সকালবেলা মা বলিতেছেন — "দেখছিলাম যে অবধূতজী

যেন (দক্ষিণ বাহু মূল দেখাইয়া) এই স্থানটা ধরে ভয়ানক কাঁদছে। এই শরীরটা বলছে — 'তুমি সন্ন্যাসী ত্যাগী, তুমি কাঁদবে কেন ? শান্ত হও।' এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া হাতটা সরিয়ে নেওয়া হইল। হাতের স্পর্শটা এমনই স্পষ্ট যে এখনও যেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর অবধূতজী বলছে — 'না, না, আমি কিছুই না।' বিনয়ের ভাবেই কথা গুলি বলছে। পরমানন্দও সেইখানে দাঁড়িয়ে। পরমানন্দ অবধূতজীর ঐ ভাব লক্ষ্য করছে। কিন্তু তার কোনও রকম অস্বাভাবিক ভাব আসছে না।"

স্বপ্নে অবধূতজীকে দর্শন

৮ই জৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

আজ সকালে মা তখনও শুইয়া আছেন। বিমলাকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে মা উঠিলেই যেন আমাকে খবর দেওয়া হয়। একটু পরে বিমলা আমাকে গিয়া বলিল যে মা সুন্দর গান করিতেছেন। তাহার কথা শুনিয়া আমি ছুটিয়া মার কাছে গেলাম। গিয়া দেখি মা যেন তন্ময় হইয়া গাহিতেছেন —

বিরহের গান

"আও মেরে সলোনা ছলিয়া রে, বনোয়ারী রে।
আও মেরে সলোনা ছলিয়া রে।"

এই পদটি বার বার এমন করুণ ও মধুর স্বরে গাহিতেছেন যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চক্ষু বুজিয়া বুজিয়া গাহিতেছিলেন। কি যে অপূর্ব্ব সুর! শুনিলে দেহ মন প্রাণ যেন শুদ্ধ হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ গান করিয়া মা বলিলেন — "কেউ গাইছে শুনলাম। গোয়ালিনীদের গান আর কি।" এই বলিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন।

একটু পরে বলিলেন — "সুরটা তোরা রেখে দে। বিভুকে ডাক। তার কাছে সুরটা রেখে দেই।"

মা মগ্ন হইয়া তখনও বার বার ঐ পদটিই গাহিতে লাগিলেন। একটু পরেই বিভু আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তাহাকে সুরটা ধরিয়া লইতে বলিলেন। বিভু কিছুক্ষণ মার সঙ্গে সঙ্গে গাহিল; কিন্তু ঠিকমত যেন গাহিতে পারিতেছে না। অনেক চেষ্টার পর তাহার কতকটা যখন ঠিক হইয়া আসিল তখন মা গান বন্ধ করিয়া চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মা বলিলেন — "ভ্যাখ, এ সব সুক্ষ্মের সুর। এই জগতের আবহাওয়ায় আসিলেই বিলীন হয়ে যায়। এখানে ঐ সুর রাখা মুস্কিল।" আমি বলিলাম — "বিভুর কাছে যখন তোমার ঐ সুর রাখবার খেয়াল এসেছে তখন হয়ত আবার আসবে। মাকে আবার গানটা গাহিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু দেখা গেল যে মারও তখন ঐ গান আর আসিতেছে না। মা বলিলেন — স্বাভাবিক ভাবে না আসলে এইভাবে আসবে না।" বিভুও চেষ্টা করিয়া আর ঐ সুরটি আনিতে পারিল না।

বেলা ১০টার পর সৎসঙ্গ শেষ হইলে অবধূতজী মাকে ঐ গান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন যে মা নাকি এক অপূর্ব্ব সুরে আজ সকাল বেলা গান করিয়াছেন। বিভু ঐ সুরে গানটি গাহিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। মা বলিলেন — "হাঁ, ঐ সুর স্বাভাবিক ভাবে না আসিলে চেষ্টা করিয়া আনা যাইবে না। আর গানের পদটি শুনিলে মনে হয় যে শ্রীমতী রাধা একান্তে বসিয়া মগ্ন হইয়া তাহার প্রিয়তমকে ডাকিতেছে। দিদিত শুনিয়া প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বলিতেছিল, 'কোন দেশী ভাষা বলিতেছ?' দিদির আবার একটু একটু ভয় আছে যে মা যাহা বলে তাহা যদি সকলে বুঝিতে না পারে তবে তাহারা না জানি মাকে কি মনে

করবে ?" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

অবধূতজী গানের পদটি শুনিয়া বলিলেন — "ইহা অতি চমৎকার ব্রজভাষা। বড়ই আদরের ভাষা। বনওয়ারী শব্দের অর্থ হইল যিনি বনে বনে লীলা করেন অর্থাৎ বনবিহারী। সলোনা শব্দের অর্থ হইল অতি রমণীয়, মধুর, মনোহর। আর 'ছলিয়া রে' ইহাও ভালবাসার কথা। ছলিয়া, ছিলা, অর্থ সুকুমার। ইহা অতি আদরের ব্রজবুলি।"

আজ সকাল বেলা মা আরও কিছু স্বপ্নে দেখিয়াছেন। সেই সম্বন্ধেও মা বলিলেন — "দেখিতেছিলাম এক স্থানে সকলে রান্না বান্না করিতেছে। স্থানটি বোধ হয় বৃন্দাবনই হইবে। এ শরীরটাও দুধ, সিমাই এবং আরও কি কি যেন মিশাইয়া একটা খাবার তৈয়ার করিয়াছে। ঐ খাবারের সঙ্গে মালপোয়াও হইয়াছে। সকলে খাইতে বসিয়াছে। বৃন্দাবনের যোগেন বাবুর ভাই (যে আগ্রা হইতে এবার বৃন্দাবন আসিয়াছিল) সেও সকলের সঙ্গে আছে। অবধূতজীও সকলের সঙ্গে বসিয়া খাইতেছে। সে তাড়াতাড়ি খাইয়া পাতা গুটাইয়া উঠিতেছিল। তাহা দেখিয়া এ শরীরটা বলিল 'ঐ খাবারের জিনিষটাত দেওয়া হইল না।' উহা শুনিয়া অবধূতজী বলিল, "না, না, আর কিছু খাইব না।" এই বলিয়া সে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। উহা দেখিয়া তখন এই শরীরটা দিদিকে বলিল — "দেখ এ যেন মহাবীরের মত চলিল। ইহার খাইবার এবং চলিবার ভাবটাও ঐ রকমই।" অবধূতজীর সম্মুখেই মা হিন্দিতে এই সব কথা বলিলেন।

স্বপ্নে অবধূতজীকে দর্শন

রাত্রি প্রায় ১০টায় আমরা সকলে মার কাছে বসিয়া আছি। অবধূতজী এবং গোপাল দাদাও আছেন। বাহিরের লোক যাহারা আসিয়াছিলেন

তাহারা অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। বিভু আবার মার কাছে ঐ গানটি গাহিতে বসিয়াছে। আজ সারা দিনই সে গানটি ঠিক ভাবে গাহিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। এইবার দেখা গেল যে তাহার কতকটা ঠিক হইয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে মাও বলিয়া দিতেছেন। এইরূপ দেখাইতে দেখাইতে মা নিজেই আবার গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গোপালদাদা এবং অবধূতজী নিমীলিত নেত্রে উহা শুনিতেছেন। দুই চারি বার ঐ পদটি গাহিয়াই মা "কৃষ্ণ কানাইয়া বংশী বাজাঁইয়া" গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ গাহিয়াই মা নীরব হইলেন। অবধূতজী চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। স্থানটি তখন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে যেন পূর্ণ!

গভীর রাত্রিতে তখন বোধহয় ১টা কি ১।৷টা হইবে মা আবার ঐ গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এবার আর পূর্ব্বের সুরে গানটি আসিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন — "অবধূতজীও যখন বলছে যে কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে রাধা এই গান করছে তখন এর নাম দেওয়া যাক 'শ্রীরাধার পুকার' মানে শ্রীরাধার ডাক।" মা আবার বলিলেন — "শুধু এই সুরের দিকেও যদি কাহারও বিশেষ খেয়াল থাকে তাহলেও বিশেষ শুভ ফল হবে।"

একদিন মাকে এখানকার কালীবাড়ীতে নিয়া গেল। সেখানে কীর্ত্তনাদি হইল। সকলে অবধূতজীকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই। বিষয়টি খুবই সুন্দর। তাই উদ্ধৃত করিতেছি —

সিমলায় কালীবাড়ীতে অবধূতজীর বক্তৃতা

সংসারী জীবের মনে প্রায়ই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে তাহাদের কি ভাবে জীবন যাপন করা উচিত, কি করিলে সংসারের
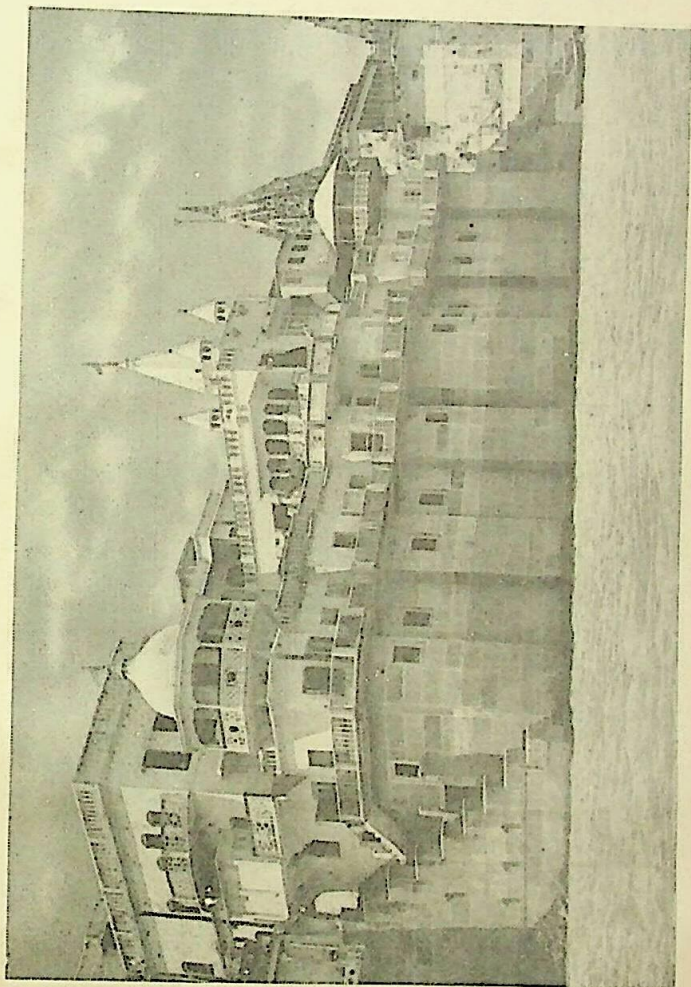
গঙ্গাবক্ষে কাশী আশ্রম

জ্বালা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প আছে। একবার নারদ শিবজীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজীর সহিত নানা কথা হইতে লাগিল। কথায় কথায় শিবজী নারদকে বলিলেন — "দেখ নারদ, সুখ দুঃখ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত তবে বোধ হয় আমার মত দুঃখী আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাইতাম না। কারণ আমি যাহাদের লইয়া ঘর সংসার করি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই আছে। আমার ভগবতীর বাহন হইল সিংহ আর আমার পুত্র গণেশের মুণ্ডটি হইল হস্তির। কোনদিন যে সিংহ ক্ষুধার জ্বালায় দিগ্‌বিদিগ্‌ শূন্য হইয়া আমার পুত্রের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা নাই। আমার নিজের গলায় সর্প আর আমার পুত্র কার্ত্তিকের বাহন হইল ময়ুর। ইহাদের মধ্যেও খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। তাহা ছাড়া আমার আবার দুই পত্নী — ভগবতী এবং গঙ্গা। ইহাদের বিরোধ ত লাগিয়াই আছে। কাজেই দেখিতে পাইতেছ যে আমার পরিবারস্থ কাহারও মনে শান্তি নাই। আমি যদি সুখ দুঃখের অতীত না হইতাম তবে আমাকেও সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করিতে হইত।"

শিবজীর নিকট বিদায় লইয়া নারদ ঘুরিতে ঘুরিতে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে নারদ শিবজীর নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন সেই সব কথা বলিলেন। উহা শুনিয়া বিষ্ণুও বলিলেন — "আমারও ত সেই অবস্থা। আমিও যদি নিজে সুখ দুঃখের অতীত না হইতাম তবে আমার মত দুঃখীই বা কে? কারণ আমার পত্নী হইলেন কমলা। তিনি সদাই চঞ্চলা। কখন যে তিনি কাহাকে অনুগৃহীত করিবেন তাহা কে বলিতে পারে। যাহার পত্নী এইরূপ তাহার মনে কি সুখ থাকিতে পারে?"

শিবজী এবং বিষ্ণুর কথা শুনিয়া নারদ ভাবিতে লাগিলেন যে শিব আর বিষ্ণুরই যদি সংসারিক জীবন এই তবে জাগতিক জীবের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে

পারে ? জীবের শান্তি লাভের উপায় কি ? কি করিলে জীব সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতে পারে ? এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নারদ চলিতে আরম্ভ করিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঐ বিষয়ে একটা সমাধান পাইয়া গেলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে জীবের দুঃখের কারণ হইল মমত্ব বোধ। জীব সংসারের প্রত্যেক জিনিষকেই নিজের বলিয়া ভাবে এবং ঐ সকল জিনিষের অভাব হইলেই তাহার দুঃখ উপস্থিত হয়। সে যদি নিজকে ভগবানের সেবক বলিয়া মনে করিতে পারে, ভগবৎ জ্ঞানে সে যদি সকলেরই সেবা করিয়া যাইতে পারে তবেই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। নিজকে ভগবৎ চরণে এবং ভগবৎ সেবায় সমর্পণ করিতে পারিলেই লোক সংসারে থাকিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারে।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

আমরা আজ সোলন রওনা হইলাম। সোলনে মায়ের কিছুদিন থাকার কথা হইয়াছে। এই খবর পাইয়া নানা স্থান হইতে ভক্তেরা সোলনে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। আমরা মায়ের সঙ্গে প্রায় ৫০।৬০ জন লোক আছি।

১০ই আষাঢ়, মঙ্গলবার।

মা সোলনে প্রায় ২৫ দিন হয় আছেন। সকলেই বেশ আনন্দে আছে। তবে ৪।৫ দিনের মধ্যেই মার অন্যত্র যাইবার কথা। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারী মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলিতেছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা

আমি মায়ের পার্শ্বের ছোট ঘরটিতে কিছু লেখা পড়া করিতেছিলাম। প্রাইভেট করিয়া চলিয়া গেলে আমি মায়ের ঘরে আসিলে মা বলিলেন — "দিদি, আজ একটা ঘটনাই হয়েছে। ও

এসে জিজ্ঞাসা করছিল যে কি ধ্যান করবে ? ও ত দেবীগিরি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। এই শরীরের খেয়াল হচ্ছিল যে ওকে সেই অনুযায়ীই কিছু বলে। ও আবার কি কি নাম করে তাও এ শরীরটার কাছে বলছিল। এমন সময় পরিষ্কার দেখলাম যে চৌকির ঐ কোণে (অর্থাৎ মায়ের শিয়রের দিকে) এক মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে ঐ দিকে দেখিয়ে দিল। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবার যখন ঐ মূর্ত্তির দিকে তাকালাম তখনও আবার ঐ দিকে দেখাল।"

মা যে দিকের কথা বলিলেন সেই দিকে মায়ের একখানা বড় ছবি ও একখানা ছোট ছবি ছিল উহার পরেই আমার ছোট ঘরের দরজা। মা গোপন করিলেও আমি বুঝিলাম যে ঐ মূর্ত্তি মায়ের ছবিই ধ্যান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছিল। আমি হাসিয়া মাকে বলিলাম — "আচ্ছা, আমার দরজার দিকেই বুঝি ঐ মূর্ত্তি দেখাচ্ছিল। কিন্তু ঐ মূর্ত্তি দেখতে কেমন ?"

মা বলিলেন — "পার্থসারথির যেমন রূপ, যেমন পোষাক সেই রকম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর আজানুলম্বিত বাহু বলে না ? সেই রকম লম্বা লম্বা হাতটি উঠিয়ে ঐদিকে দেখাচ্ছিল।" মা আবার বলিলেন — "প্রথমে আমার খেয়াল হয়নি। পরে খেয়াল হয়েছিল যে ঐখানেই ত ভাগবত রাখা আছে।"

মা যে কোণে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন সেই কোণে একটি চেয়ারের উপর কাপড় দিয়া জড়ান একখানা ভাগবত গ্রন্থ ছিল। যাহা হউক, আমি ব্রহ্মচারীটিকে ডাকিয়া সব ঘটনার কথা বলিলাম। সেও বলিল যে মা তাহার সহিত কথা বলিতে বলিতে দুইবার ঐ কোণের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। মায়ের ঐ অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া তাহারও মাকে কিছু বলার আগ্রহ কমিয়া আসিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম যে আমার মনে হইতেছে যে

যদিও মা তাহাকে তাহার দীক্ষা অনুযায়ী ধ্যানের কথাই বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মাকে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল লাগে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং তাহাকে মার এই মূর্ত্তি ধ্যান করিতে দেখাইয়া দিয়াছেন। সে যেন এইরূপ একখানি ছবি করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেয়।

যে ছবিখানির কথা বলা হইল উহাতে মা একখানা পাথরের উপর বসিয়া আছেন। কবে কোথায় মায়ের এই ফটো তোলা হইয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। ফটোখানা দেখিয়া সে বলিল — "ঠিক এইরূপ একটি ফটোই আমার ঘরে আছে। এই ফটোখানাই আমার ভাল লাগে।"

আবারও মা নিজেকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে বলিলেন — "কি জানি কি দেখাল। তোর ঘরের দরজাও ত ঐ দিকেই।" ইহা শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম — "হাঁ, ঠিকই বলেছ। শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আমার ঘরের দরজা দেখিয়ে আমাকেই ধ্যান করতে বলেছেন?" আমার কথা শুনিয়া মাও হাসিয়া উঠিলেন। মা ব্রহ্মচারীটিকে বলিলেন — "আচ্ছা, একটা কাজ করিস। যখনই ধ্যান করতে বসবি তখনই প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি যেমন দেখা হয়েছে বলা হল, ঐ মূর্ত্তি একটু ধ্যান করে প্রণাম করে নিস্।"

পরে এই ঘটনা আরও অনেকে শুনিয়াছে। সকলেই এই দর্শনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে একদিন চুণীলালজী* তাঁহার নূতন বাড়ীতে মাকে নিয়া গেলেন। মায়ের বিশ্রামের জন্য একটি ঘরের মধ্যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

---

* পাঞ্জাবের অবসর প্রাপ্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশ রায়বাহাদুর চুণীলাল কাপুর। ইঁহার পরিবারের সকলেই মায়ের বিশেষ ভক্ত।

বারান্দায় সৎসঙ্গের জন্য আসন পাতিয়া রাখা হইয়াছে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। লোকের ভীড়ে এবং ধূপের ধোঁয়াতে ঘরটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। মা সকলকে বাহিরে গিয়া বসিতে বলিলেন। মায়ের আদেশে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চুণীলালজীর বড় মেয়ে শান্তি ঘরের ধোঁয়া বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ভেন্‌টিলেটার খুলিতে গেল। মা তাহাকে দুই তিন বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু মায়ের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সে রাস্তার উপরে গিয়া ভেন্‌টিলেটার খুলিতে চেষ্টা করিতেই কাচের উপর জোরে আঘাত লাগিয়া কাচ চুরমার হইয়া ঘরের মধ্যে পড়িল। এদিকে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মা বিছানায় চিৎ হইয়া শুইতে গিয়া হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে কাত হইয়া শুইলেন। ঠিক সেই সময় কাচের টুকরাগুলি উপর হইতে বেশ জোরে মায়ের মাথায় ও গায়ে পড়িল। মা যদি চিৎ হইয়া শুইতেন তবে ঐগুলি চোখে মুখেই পড়িত। সমস্ত ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হইয়া গেল। আমরা ধারণাও করিতে পারি নাই যে কেহ বাহির হইতে ভেন্‌টিলেটার খুলিতে চেষ্টা করিবে। যাহা হউক মা উঠিয়া বসিয়া মাথায় যে দুইটি কাচের টুকরা ঢুকিয়া গিয়াছিল তাহা টানিয়া বাহির করিলেন। রক্ত পড়িতে লাগিল। আমাকে একটু জল আনিতে বলিলেন। আমি জল আনিলে মা নিজের আঁচল ভিজাইয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। এখন বুঝিলাম ভাগ্যে মা সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন তাহা না হইলে এই ব্যাপার নিয়া কি যে হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। সংবাদ পাইয়া চুণীলালজীর মেয়েরা মার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। মা তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—"তোমরা এইরূপ করিলে আমি এখনই চলিয়া যাইব। কি আর হইয়াছে?" তাহারা মার কথা শুনিয়া চুপ করিল। মায়ের

চুণীলালজীর বাড়ীতে মায়ের রক্তপাত

মাথা হইতে কিছুক্ষণ রক্ত পড়িয়া উহা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। কাচের টুকরা ভিতরে আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য চুণীলালজী এক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে ভিতরে টুকরা নাই। কিন্তু মায়ের খেয়াল হইতেছিল যে তখনও কাচের সামান্য এক টুকরা ভিতরে আছে। পরে রাত্রি বেলা মা নিজেই ঐ টুকরা বাহির করিলেন।

অলৌকিক উপায়ে ভাইজীর ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ

একদিন কথায় কথায় সৎসঙ্গে মা বলিতেছিলেন যে ভাইজী এবং মা যখন দেরাদুনে ছিলেন তখন একবার পদব্রজে তাঁহারা উত্তর কাশী যাইতেছিলেন। পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে ভাইজী ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আর যেন চলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা যেখান দিয়া যাইতেছিলেন উহার চারিদিকেই জঙ্গল। লোকালয়ের কোন চিহ্নই নাই। এই সময় মায়ের একটু খেয়াল হইল। তখনই দেখা গেল যে জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটি ছেলে হাতে বড় এক ডেলা খোয়া নিয়া ঐখানে আসিয়া হাজির। তাহার নিকট হইতে ঐ খোয়াটুকু লওয়া হইল। নিকটেই ঝরণাও ছিল। খোয়া ও জল খাইয়া ভাইজী সুস্থ হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে এমন চমৎকার স্বাদের খোয়া আর কখনও খান নাই।

আরও একদিন মা বলিতেছিলেন যে মা ও ভাইজী একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। খুব তৃষ্ণা পাইয়াছে। মারও গলা শুকাইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে হঠাৎ মায়ের তৃষ্ণার ভাবটা চলিয়া গেল। ভাইজীরও যেন পিপাসা মিটিয়া গেল। মা পরে বলিয়াছিলেন যে গরমের দিন দেখিয়া অটলদাদা তরমুজ দিয়া ভোগ দিয়াছিল সেইজন্য তৃষ্ণা চলিয়া গিয়াছিল। ভাইজী সেইদিনই অটলবাবুকে চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিলেন যে ঐ দিন তিনি

মাকে কি ভোগ দিয়াছিলেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল যে মা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন ঘটনা তাহাই।

মার্কিন যুবক জ্যাক* কয়েক মাস হয় মার সঙ্গে সঙ্গে আছে। মা নাম দিয়াছেন জয়ানন্দ। একদিন সে মাকে তাহার এক অদ্ভুত দর্শনের কথা বলিল। পরে আমরা তাহা শুনিলাম। সে যখন অ্যামেরিকা হইতে জাহাজে ভারতবর্ষে আসিতেছিল তখন একদিন তাহার মন খুবই খারাপ। কারণ ভারতবর্ষ তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোথায় যাইতেছে? কাহার কাছে যাইতেছে? এই সব চিন্তা তাহাকে বিভ্রান্ত করিতেছিল। এমন সময় সে দেখিতে পাইল সমুদ্রের উপরে শূন্যে এক দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। আবার একটু পরেই উহা মিশিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল। কারণ দিনের বেলা জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ দেখা তাহার নিকট খুবই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। কাশীতে আসিলে তাহার এক বন্ধু যখন তাহাকে মায়ের কাছে আশ্রমে নিয়া আসিল সে মাকে দেখিয়াই অবাক হইয়া গেল। কারণ এই মূর্ত্তিই ত সে সমুদ্রের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিল।

অপরিচিত মার্কিন যুবকের মাকে অলৌকিক ভাবে দর্শন

১৪ই আষাঢ়, শনিবার।

সোলনে ঠিক একমাস থাকিয়া আজ আমরা দিল্লী আসিয়া পৌছিলাম।

---

* জ্যাক বর্ত্তমানে স্থায়ীভাবে আশ্রমে ব্রহ্মচারী ভাবে থাকিয়া মায়ের নির্দ্দেশ মত সাধনভজন করিতেছে।

ডাঃ জে, কে, সেনের বাসাতেই উঠিলাম। টিহরীর রাজমাতা মাকে একটি নূতন মোটর দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে মা ঐ গাড়ীতেই ভক্তদিগকে দর্শন দিতে দিতে কাশী আসেন। তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মা আজই বিকালে মোটরে আলীগড় রওনা হইলেন। সঙ্গে আরও একটি গাড়ী। রাত্রি প্রায় ১০টায় আলীগড়ে পৌছান গেল। ৺প্রকাশ মুখার্জ্জির ছেলে হরিগোপাল আমাদের সকলের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মোটরে দিল্লী হইতে কাশীর পথে

১৫ই আষাঢ়, রবিবার।

আজ সকালবেলা মাকে এখানকার নানাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। আহারের পর আমরা আবার মোটরে এটোয়া রওনা হইলাম। রাত্রি প্রায় ১১টায় এটোয়াতে পৌছিলাম। বাজপেয়ীদের বাড়ীতে মায়ের এই আগমন উপলক্ষ্যে বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। মা পৌছিলে তাঁহারা মাকে আরতি ইত্যাদি করিলেন। কীর্ত্তনও হইল। পরে মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১৬ই আষাঢ়, সোমবার।

কানপুরের রাস্তা খারাপ বলিয়া মা বিকাল বেলা ট্রেনে কানপুর রওনা হইলেন। পরমানন্দজী ও আর সকলে মোটর লইয়া কিছু পূর্ব্বেই কানপুর চলিয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে আমরা কানপুর পৌছিলাম। জগদীশদাদার বাসায় থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৭ই আষাঢ়, মঙ্গলবার।

দুপুরবেলা আমরা আবার মোটরে এলাহাবাদ রওনা হইলাম। সন্ধ্যা প্রায় ৬টায় আমরা এলাহাবাদে পৌঁছিলাম। ট্যাগোর টাউনে একটি নূতন বাড়ীতে মায়ের থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৮ই আষাঢ়, বুধবার।

আজ মেজর রায়ের বাড়ীতে মাকে ভোগ দেওয়া হইল। আবার বিকালেই আমরা রওনা হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাশী পৌঁছিলাম। দিল্লী হইতে এই ভাবে আমরা চারদিনে আসিয়া পৌঁছিলাম ।

২৩শে আষাঢ়, সোমবার।

আজ গুরু পূর্ণিমার উৎসব আশ্রমে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইল। মার উপস্থিতিতে সকলেরই বিশেষ আনন্দ।

সোলনে এবার প্রত্যহ রাত্রে সৎসঙ্গ খুবই সুন্দর হইত। অবধূতজীও বলিয়াছেন যে এমন সুন্দর সৎসঙ্গ তিনি পূর্ব্বে মার কাছে কখনও দেখেন নাই। প্রশ্নের উত্তরে মার মুখ হইতে অনেক অমূল্য কথা প্রকাশ পাইত।

একদিন কথায় কথায় মা বলিতেছিলেন — "**দেহ সংযম, বাক্ সংযমত অনেক সময় হয়। কিন্তু মন সংযমের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। সারাদিন মনটা কি করে ধরতে পার কি? জপ ধ্যান হতে যদি মনটা ছুটে আসে তবে নিজ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা মনটাকে নিজের বশে রাখা। গভীর অন্ধকারে মনের মত গুহায় প্রবেশ করে সেখানে ক্রিয়া করে**

মায়ের মুখে নানাকথা

আসনে বসে পড়া। যতক্ষণ পারা যায় জপধ্যান ইত্যাদিতে থাকা। থাকতে থাকতে এই রকমটা হবে যে সেই গভীর অন্ধকার গুহা নিজের ভিতরের তেজোময় আলোতে যেন আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। যখন ইষ্ট অথবা গুরুর ধ্যানে মনটা আর নিবিষ্ট থাকছে না তখন ঐ গুহার ভিতরেই মনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখা। তারপর সেই আলোর মধ্য হতেই কোনও কল্পিত ভাবে না তেজোময় মহাযোগীদের প্রকাশ হয় কিনা উন্মুখ হয়ে থাকা। যদি কখনও কিছু পাওয়া যায় তাদের সঙ্গেই ওঠা বসা থাকা। যদি যোগীদের প্রকাশ নাও পাওয়া যায় তবুও এই গুহার মধ্যে ভাগ ছাড়া বাইরে কোথাও যাবার অধিকার নেই। গুরু ইষ্টের প্রকাশ জাগ্রত ভাবে রাখা। নিজের সর্ব্বদা একটা নিরাবরণ মুক্ত ভাব রাখা। যদি কখনও মনটা গুরু ইষ্ট ধ্যান ছাড়া বাইরের দৃশ্য চিন্তায় আসে তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গুহার দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু জপ করে গুহার ভিতরে প্রবেশ। যে অবস্থায় থাকবে নিত্য কর্ম্মাদি সমাপনান্তে এই জাতীয় ভাব ধারাটায় যত দীর্ঘ সময় থাকা যায়।"

আবার কি কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছিলেন—"যে দৃষ্টিতে যা দেখবে সেই-ই। শক্তির খেলায় হচ্ছে প্রকাশটা। অব্যক্ত অপ্রকাশ যা তাও সেই-ই। স্ফূরণ যা হয় স্বয়ং তাঁরই খেলা। তিনিই স্ফূরণ আর অস্ফূরণ। তুমিই এই প্রাকৃত রূপে পর পর রূপে। আবার অপ্রাকৃত, যেখানে পর পরের প্রশ্ন নাই। সেইটি কে? তুমিই যে স্বয়ং। প্রশ্ন যেখানে সেটা হল অজ্ঞান। আর যেখানে প্রশ্নেরও প্রশ্ন নাই, সেইখানে যা বল তাই। তুমিই না স্বয়ং রূপে অরূপে? কে জীব? কে শিব? নিজকে পাওয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ। স্বয়ং তুমি

যখন তোমাকে পেলে, বিশ্ব ব্যাপক রূপেতে আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত, অভিন্ন। যেখানে বাক্যের প্রশ্নই নেই। যেখান থেকে যে যা বলছ তুমিই না স্বয়ং। অথবা যেখান থেকে যাতে যে বলাটা আসছে তারই না তুমি। কত কোটি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে। সে কে? তুমিই ত অনন্তরূপে অন্তরূপে। তোমারই সৃষ্টি স্থিতি লয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিনা তোমারই রাজত্ব। আর তাতে তুমিই রাজা। তোমারই সৃষ্টি এই খেলা।”

ইতিমধ্যে সোলনে থাকিতে খবরের কাগজেও একটি বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। জার্ম্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র ভারতে আসিয়া বদ্রীনাথ দর্শনে গিয়াছিল। কিন্তু পার্মিটের অভাবে তাহাকে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বন্দী করা হয়। সে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নাকি বলিয়াছে যে ভারতে সে উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধানে আসিয়াছে এবং এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীর দর্শনের পর হইতে তাঁহাকেই সে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছে।

আমরা কিন্তু কেহই এই জার্ম্মাণ যুবকটিকে ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কবে কোথায় কোন সময়ে কে আসিয়া মার কৃপা লাভ করিয়া যাইতেছে তাহার হিসাব রাখা কি কখনও আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব?

১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

আজ মা আহারে বসিয়াই বলিলেন— “আজই বিন্ধ্যাচলে চলে গেলে হয়।” পরমানন্দ স্বামীজীকে ঐ কথা বলা হইলে তিনি তখনই রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সকাল বেলা যাহারা মায়ের সৎসঙ্গে আসিয়া-

ছিলেন তাহারা কেহই জানিতে পারিলেন না যে মা আজই চলিয়া যাইতেছেন। কেহ কেহ সংবাদ পাইয়া বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিলেন। মায়ের গতিবিধির সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা ইহাতে অবাক হইলেন না। বিকাল চারটার পরে মোটরে মা রওনা হইলেন।

৪ঠা শ্রাবণ, রবিবার।

বিন্ধ্যাচলে তুইদিন থাকিয়া আমরা আজ সকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। মায়ের নির্দ্দেশ মত কলিকাতায় কাহাকেও খবর দেওয়া হয় নাই কাজেই ষ্টেশনে কেহই উপস্থিত ছিল না। কিন্তু আমরা ষ্টেশনে নামিয়াছি।

কাহাকেও খবর না দিয়া কলিকাতায় গমন

এমন সময় সোপোরী সাহেবের ড্রাইভার আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে আজই সোপোরী সাহেবের এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসার কথা ছিল তাই সে মোটর নিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন — "ভগার কাণ্ড! সব ঠিক করে রেখেছে।" মা কলিকাতা আসিলে এই গাড়ী সর্ব্বদাই মায়ের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকে। মালিক এখন কলিকাতায় নাই। কিন্তু তবু তাঁহার গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় মায়ের একটি পাঞ্জাবী ভক্তও তাঁহার নিজ প্রয়োজনে মোটর নিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন। তিনিও তাঁহার গাড়ী মাকে ছাড়িয়া দিলেন। আরও একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁহার গাড়ীতে মাকে নিতে চাহিলেন। কিন্তু অনাবশ্যক বিবেচনায় আমরা তাঁহার গাড়ী আর লইলাম না। পূর্ব্বোক্ত তুইখানা গাড়ী লইয়া আমরা ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

মা প্রথমেই মুক্তিবাবাকে দেখিতে গেলেন। মাকে হঠাৎ দেখিয়া মুক্তিবাবার কি আনন্দ! ডাক্তাররাও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হাসপাতাল হইতে মা টালিগঞ্জে কনক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গেলেন। মা গিয়া তাহাদের ঠাকুর ঘরে উঠিলেন। এইভাবে মাকে পাইয়া বাড়ীর সকলের যে কি আনন্দ তাহা সহজেই অনুমেয়।

মায়ের ইচ্ছা যে কলিকাতায় দুই এক দিন গা ঢাকা দিয়া থাকেন। তাই কনককে বলিয়া দেওয়া হইল যে তাহারা যেন মায়ের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ না করে। যে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের গাড়ীতে আসা হইল তাহাকেও ঐ কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু রাস্তায় পেট্রোল লইবার সময় টুনু আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। তবে আমরা কোথায় গেলাম তাহা সে জানিতে পারিল না।

হাসপাতালে রোগীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় বিকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত। তবে মায়ের সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। মা কখনও সকাল বেলায়ও মুক্তিবাবাকে দেখিতে যাইতেন। এবার ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মা স্থির করিলেন যে সন্ধ্যা ৬॥টা হইতে ৮টার মধ্যে আসিয়া মা মুক্তিবাবাকে দেখিয়া যাইবেন। তখন সর্ব্বসাধারণের হাসপাতালে প্রবেশ নিষেধ। মাও মাত্র দুইজন সঙ্গী লইয়া আসিবেন এইরূপ বলিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার যে সময় স্থির হইল তাহাতেও ভক্তদের সহিত মায়ের দেখা শুনার সম্ভাবনা রহিল না।

এদিকে টুনুর মারফতে যতীশ দাদা প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত জানিয়া ফেলিলেন যে মা কলিকাতা আসিয়াছেন কিন্তু কোথায় আছেন তাহা জানিতে না পারিয়া তাহারা বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আমরা যখন সন্ধ্যা বেলা হাসপাতালে গেলাম তখন দেখিলাম সেখানে সুধীন দাদা, রঞ্জন দাদা,

এবং কোহিনূরদাদা সপরিবারে গাড়ী নিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মাকে দেখিয়া সকলের মহানন্দ। মা পরমানন্দ স্বামী এবং বিজয়ানন্দকে সঙ্গে করিয়া মুক্তিবাবার কাছে উপরে চলিয়া গেলেন। কোহিনূর দাদা প্রভৃতি বাহিরে দাঁড়াইয়া আমার নিকট হইতে কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন যে আমরা কোথায় আছি। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে মায়ের নির্দ্দেশ মতই আমাদের বাসস্থান গোপন করা হইতেছে। মা না বলিলে ত আমি উহা প্রকাশ করিতে পারি না।

রাত্রি ৮টার সময় মা মুক্তিবাবার নিকট হইতে নামিয়া আসিলে কে যেন মাকে জিজ্ঞাসা করিল যে মা কতদিন কলিকাতায় আছেন। উত্তরে মা বলিলেন — "তিন রাত্রি থাকবার কথা। আর রোজ এই সময়ে এখানে আসবার কথা।" পরে যে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের মোটরে আমরা আসিয়াছিলাম তাঁহার দোকানে কিছুক্ষণের জন্য মা গেলেন। সেখান হইতে বুনীকে দেখিয়া অল্প সময়ের জন্য আশ্রমে দেখা দিয়া আবার মা কনক বাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কেহ কেহ সংবাদ পাইয়া গেল।

৫ই শ্রাবণ, সোমবার।

আজ সকাল বেলায়ই মার কনক বাবুর বাসা হইতে চলিয়া আসার কথা। কিন্তু তাঁহারা মাকে কিছু জল না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না। মা একটু জলযোগ করিয়া ৯॥ টার সময় হাসপাতালে চলিয়া গেলেন। আমিও আমাদের জিনিষ পত্র নিয়া আশ্রমে গেলাম। আজ অমাবস্যা। মা রাত্রিতে আশ্রমেই ভোগ গ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন।

হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া মা সারাদিন গঙ্গাচরণ বাবুর বাসায়

রহিলেন। সন্ধ্যা বেলা আবার মা মুক্তিবাবাকে দেখিয়া আশ্রমে আসিলেন। ভোগ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব কথা মত মা শ্রীযুক্ত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

আমরা বিনয় বাবুর বাড়ীতেই আছি। ইহারা নূতন বাড়ী করিয়াছেন এখনও বাড়ী সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মায়ের থাকার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আজ রাত্রিতে মা আশ্রমে থাকিবেন স্থির হইয়াছে।

৯ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

কলিকাতায় মায়ের মাত্র তিন দিন থাকার কথা ছিল। কিন্তু মুক্তিবাবার অনুরোধে মা আরও দুই দিন কলিকাতা থাকিয়া গেলেন। ইহার মধ্যে একদিন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের স্ত্রী কোন্নগরে তাঁহার নিজ বাড়ীতে মা এবং মায়ের ভক্তদিগকে লইয়া গেলেন। রাহুল দাদাও তাঁহার কারখানায় একদিন মাকে নিয়া গেলেন। সেখানেও কীর্ত্তনাদি হইল।

আজ আমরা কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। ঝুলন জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্য করিয়াই এবার কাশীতে যাওয়া।

এবার খান্নাতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের সময় যোগী ভাই আশ্রমে সংযম ব্রতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে প্রতি বৎসর কয়েকটা দিন মায়ের ভক্তেরা যদি আহার, নিদ্রা, বাক্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে যথাশক্তি সংযম অভ্যাস করে তবে বেশ হয়। তখনই স্থির হইয়াছিল যে এই বৎসর

ঝুলন পূর্ণিমার পর দিন হইতে সাত দিন এই সংযম ব্রত পালন করা হইবে।

১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

আজ. হইতে ঝুলন আরম্ভ হইল। গঙ্গাদিদি কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়া এই উৎসব করিয়া থাকেন। রাত্রি ৯টার পর মৌন শেষ হইলে গঙ্গাদিদি মাকে একটু জলযোগ করাইয়া কন্যাপীঠের দোতলায় নিয়া দোলনায় বসান।

কাশীতে ঝুলন উৎসব

মেয়েরা কীর্ত্তন এবং গান করিয়া থাকে। প্রতি দিনই মেয়েরা নূতন নূতন ভাবে মায়ের দোলনা এবং ঘরখানি সাজাইয়া দেয়। মাকে দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম ভাবের নানা লীলাও করে। মেয়েরা অনেকেই দেখিবার সুযোগ পায়। কিন্তু পুরুষ ভক্তদিগকে উপরে আসিতে দেওয়া হয় না। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত এইভাবে আনন্দোৎসব চলে।

১৯শে শ্রাবণ, সোমবার।

ঝুলন উৎসব চলিতেছে। বহু ভক্তেরা মায়ের চরণে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। মেয়েরাও নিত্য লীলা করিতেছে। মাও লীলা সম্বন্ধে অনেক নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। নিজেও ঘরটি কি ভাবে সাজাইতে হইবে তাহাও দেখাইয়া দেন। আজ মৌনের পরই গঙ্গাদিদি মাকে নিয়া উপরে গেলেন। উপরে যাইবার সময় মা আমাকেও উপরে আসিতে বলিয়া গেলেন।

একটু পরে উপরে গিয়া দেখি মা মহা ব্যস্ত। উপস্থিত স্ত্রীলোক-দিগকে মা বলিলেন — "তোমরা কাল বলেছিলে যে আজ লীলায় যোগ দেবে। সকলকেই কিন্তু যোগ দিতে হবে।" দেখিলাম সমস্ত হলঘরটি জুড়িয়াই

আজিকার লীলার ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিম দিকের এক কোণে একটি শিবের ছবি রাখা হইয়াছে। উহার সম্মুখে ছোট একটি কম্বলের আসন পাতা। এই কোণটি এমন ভাবে সাজান হইয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় ইহা যেন একটি অরণ্যের মধ্যে তপস্যার স্থান। পশ্চিম দিকের অন্য কোণে ফুলগাছ দিয়া কতকটা কুঞ্জের মত করা হইয়াছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের ছবি টাঙ্গান আছে এবং ঐ ছবির সম্মুখেও একটি কম্বলের আসন। কাহারো বিশ্রাম করিবার জন্য একটি কম্বলের ছোট বিছানাও পাতা। হলঘরের মাঝখানে একজন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য সাজিয়া বসিয়া আছেন। পূর্ব্বদিকে দোলনার উপর শ্রীরামচন্দ্রের ছবি বসাইয়া রামানুজ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা পূজায় বসিয়াছেন। ঐ দোলনারই অন্য পার্শ্বে শ্রীদুর্গার ছবি রাখিয়া শাক্তেরাও পূজায় বসিয়া গিয়াছেন। মেয়েদের নানা সম্প্রদায়ের উপাসনায় বসাইয়া মা একদিকে আমাকে টানিয়া নিয়া শিবের ছবির সম্মুখে আসনে বসাইয়া বলিলেন— "তোমাকেও লীলায় যোগ দিতে হবে। শিবের ধ্যান কর।" গঙ্গাদিদিকে শ্রীকৃষ্ণের ছবির কাছে বসাইলেন। কন্যাপীঠের মেয়েরাও এই লীলায় কোন না কোন সাজ লইয়া অংশগ্রহণ করিয়াছে দেখিলাম। মায়ের ঠাকুরমা আদর করিয়া মাকে ছোট বেলায় "তীর্থবাসী" বলিয়া ডাকিতেন। লীলার সময় মা ঐ নামই গ্রহণ করিলেন। গঙ্গা মাটির রংয়ের একটি কাপড় ঘোমটা দিয়া পরিয়াছেন। প্রতি সম্প্রদায়ের উপাসনার অনুকূল সব জিনিষ মা যোগাইতেছেন। বীথু মাঝে মাঝে মাকে উদ্দেশ্য করিয়া অনুরোধ করিতেছে— "ও তীর্থবাসী মাঈ, পূজার ফুল চাই।" "কীর্ত্তনের করতাল চাই।" "শঙ্করাচার্য্যজীর জন্য পুস্তক চাই" এইরূপ। বীথু যাহা যাহা চাহিতেছে মা বিভিন্ন স্থানে গিয়া ঐগুলি সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। এই ভাবে লীলা চলিল।

মেয়েদের লীলাতে মায়ের অংশগ্রহণ

আজিকার লীলায় পুরুষদেরও দর্শক হিসাবে আসিতে দেওয়া হইল। সকলেই বিশেষ আনন্দ পাইলেন। কেহ কেহ বলিলেন যে এইসব মেয়েদের ভাগ্যের সীমা নাই। মা তাহাদের সঙ্গে লীলা করিতেছেন। আর ইহা সব দেখিবার সৌভাগ্যও পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্যের ফলে।

২০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।

আজ ঝুলন পূর্ণিমা। আজ আবার চন্দ্র গ্রহণও। রাত্রি ১২টার পরই এই গ্রহণ লাগিবে। সেইজন্য সন্ধ্যার পরই ৺অন্নপূর্ণার পূজা আরম্ভ হইল। পূজা এবং ভোগ শেষ হইলে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেল। ৯। ১০টার মধ্যেই সকলের আহারাদি হইয়া গেল। ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রিতে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষার সময়টা সচরাচর ধ্যান, জপ এবং কীর্ত্তনে কাটাইয়া থাকি। আশ্রমের ছাদের উপরে শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে বসিয়া সকলে রাত্রি ১১॥ হইতে ১২॥ পর্য্যন্ত ধ্যান জপ করিলেন। ইহার পরই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাহা গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চলিল। গ্রহণান্তে সকলে গঙ্গা স্নান করিলেন। মার শুইতে শুইতে রাত্রি প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল।

২১শে শ্রাবণ, বুধবার।

আজ হইতে সংযম ব্রত আরম্ভ হইল। এই সংযম ব্রত উপলক্ষ্যে যোগীভাই, অবধূতজী প্রভৃতি অনেকেই কাশীতে আসিয়াছেন। ভোরে উষা কীর্ত্তন। তাহার পর নিজ নিজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সকালে ৮টা হইতে

কাশীতে প্রথম সংযম ব্রত

৯টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে ধ্যান। ৯টা হইতে বেলা প্রায় ১১॥ কি ১২টা পর্য্যন্ত সৎগ্রন্থাদি পাঠ। আবার বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মায়ের সম্মুখে ধ্যান। ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

সৎসঙ্গ। রাত্রিতে আবার পৌনে বারটা হইতে সোয়া বারটা পর্য্যন্ত মহানিশার ধ্যানও হয়। মোট কথা আহারের সময় ব্যতীত প্রাতঃকাল হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ধ্যান, জপ সদালোচনাতেই যাহাতে সকলের সময় অতিবাহিত হয় এই-ভাবেই কার্য্যক্রম নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আহার বিষয়েও সংযম রক্ষা করা হইতেছে। সকলেই খুব উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগ দিয়াছেন।

২৮শে শ্রাবণ, বুধবার।

সংযম সপ্তাহ খুব সুন্দর ভাবে চলিতেছে। সকালে বিকালে ধ্যানের সময় কোন কোন দিন মা সূক্ষ্মে অনেক কিছু দেখিতেন। একদিন সকাল বেলা ধ্যানের সময় মা দেখিতে পাইলেন যে একটি চার পাঁচ বৎসরের শিশু বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে সাদা কাপড়। খালি গা মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। মার দিকে মুখ করিয়া মগ্ন ভাবে গাহিতেছে —

সংযম ব্রতের সময় মায়ের সূক্ষ্মে নানা দর্শন

"হে পিতঃ, হে হিত, হে ব্রহ্মাতত্ত্বং"

কখনও কখনও 'ব্রহ্মাতত্ত্বং' না বলিয়া বলিতেছে 'ব্রহ্মাভূতং'। মায়ের দর্শনের কথা শুনিয়া আমাদের মনে হইল যে মাকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝি ঐ শিশুটি এই সব কথা বলিতেছিল। অবধূতজীও তাহাই বলিলেন।

আরও একদিন বিকাল বেলা মৌনের সময় মা সূক্ষ্মে কিছু দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন — "তোরা যেমন ব্যাগ রাখিস্ না, সেই রকম একটা ব্যাগ। ভিতরে নানা রংয়ের কাপড়। তখন খেয়াল আসল যে সংযম ব্রতে অনেকেরই পর্দ্দা কেটে গেল আর কি।" এই সময় আরও নাকি একটা শব্দ মা শুনিয়াছিলেন। শব্দটি — "আপনাতে আপ।"

একদিন চিত্ত (শঙ্করানন্দ স্বামীজীর ছেলে) আসিয়া মাকে বলিল — "মা আমি কয়েক মাস পূর্ব্বে একটা স্বপ্নের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে দেখছিলাম যে আপনি, দিদি এবং আমরা কয়েকজন একটা ঘরের মধ্যে বসে আছি। এমন সময় আপনার ভিতর থেকে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি বের হয়ে দিদির মধ্যে প্রবেশ করল। দিদিকে তখন কি চমৎকার এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।" চিত্তের কথা শুনিয়া মা আমাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন — "চিত্ত নাকি দেখেছে একটা জ্যোতি তোর শরীরের মধ্যে গিয়ে মিশে গেল। দিদি, আমরা কবে সেই জ্যোতি দেখতে পাব ?" এই কথা নিয়া বেশ কিছুক্ষণ আনন্দ চলিল।

ত্রিবেণী পুরীজীর মতে মা অবতার হইতেও শ্রেষ্ঠ

অবধূতজী একদিন আমাদিগকে বলিতেছিলেন — "মায়ের কয়েকজন ভক্ত একবার খান্না বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আনন্দময়ী মা কে ? উত্তরে তিনি হাসিয়া বলিলেন — 'তোমরা এখনও মাকে অবতার জ্ঞানে অবতারদের মধ্যে দেখিতেছ। মা আরও উচ্চে — আরও অনেক আগে।'

শ্রীশঙ্কর ভারতীজীর মাতৃদর্শনে আগমন

শ্রীশঙ্কর ভারতী নামে একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী পণ্ডিত কাশীতে বাস করেন। সকলেই বলেন যে সাধুদের মধ্যে এরূপ পণ্ডিত এবং ত্যাগী পুরুষ ভারতে নাই বলিলেই হয়। সোলনে যোগী ভাইয়ের কাছে ইনি কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু তখন মার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই। অনেক দিন যাবৎ ইনি কাশীতে ললিতা ঘাটের উপর একটি মঠে একান্ত বাস করিয়া আসিতেছেন। কাহারো সহিত বিশেষ দেখাশুনাও করেন না। নিজের ভাবেই থাকেন। একবার ইনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত মহাশয় ইঁহার চিকিৎসা করেন। সেই সময় তিনি শঙ্কর ভারতীজীকে মায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন এবং তিনি যদি মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা

করেন তবে ডাক্তার বাবু তাঁহাকে মোটর গাড়ীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক তাহাও জানাইয়া দেন। কিন্তু ভারতীজী বলিলেন — "আমার জন্য গাড়ী পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। মা জগদম্বার আদেশ ছাড়া আমি ত কিছুই করি না। মায়ের আদেশ হইলে আমি নিজেই আনন্দময়ী মাকে দেখিয়া আসিব।"

একদিন আশ্রমের হল ঘরে রাস হইতেছে। মা, অবধূতজী এবং আরও অনেকেই সেখানে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় ১১টা হইবে। এমন সময় হঠাৎ শঙ্কর ভারতীজী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া মা এবং অবধূতজী ব্যস্তভাবে উঠিয়া আসিলেন এবং ভিড় এড়াইবার জন্য ভারতীজীকে লইয়া ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। তিনি মাকে দর্শন করিতে নিজ হইতে হাটিয়াই আসিয়াছেন। তাঁহাকে আশ্রমে আহার করিতে বলা হইল, কিন্তু তিনি কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসিয়াই তিনি আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বিদায় চাহিলেন। মা হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন — "পিতাজীর যাওয়া আসা কি আছে?" ভারতীজীও মৃদুভাবে বলিলেন — "হাঁ, সে ত ঠিক কথাই।"

শঙ্কর ভারতীজীর শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে এইভাবে আসাটা অনেকেই একটা আশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কেননা তিনি জগদম্বার আদেশ ভিন্ন কখনও তাঁহার ঘর ছাড়িয়া কোথায়ও বাহির হন না। মা বলিলেন যে, যে দিন শঙ্কর ভারতীজী আসিয়াছিলেন তাহার পূর্ব্ব দিন তিনি তাঁহাকে স্বপ্নে আশ্রমেই দেখিয়াছিলেন। ভারতীজীকে মা যেখানে যে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন পরদিন ভারতীজী ঠিক সেইখানে সেই ভাবেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

কমল একদিন কথায় কথায় ভারতীজীকে বলিল যে তাঁহার আশ্রমে যাইবার পূর্ব্ব দিন মা তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া

ভারতীজী খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন — "ঐদিন (অর্থাৎ মায়ের আশ্রমে আসিবার পূর্ব্ব দিন) আমাকে জগদম্বা আদেশ দিলেন — 'তুই কাল গিয়া বেলা ১২টার পূর্ব্বে মাতাজীকে দর্শন করিয়া আয়।' আমি বলিলাম — 'এখন বৃষ্টি চলিতেছে এখন কি করিয়া যাই?' জগদম্বা বলিলেন — 'বৃষ্টি রৌদ্র কিছুই হইবে না; তুই যা।' বাস্তবিক ঐদিন রৌদ্র বৃষ্টি কিছুই ছিল না। বেশ আনন্দে হাটিয়া গিয়া চলিয়া আসিলাম।"

আমরা আরও শুনিতে পাইলাম মা জগদম্বাই নাকি ভারতীজীকে সর্ব্ব বিষয় পরিচালনা করিতেছেন। একবার এক ভদ্রলোক নাকি অতি যত্নের সহিত কিছু আহার্য্য আনিয়া ভারতীজীর নিকট উহা রাখিয়া তাঁহাকে উহা আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভারতীজীও তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা না করিতে পারিয়া উহা গ্রহণ করিবার জন্য উপবেশন করিলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে যেন কানে কানে বলিতেছে — "খাইও না।" উহা শুনিয়াই তিনি আহার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

১২ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।

আজ রাধাষ্টমী। আজ হইতে আশ্রমে ভাগবত জয়ন্তী আরম্ভ হইল।

ভাগবত জয়ন্তী — সকাল বেলা চিত্ত পাঠ করিবে আর বিকালে বাটু দাদা ব্যাখ্যা করিবেন।

এই ভাগবত জয়ন্তীর মধ্যেই মা শ্রীযুক্ত গোপাল দাদার আহ্বানে ১৬ই এলাহাবাদ রওনা হইবেন এবং সেখানে তিন রাত্রি থাকিয়া আবার কাশী ফিরিয়া আসিবেন।

এবার এলাহাবাদে ৺দুর্গাপূজা হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বালেশ্বরী প্রসাদ উকিলের বাড়ীতেই পূজার আয়োজন হইতেছে এবং ঐ বাড়ীর নিকটেই একটা ক্লাবে মায়ের থাকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

১৩ই আশ্বিন, সোমবার।

মা সকলকে নিয়া গত ৮ই বোধনের দিন এলাহাবাদে আসিয়াছেন। ১০ই হইতে পূজা আরম্ভ হইল। অবধূতজীও আমাদের সঙ্গেই আছেন। নবমীর দিন হরিবাবাও আসিলেন। খুব ধুমধামের সহিত পূজা হইল।

এলাহাবাদে দুর্গাপূজা

এই উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে "রামরসায়ণ"কে আনা হইয়াছে এবং হিন্দী রামায়ণ পাঠেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই দুর্গোৎসবে ছেলেমেয়ের দলই বিশেষ উদ্যোগী। তাহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াছে। কর্ম্মীদের মধ্যে সুবোধ এবং বীথুর নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের কর্ম্মদক্ষতার প্রশংসা সকলেই এক বাক্যে করিতেছেন। এই পূজাতে প্রায় নয় হাজার টাকা খরচ হইবে। তিন হাজার টাকার মধ্যেই এই পূজা নির্ব্বাহ করিতে হইবে মনস্থ করিয়া কর্ম্মীরা কাজে অগ্রসর হন। সুবোধের নিকট শুনিয়াছি যে ঐ তিন হাজার টাকাও চাঁদা করিয়া তোলা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পরে কি ভাবে যে একপ্রকার বিনা চেষ্টায় নয় হাজার টাকা আসিয়া গেল তাহা যেন উহারা বুঝিতেই পারিল না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিয়াছি যে মায়ের কাজে এই ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আজ দশমীর দিন বিকালে মেয়েরা প্রতিমাকে সিন্দুর পরাইতে গিয়া

দেখিতে পাইল যে প্রতিমার পায়ের আঙ্গুল যেন একটু ফাটিয়া গিয়াছে। উহার একটু পরেই মাও পূজার মণ্ডপের মধ্য দিয়া আসিবার সময় পায়ের আঙ্গুলে বেশ একটু চোট পাইলেন। পরে মা কথায় কথায় বলিলেন — **"দেবীর পায়ের আঙ্গুল ভাঙ্গ ভাঙ্গ হয়েছে শুনলাম। তাই এই শরীরটাকেও করুণা করে তার কিছু অংশ দিয়ে গেল।"**

দুর্গা প্রতিমার এবং মায়ের পায়ের আঘাত লাগা

১৬ই আশ্বিন, বুধবার।

গত ১৪ই আশ্বিন মা এলাহাবাদ হইতে কাশী রওনা হইয়া আসিলেন। আবার গতকালই কলিকাতা রওনা হইয়া আজ ভোরে আসিয়া পৌছিলেন। এবার মা গঙ্গাচরণ বাবুর বাসাতেই উঠিলেন। আমাদের সঙ্গে হরিবাবা প্রভৃতি মহাত্মারাও আছেন। শ্রীরামধন দাস ঝাঝারিয়ার বিশেষ আগ্রহে সাধুরা তাঁহার বাসাতেই গেলেন।

কলিকাতায় মা

১৯শে আশ্বিন, রবিবার।

গতকাল মা সাধুদের নিয়া মোটরে নবদ্বীপ দর্শনে আসিয়াছেন। সকলের জন্য ব্যবস্থা করিতে কমল, বুনী এবং আরও কয়েকজনকে মা পূর্ব্বেই নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সাধুদের থাকিবার স্থান শ্রীবাস অঙ্গনে করা হইয়াছে এবং অন্যান্য সকলের ব্যবস্থা শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে। মা এখানে এক রাত্রি থাকিয়া সাধুদিগকে

সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ গমন

বিভিন্ন দেবালয়ে দর্শনাদি করাইয়া আজ বিকালেই আবার কলিকাতা ফিরিলেন। এবার আসিয়া আশ্রমেই উঠিলেন।

২১শে আশ্বিন, সোমবার।

পুরীতে মা

আজ মা সকলকে লইয়া পুরী আসিয়া পৌছিলেন। পুরীর আশ্রমে আনন্দের হাট বসিল। আমাদের সঙ্গীয় লোক ব্যতীত কলিকাতা হইতেও বহু ভক্তেরা আসিয়াছেন। পুরীর আশ্রম বড় নয়। সেইজন্য অনেকেই হোটেলে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন।

২৯শে আশ্বিন, বুধবার।

ভুবনেশ্বর ও কটক ভ্রমণ

আজ সকলকে নিয়া ভুবনেশ্বরে যাওয়া হইল। সেখানে গিয়া আমরা নিম্বার্ক আশ্রমে উঠিলাম। সাধুরা ভুবনেশ্বর এবং সাক্ষী গোপাল প্রভৃতি স্থান দেখিলেন।

৩০শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

পাটনার গভর্ণমেণ্ট প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ মহাশয় মা এবং মহাত্মাদের লইয়া আজ কটক গেলেন। কিংবদন্তী আছে যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পুরী হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে এখানে একটি স্থানে এক রাত্রি বাস করেন। সেখানে নাকি তাঁহার পদচিহ্ন আছে। হরিবাবা সেই স্থান দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে আমরা তথায় লঞ্চ করিয়া গেলাম। দেখিলাম স্থানটি

দ্বীপের মত। ছোট বড় অনেক পাথর সেখানে আছে। উহাদের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত বড় প্রস্তরখণ্ডে পদ চিহ্নের মত আছে। হরিবাবা, অবধুতজী এবং আমরা ঐ পদচিহ্নে জল দিয়া প্রণাম করিলাম। এক প্রকার ফুল ঐখানে পাওয়া গেল। উহাই আমরা পদচিহ্নের উপর চড়াইলাম। হরিবাবা মহাপ্রভুর স্তবও পাঠ করিলেন। বেলা প্রায় ১টার সময় রমণীবাবুই আমাদের সকলকে নিয়া সহরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আমাদের সকলের জন্য থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পিতা আমাদিগকে একদিন থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। খুব বৃষ্টিও চলিতেছিল। কিন্তু উহার মধ্যেই আমরা রাত্রি ৯টায় পুরী ফিরিয়া আসিলাম। পথে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির দেখিয়া আসিলাম।

১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার।

পুরী আশ্রমে কালীপূজা

আজ কালীপূজা। আশ্রমেই কালীপূজার বন্দোবস্ত হইল। কুসুম পূজা করিল। বিভু, হীরু, মণি, ছবি প্রভৃতি গায়ক গায়িকারা কীর্তনাদি করিল। মধ্য রাত্রিতে আমরা সকলেই সমুদ্রের ধারে আশ্রমের আঙ্গিনায় প্রসাদ পাইতে বসিলাম। মাও বসিলেন। মা নিজেই সকলকে একটু মিষ্টি প্রসাদ দিতে লাগিলেন। জগন্নাথ দেবের প্রসাদ শশধর দাদা আনাইয়াছিলেন। তাহাও একটু একটু খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। মা নলিনী ব্রহ্ম মহাশয়ের কাছে গিয়া তাঁহাকে ঐ ভাবে একটু খাওয়াইয়া দিয়া বলিলেন — "বাবা, আমাকেও খাইয়ে দেও।" তিনিও তাহাই করিলেন। ইহার পর আরও অনেকেই মাকে খাওয়াইয়া

দিতে লাগিলেন। এই ভাবে মহা আনন্দ করিয়া রাত্রি প্রায় ৯টায় আমরা সকলে বিশ্রাম করিতে গেলাম।

২রা কার্ত্তিক, শনিবার।

আজ অন্নকূট। ৫৬ পদ দিয়া দেবীর ভোগ সাজান হইল। আজও অনেক ভক্ত আশ্রমে প্রসাদ পাইলেন। রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসব চলিল।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

একাদশ ভাগ

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের অন্তর্গত কয়েকটি বৎসরের ঘটনাবলী লইয়াই এই ভাগের রচনা। নানা অলৌকিক সূক্ষ্ম দর্শনের কথা, পণ্ডিচেরীতে শ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, রমণাশ্রমে রাত্রিবাস, প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার স্থানে গিয়া মায়েরও শরীর ত্যাগের উপক্রম, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষের মাকে অনুগমন ও দ্বারকায় মহামিলন, বৃন্দাবন আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা, সূক্ষ্মে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত মায়ের সাক্ষাৎকার এবং ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াদা, গুন্টুর, মাদ্রাজ, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, রামেশ্বর, মাদুরা, কন্যাকুমারীকা, ত্রিবাঙ্কুর, পুনা, মহীশূর, বম্বে, জুনাগড়, পোরবন্দর, রাজকোট, মোরভি, ভাবনগর প্রভৃতি নানাস্থানে মায়ের ভ্রমণলীলা কাহিনী এই ভাগে স্থান লাভ করিয়াছে।

[অক্টোবর, ১৯৫২-ডিসেম্বর, ১৯৫৩]